আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস

[FOR H. S. STUDENTS]

ডক্টর অতুল চন্দ্র রায় এম. এ., পি. এইচ. ডি. (লণ্ডন)
স্যার আশুতোষ গোল্ড মেডালিষ্ট, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মৌলিক লাইব্রেরী
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

নুতন সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক রচিত উচ্চতর মাধ্যমিক ইতিহাসের পাঠ্যসূচী অনুসারে আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। আধুনিক বিশ্বের সমস্যা নিত্যনূতন। বিশ্ব ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাঠ্যসূচীতে নির্দেশিত যাবতীয় বিষয়গুলি সতর্কতার সহিত আলোচিত হইয়াছে।

পাঠ্যসূচী অনুসারে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বর্তমান গ্রন্থখানির আলোচনা শুরু করা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান চারিটি ঘটনা—সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব, আমেরিকায় রাষ্ট্র-বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব—বিশ্বের ইতিহাসে এক নবযুগের উদ্ঘাটন করিয়াছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধকে যথার্থভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বলা যাইতে পারে। কারণ তিনটি মহাদেশে (ইওরোপ, এশিয়া ও আমেরিকা) এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এবং ইহার প্রতিক্রিয়া তিনটি মহাদেশেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ আধুনিক বিশ্বের বহু দেশের পক্ষে অনুকরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসী বিপ্লব জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমতার ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের জনগণকে পরস্পরের সান্নিধ্যে লইয়া আসিয়াছে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের অনুন্নত ও অনগ্রসর জাতিগুলির সম্মুখে এক নূতন আশার পথের সন্ধান দিয়াছে।

বহুক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর সু-বিশ্লেষণের জন্য পাদটীকার বহুল ব্যবহার করা হইয়াছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বিষয়বস্তুগুলির সংক্ষিপ্তসার ও প্রশ্নমালা সংযোজিত হইয়াছে।

যদি পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির ন্যায় এই সংস্করণটিও ছাত্রছাত্রীদের উপকারে আসে তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। ভবিষ্যতে গ্রন্থটি যাহাতে আরও উন্নত ধরণের হয় সেইজন্য যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক রচিত উচ্চতর মাধ্যমিক (Higher Secondary) ইতিহাসের পাঠ্যসূচী অনুসারে আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। বিশ্ব ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাঠ্যসূচীতে নির্দেশিত যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সতর্কতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। বহুক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর সু-বিশ্লেষণের জন্য পাদটীকার বহুল ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বিষয়বস্তুগুলির সংক্ষিপ্তসার ও প্রশ্নমালা সংযোজিত হইয়াছে। [illegible]শষ বিশেষ স্থানে মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে।

সূচীপত্র

অবতরণিকা (Introduction)

নবজাগরণ, ধর্ম-সংস্কার-আন্দোলন ও ভৌগোলিক আবিষ্কার

(The Renaissance, the Reformation and the Geographical Discoveries)

নবজাগরণ (Renaissance)

সকল দেশ-বিদেশের ইতিহাসের ন্যায় ইওরোপের ইতিহাসকেও প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—প্রধানতঃ এই তিন অধ্যায়ে ভাগ করিয়া পাঠ করা হয়। পঠন-পাঠনের দিক দিয়া এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক হইলেও ইহা একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা। কারণ ইতিহাসের ধারা নিরবচ্ছিন্ন এবং কোন উপায়েই এই ধারার গতিরোধ করা যায় না। যাহা হউক ইওরোপের ইতিহাসে গ্রীক ও রোমের সভ্যতা ও প্রভুত্বের যুগকে আদিযুগ বা 'ক্ল্যাসিকাল' যুগ বলা হইয়া থাকে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই যুগের অবসান হয় এবং ইওরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ তুর্কীদের আক্রমণের ফলে কনস্টাণ্টিনোপল-এর পতন পর্যন্ত এই যুগকে মধ্যযুগ বলা হয়। মধ্যযুগ যখন অবসানের দিকে চলিতেছিল সেই সময় ইওরোপে রেনেসাঁস যুগের (Age of Renaissance) সূত্রপাত হয়। রেনেসাঁসের মাধ্যমেই ইওরোপে তথা মানব-ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইয়াছে

রেনেসাঁসের সূচনা

ঠিক কোন্ তারিখ হইতে রেনেসাঁস-যুগের সূত্রপাত হইয়াছে তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কারণ মধ্যযুগেও রেনেসাঁসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীস-রোমের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংস্কৃতির আদর্শের প্রতি ইওরোপীয় জনগণের শ্রদ্ধা এবং ইংলণ্ডের রাজা আলফ্রেডের সময় ইংল্যাণ্ড ও ইওরোপে দ্বাদশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেকে খ্রীষ্টীয় ১৩০০ হইতে ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত এই সময়কে রেনেসাঁস-যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের নিকট পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাণ্টি-নোপল-এর পতনের পর রেনেসাঁস তথা আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া

মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রেনেসাঁসের ও রেনেসাঁস-সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মধ্যযুগ আধুনিক যুগে পরিণতি লাভ করে। অবশ্য আধুনিক ইওরোপের ইতিহাসে ১৪৫৩ সাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বৎসরে কনস্টান্টিনোপল-এর পতন ঘটিলে গ্রিকো-রোমান সংস্কৃতির পণ্ডিতগণ কনস্টান্টিনোপল পরিত্যাগ করিয়া ইটালীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে ইটালীতে তথা ইওরোপে প্রাচীন সংস্কৃতির গভীর চর্চা শুরু হয়। এই চর্চাকে সাধারণভাবে ইওরোপের ইতিহাসে 'রেনেসাঁস' বা 'নব-জাগৃতি' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অবশ্য ইহাই রেনেসাঁসের একমাত্র কারণ নহে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল-এর পতন রেনেসাঁসের সহায়ক হইয়াছিল মাত্র।

রেনেসাঁস মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ

রেনেসাঁস কথাটির প্রকৃত অর্থ হইল পুনর্জন্ম বা নবজাগরণ। অর্থাৎ তুর্কীদের আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে প্রাচীন রোম ও গ্রীক সংস্কৃতির প্রচার রুদ্ধ হইয়াছিল। এই সংস্কৃতির পণ্ডিতগণ ইটালী তথা ইওরোপে উহার পুনর্জন্ম ঘটাইয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণতঃ রেনেসাঁস বলিতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জানিবার উৎসাহ বুঝায়। কিন্তু ব্যাপকভাবে রেনেসাঁসের অর্থ হইল মানব-মনের নবজাগরণ বা পুনর্বিকাশ। মধ্যযুগে মানুষের সমাজ ও ধর্মজীবন এবং উহার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বলিতে বুঝায় এক কুসংস্কারমুক্ত, ধর্ম-নিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ অর্থাৎ সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া মানব-মনকে এক নূতন ও প্রগতিমূলক চিন্তাধারায়

রেনেসাঁস কথাটির অর্থ

মূল অর্থ ও ব্যাপক অর্থ

মধ্যযুগের কু-সংস্কারের স্থলে যুক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টি ও নূতন জীবন-দর্শনের উদ্ভব

বিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস। এই রেনেসাঁস শুধু প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন বা ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য ও দর্শন চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না—বিজ্ঞান, ললিতকলা, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাধারার সৃষ্টি হইল। মানুষ বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা সকল কিছু বিচার করিতে শিখিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মজীবনে যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধানী মনোবৃত্তির উদ্ভব হইল। এক নূতন জীবন-দর্শন মানুষের মনকে সঞ্জীবিত করিল।

রেনেসাঁসের কারণ (Causes of the Renaissance): রেনেসাঁস বা নবজাগরণ একটি আকস্মিক ঘটনা নহে। ইহার মূলে ছিল বহুদিনের প্রস্তুতি ও নানাবিধ কারণ।

মধ্যযুগে শিক্ষা-চর্চার প্রচলন ছিল। অনেক ক্ষেত্রে যাজকগণ অনৈতিকতার পরিচয় দিলেও চার্চগুলি ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। মধ্যযুগে অধিকাংশ চার্চগুলির সহিত শিক্ষায়তনও ছিল—যথা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এই সকল শিক্ষায়তনগুলিতে ধর্মশিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও অন্যান্য বিষয়েও পঠন-পাঠন চলিত। এতদ্ভিন্ন ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে শিক্ষায়তন স্থাপন করিয়া শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টা করিত। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাথমিক রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয়।

(১) মধ্যযুগের চার্চের দান

(২) ক্রুসেডের ফলে নবচেতনার সঞ্চার: আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব

ইহার পর 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধের ফলে এক নূতন চিন্তাধারার বিকাশ হয়। তুর্কীদের সহিত বহুকাল যাবৎ (একাদশ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত) যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইবার ফলে ইওরোপীয়গণ আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। সেই সময় আরবগণ ছিল সভ্যতার উচ্চ শিখরে। আরবগণ জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র. গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে পারদর্শী ছিল। আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব ইওরোপে বিস্তার লাভ করে, এবং এই নূতন জ্ঞানবিস্তারের জন্য বহু শিক্ষায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া ওঠে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই উদ্যম ও কৌতূহল রেনেসাঁসের পথ প্রশস্ত করে। আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইওরোপের সাহিত্যজগতে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। স্পেনে সিড্ (cid) নামক কবিতা স্পেনীয় ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রথম পাদক্ষেপ বলা যায়। ফরাসী ভাষায় রচিত 'শার্লেমান', 'আর্থার' প্রভৃতি চারণ-গীতি, জার্মান ভাষায় রচিত 'মিনেসিঙ্গার', 'নিবেলুঙ্গেনলিড', দাঁতের 'ডিভাইন-কমেডি' ও চসারের 'কেণ্টারবেরিটেল্‌স্'—প্রভৃতি সাহিত্য রচনায় এই নবচেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সাহিত্য-সৃষ্টি ও নব চেতনার প্রভাব

আরবদের সহিত ইওরোপের শুধু যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগাযোগ ঘটিয়াছিল এমন নহে, আরবদেশের সহিত ইওরোপের বাণিজ্য-সম্পর্কও গড়িয়া উঠিয়াছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইটালীর ফ্লোরেন্স, ভেনিস, মিলান প্রভৃতি শহরগুলি ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যকেন্দ্র ও মিলনস্থান। শুধু বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেই যে এই শহরগুলি প্রসিদ্ধ ছিল এমন নহে, এইগুলি সকলপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপ সম্পাদন করিত। শহরে সকল নাগরিক ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সমমর্যাদা লাভ করিত। শহরের আবহাওয়া এক বলিষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের অনুকূল ছিল। সাংস্কৃতিক গৌরবের জন্য

(৩) ইটালীর শহরগুলির অবদান

ফ্লোরেন্স শহরটি 'দ্বিতীয়-এথেন্স' (Second Athens) নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং ইওরোপের নবজাগরণে ইটালীর শহরগুলির অবদান যথেষ্ট ছিল।

(৪) হিউম্যানিস্টদের প্রভাব

রেনেসাঁসের প্রসারে হিউম্যানিস্ট (অর্থাৎ মনের প্রকৃতি সম্পর্কে যাঁহাদের জ্ঞান আছে)-দের অবদান ছিল অপরিসীম। সাহিত্য-সৃষ্টির মাধ্যমে সত্য ও সুন্দরের অনুসন্ধান করা, মানবজাতির জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা, প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্প হইতে যাহা কিছু মানবজাতির জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক তাহা গ্রহণ করিয়া সেই জ্ঞান মানবজাতির মধ্যে বিস্তার করা এবং আধ্যাত্মিক আকর্ষণ ও পরমার্থ চিন্তা ত্যাগ করিয়া ইহলৌকিক সুখবাদকেই সাহিত্যে রূপায়িত করা ইত্যাদি ছিল এইসব হিউম্যানিস্ট বা মনীষীদের জীবনের ব্রত। ইঁহারা অতি সহজ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিয়া জনহিতৈষী কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের আত্মপ্রকাশ

ইওরোপের হিউম্যানিস্টদের মধ্যে ফ্রান্সেস্কো পেত্রার্কের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ইটালীয় রেনেসাঁসের সহিত তাঁহার নাম জড়িত রহিয়াছে। প্রাচীন ল্যাটিন-সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া দুইশত প্রাচীন সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তিনি ছিলেন আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথ-প্রদর্শক। পেত্রার্কের শিষ্যগণের মধ্যে বোক্কাচো ছিলেন প্রধান। গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যে বোক্কাচো-র গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি ল্যাটিন গদ্য-সাহিত্যের জনক বলিয়া স্বীকৃত। চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই নবজাগরণের বিকাশ ঘটিয়াছিল। রেনেসাঁস যুগের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে লিওনার্দো-দাভিঞ্চি, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, টাইটিয়ান প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিওনার্দো-র 'মোনালিসা' ও এ্যাঞ্জেলো র 'শেষ বিচার' সেই যুগের চিত্রশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন কপার্নিকাস, গ্যালিলিও, আইজাক নিউটন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারও রেনেসাঁসের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

(৫) কনস্টান্টিনোপল-এর পতনের প্রভাব

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল তুর্কীগণ কর্তৃক বিজিত হইলে তথাকার পণ্ডিতগণ দলে দলে ইটালীর বিভিন্ন শহর ও শিক্ষায়তন-গুলিতে আশ্রয় লন। তাঁহাদের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি ছিল। এই পণ্ডিতগণ ইটালীর বিভিন্ন শিক্ষায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হইয়া প্রাচীন সাহিত্যের প্রচার শুরু করেন। ফলে ইওরোপীয়দের জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠে এবং গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগের উন্মেষ হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইওরোপে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হইলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর ঘটে। জার্মানীর মেইন্‌জ (Mainz) শহরে জন্‌-উটেনবার্গ মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করিলে গ্রীক, ল্যাটিন গ্রন্থসমূহ এবং বাইবেল মুদ্রণের সুযোগ আসে। ফলে জ্ঞানবৃদ্ধিরও সাহায্য হয়। রেনেসাঁসের প্রভাববিস্তারে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

(৬) মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার

রেনেসাঁসের বিস্তার (Spread of Renaissance): রেনেসাঁস শুধু ইটালীর সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ইহার প্রভাব ইওরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইওরোপের বিদ্যার্থীগণ প্রকৃত অনুসন্ধিৎসার মনোবৃত্তি লইয়া দলে দলে ইটালীর শিক্ষায়তনগুলিতে আসিতে লাগিলেন এবং উন্মুক্ত মনে সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিয়া নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন।

ফ্রান্সে রেনেসাঁসের বিস্তার শুরু হয় গ্রীক ও রোমান সাহিত্য সৃষ্টির ভিতর দিয়া। ইতিপূর্বেই ফ্রান্সে চারণ্‌-গীতির রচনা শুরু হইয়াছিল। ইহার পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালী হইতে রেনেসাঁসের প্রভাব ফ্রান্সে বিস্তার লাভ করিলে ফ্রান্সেও ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের অবলম্বনে নাটক ও গদ্য কবিতার সৃষ্টি শুরু হইল। ফ্রান্সে রেনেসাঁস-যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন মন্‌টেইন ও রেবেলেয়াস। চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও রেনেসাঁসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্যারিসের সেণ্ট গির্জার দেবমূর্তিগুলি রেনেসাঁস যুগের ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ফ্রান্সে রেনেসাঁসের বিস্তার

আলফ্রেডের আমলে ইংল্যাণ্ডে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে সাহিত্যানুরাগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল চসার (১৩৪০-১৪০০) কর্তৃক রচিত 'কেণ্টারবেরি টেলস্' ও ম্যালোরি কর্তৃক রচিত 'মর্টি-ডি-আর্থার'। রানী এলিজাবেথের আমল ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য-জগতে এক যুগান্তর আনিয়াছিল। সেই সময় ইটালীর রেনেসাঁসের প্রভাবও ইংল্যাণ্ডে ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতে থাকে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নবজাগরণের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় টমাস-মোরের 'ইওটোপিয়া' নামক গ্রন্থে। ল্যাটিন ভাষায় রচিত এই গ্রন্থখানি বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ইংল্যাণ্ডের সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার ও প্রাচীন গ্রীকদের প্যাগান ধর্ম (Paganism)-এর প্রতি ইটালীয়দের অনুরাগের তীব্র নিন্দা রহিয়াছে। টমাস-মোর ক্যাথলিক ধর্মানুষ্ঠানেরও তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। রেনেসাঁসের প্রভাবে ইংল্যাণ্ডে অনুবাদ-সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়। বহু

ইংলণ্ডে রেনেসাঁসের বিস্তার

ল্যাটিন ও গ্রীক গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়। কিন্তু ইংরাজ মণীষার চরম বিকাশ ঘটে নাট্য-সাহিত্যে। সংগীতেও রেনেসাঁসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে গিবন্স্, ট্যালিস ও বার্ড-এর নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

স্পেন ও পর্তুগালের রেনেসাঁসের বিস্তার

স্পেন ও পর্তুগালেও রেনেসাঁস সাহিত্যানুরাগের সৃষ্টি করে। স্পেনীয় রেনেসাঁসের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সার্ভেন্টিস (১৫৪৭-১৬১৬। তাঁহার রচিত 'ডন্-কুইক্জোট' (Don Quixote) নামক গ্রন্থখানি বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। পর্তুগালে রেনেসাঁসের প্রভাব ক্যামেওনস (১৫৪২-১৫৮০) কর্তৃক রচিত 'লুসিয়াড্' (Lusiad) নামক মহাকাব্যে পরিলক্ষিত হয়।

জার্মানী ও হল্যাণ্ডে রেনেসাঁসের বিস্তার

জার্মানী ও হল্যাণ্ডে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগরণ ও ধর্মের ক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলন প্রায় একই সময় দেখা যায়। হল্যাণ্ডে ইরাসমাস্ ও জার্মানীতে মার্টিন-লুথার ধর্মকে দুর্নীতি হইতে মুক্ত করার আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। এই দুই দেশে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন এমন ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল যে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তাধারার উদ্ভব সম্ভব হয় নাই। অবশ্য জার্মানীর চিত্র-শিল্পে ইটালীয় চিত্রশিল্পের প্রভাব পড়িয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আলব্রেক্ট-ডুরার (Albrecht Durer)-এর চিত্র উল্লেখ করা যায়।

রেনেসাঁসের ফলাফল (Results of Renaissance) : রেনেসাঁসের ফলাফল ছিল ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী। রেনেসাঁস ছিল মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ। রেনেসাঁসের মাধ্যমেই ইওরোপ তথা বিশ্বের ইতিহাস মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং রেনেসাঁসের ফলাফল আধুনিক ইওরোপ তথা বিশ্ব-ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নূতন জীবন আদর্শ

(১) রেনেসাঁস বা নবজাগরণ মধ্যযুগের তমসাচ্ছন্ন ইওরোপের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে এক নবচেতনার সৃষ্টি করিয়াছিল। মানুষ এক নূতন জীবন-আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইল এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক নূতন মর্যাদা লাভ করিল। মানসিক-মুক্তির ফলে মানুষ অতঃপর রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল।

(২) মধ্যযুগে রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের কোন স্থান ছিল না। মধ্যযুগের রাজনীতির একমাত্র আদর্শ ছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে সকল খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বী জাতি ও রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু রেনেসাঁসের

ফলে ধর্ম-প্রধান রাষ্ট্রীয় আদর্শের স্থলে ধর্ম-নিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রীয় আদর্শের উদ্ভব হইল। মানসিক মুক্তির ফলে মানুষ বুঝিল যে রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হইল জনকল্যাণ সাধন করা। সুতরাং জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শের উদ্ভব হইল রেনেসাঁসের পরোক্ষ ফল।

(২) রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তন

(৩) গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের আলোচনার ফলে এক বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার মানুষের নিকট উন্মুক্ত হইল এবং ইওরোপবাসীর জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিল। সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, শিল্প ও বিজ্ঞানে এক বিরাট মনীষার উদ্ভব হইল। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের আলোচনার ফলে এক ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী ও সমালোচক দৃষ্টিভংগীর উন্মেষ হইল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার ও নূতন দৃষ্টিভংগীর উন্মেষ

(৪) ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে রেনেসাঁস এক যুগান্তর আনিল। পুরাতন সবকিছুকে জানিবার এক প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হইল। মিশর, আবিসিনিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে ঐ সকল দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত হইল।

ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত

(৫) ইওরোপের ধর্মজীবনেও রেনেসাঁসের প্রভাব পড়িয়াছিল। রেনেসাঁস-প্রসূত যুক্তিবাদী ও সমালোচক দৃষ্টিভংগী লইয়া মানুষ ধর্মানুষ্ঠানের দুর্নীতি সম্পর্কে ক্রমেই সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার ফলেই ক্যাথলিক চার্চ ও ক্যাথলিক ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে রিফরম্যাশন বা ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব হইল।

ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন

ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন (Reformation)

আন্দোলনের কারণ (Causes of the Reformation) : (১) ইওরোপের ধর্মজীবনও রেনেসাঁসের প্রভাব হইতে মুক্ত হয় নাই। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রধানতম কারণ ছিল ক্যাথলিক চার্চের নৈতিক অধঃপতন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যে ক্যাথলিক চার্চে ও ধর্মানুষ্ঠানে নানাবিধ দুর্নীতি ও কলুষতা প্রবেশ করিয়াছিল। ধর্মযাজকগণ অনেক ক্ষেত্রে অভিজাত-শ্রেণীর তুলনায় অধিক বস্তুবাদী হইয়া উঠিয়াছিল। উহারা ধর্মচর্চায় দায়িত্ব অবহেলা করিয়া ভোগবিলাস ও নানাপ্রকার দুর্নীতিমূলক কার্যে নিমজ্জিত হইয়া

ক্যাথলিক চার্চের নৈতিক অধঃপতন : দুর্নীতিমূলক ধর্মানুষ্ঠান

পড়িয়াছিল। ধর্মের নামে নানাপ্রকার অধর্ম চলিত। খ্রীষ্টানজগতে পোপ ছিলেন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহাকেই খ্রীষ্টের প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করা হইত এবং তাঁহার নির্দেশ অভ্রান্তজ্ঞানে পালন করা হইত। ধর্মের নামে পোপ খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বীদের নিকট হইতে নানাপ্রকার কর আদায় করিতেন। নানা দেশ হইতে যে অর্থ রোমের ক্যাথলিক ধর্মানুষ্ঠানে আসিত তাহা পোপ ও যাজকগণের বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়সুখে নিয়োজিত হইত। তথাপি পোপ ও যাজকগণের অর্থের চাহিদা মিটিত না। এই কারণে পোপের অর্থভাণ্ডারকে "unbottomed sack of Rome"—বলিয়া বিদ্রূপ করা হইত। এমন কি কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া লোকে কৃত পাপের জন্য অর্থপ্রদান করিয়া পোপের নিকট হইতে মুক্তিপত্র (Indulgence) ক্রয় করিত। অর্থাৎ কৃত পাপের জন্য অর্থদণ্ড দিয়া পোপের নিকট হইতে মুক্তিপত্র ক্রয় করিলেই পাপমুক্ত হওয়া যায় এই ধারণা যাজকগণ প্রচার করিত। পোপ তথা ক্যাথলিক চার্চের এই নৈতিক অধঃপতনের ফলে ইওরোপের জনগণ-প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার উপর সকল শ্রদ্ধা হারাইল এবং ধর্ম-সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করিল।

পোপ ও রাজশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব

(২) পোপ ও রাজশক্তির মধ্যে পারস্পরিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের অপর প্রধান কারণ। পোপ ও রাজশক্তির মধ্যে এই দ্বন্দ্বের ফলে ইওরোপীয় নৃপতিবর্গ উহাদের নিজ নিজ দেশকে পোপের প্রাধান্য হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান হন। পোপের রাজতুল্য ক্ষমতা ইওরোপের নবজাগ্রত রাজশক্তির ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ইওরোপের দেশগুলি পোপের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে এইরূপ মনোভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ

(৩) সকল দেশের মাতৃভাষায় বাইবেল অনূদিত হওয়ায় জনসাধারণ খ্রীষ্টধর্মের মর্মবাণী উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। বাইবেলে পোপের কোন অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে লোকে পোপের নির্দেশ বা অনুশাসন মানিয়া লইতে অসম্মতি প্রকাশ করিল এবং ক্যাথলিক চার্চের নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল।

বিশিষ্ট মনীষীদের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন

(৪) ইটালীর স্যাভানারোলা (Savanarola), ইংল্যাণ্ডের জন ওয়াইক্লিফ্, জার্মানীর জন্-রিউক্লিন এবং হল্যাণ্ডের ইরাসমাস প্রমুখ মনীষীগণ ক্যাথলিক চার্চ ও ধর্মানুষ্ঠানের দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া ইওরোপের জনগণকে এক নূতন পথের সন্ধান

দেন। জন্ ওয়াইক্লিফ্‌কে প্রোটেস্টাণ্ট বা প্রতিবাদী ধর্ম-আন্দোলনের অগ্রদূত বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সকল মনীষীগণ ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের পথ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

প্রত্যক্ষ কারণ : মার্টিন-লুথার

(৬) ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ হইল জার্মানীতে পোপ দশম-লিও কর্তৃক মুক্তিপত্র বিক্রয়ের প্রয়াস। পোপ দশম-লিও জনৈক ধর্ম-যাজককে জার্মানীতে অর্থসংগ্রহের জন্য প্রেরণ করিলে উইটেনবার্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্টিন-লুথার (Martin-Luther) একটি ইস্তাহার প্রচার করিয়া এই অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। এই প্রতিবাদ হইতেই প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্মের (Protestantism) উৎপত্তি হইল এবং সেই সঙ্গে 'রিফরম্যাশন' বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনেরও সূত্রপাত হইল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল (Results of the Reformation Movement) : (১) ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের ফলে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম স্বীকৃত হইল। রোমান ক্যাথলিক চার্চ হইতে প্রোটেস্টাণ্ট চার্চ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মধ্যযুগে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ ছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধীনে সকল খ্রীষ্টান দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের ফলে ক্যাথলিক ধর্মের ঐক্য বিনষ্ট হওয়ায় রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ঐক্যেরও অবসান হইল। শুধু জার্মানী নহে, ইংল্যাণ্ড ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশ রোমান ক্যাথলিক চার্চের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া ধর্মক্ষেত্রে স্বাধীন হইয়া গেল।

ইওরোপে ধর্মনৈতিক ঐক্যের আদর্শের বিনাশ

জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি

(২) ইওরোপে ধর্মনৈতিক ঐক্যের আদর্শ বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের সঞ্চার হইল। জার্মানীতে লুথারানিজম্ (Lutheranism), স্কটল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডে ক্যালভিনিজম্ (Calvinism) এবং ইংল্যাণ্ডে এ্যাংলিক্যানিজম্ (Anglicanism) এই নূতন জাতীয়তাবাদের প্রতীক হইয়া উঠিল। জাতীয়তাবাদের ফলে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পথ প্রশস্ত হইল।

রাজশক্তির প্রাধান্যলাভ

(৩) ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে 'রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম'—এই আদর্শই ইওরোপের নূতন রাষ্ট্রীয় জগতের ভিত্তি হইল। প্রত্যেক দেশে পোপের ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ায় তৎস্থলে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। পোপের শোষণ বন্ধ হওয়ায় এবং ক্যাথলিক চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় বহু দেশের প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী রাজা অর্থের দিক দিয়াও উপকৃত হইলেন।

(৪) ক্যাথলিক্ চার্চের প্রভুত্বের অবসানের ফলে ইওরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের উদ্ভব হইল। প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে ক্যালভিনপন্থীদের ধর্মাধিষ্ঠান ও ধর্মব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইওরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্যালভিনপন্থীদের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল।

গণতান্ত্রিক আদর্শের বিস্তার

জার্মানীতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন (Reformation Movement in Germany): রিফরম্যাশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন মার্টিন লুথার। মার্টিন লুথার উত্তর-জার্মানীর ইসিলবেন্ গ্রামের এক কৃষকপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অপরিসীম প্রতিভার অধিকারী। বাল্যকাল হইতেই তিনি ছিলেন ধর্মপ্রবণ। আত্মার প্রকৃত শান্তিলাভের আশায় তিনি অগ্‌স্টাইন ভ্রাতৃসংঘে যোগদান করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি অগ্‌স্টাইন সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করিলেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্যাথলিক ধর্মের কেন্দ্রস্থল রোম দর্শন করিলেন। রোমে ক্যাথলিক চার্চ ও ধর্মযাজকদের অনাচার ও দুর্নীতি স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি মর্মাহত হইলেন এবং এই দুর্নীতি হইতে ধর্মকে রক্ষা করার সংকল্প গ্রহণ করিলেন।

মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পঞ্চদশ-শতাব্দীর মধ্যে ক্যাথলিক চার্চ ও ক্যাথলিক ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে নানাবিধ দুর্নীতি ও কলুষতা প্রবেশ করিয়াছিল। কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া লোকে অর্থপ্রদান করিয়া পোপের নিকট হইতে 'মুক্তিপত্র' বা পাপ-মুক্তির সার্টিফিকেট ক্রয় করিত। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে পোপ-দশম লিওর প্রতিনিধি জার্মানীতে অর্থসংগ্রহের জন্য 'মুক্তি-পত্র' বিক্রয় করিতে আসিলে মার্টিন-লুথার ৯৫টি যুক্তিসম্বলিত এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া এই অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ফলে পোপ তথা ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ উত্থিত হইল। এই প্রতিবাদ হইতেই প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের উৎপত্তি হয়।

লুথারের ৯৫ দফা প্রতিবাদ

লুথারের প্রতিবাদী ইস্তাহার

পোপ কিংবা চার্চের বিরোধিতা করা মার্টিন-লুথারের সংকল্প ছিল না। চার্চের দুর্নীতি দূর করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মতে প্রকৃত অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসই মুক্তির একমাত্র উপায়। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে লুথার একখানি পুস্তিকা ('Babylonian Captivity') প্রকাশ করিয়া পোপের ধর্মগুরু-পদের অধিকার অস্বীকার করিলেন। যাজকগণ ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত এই কথা অস্বীকার করিলেন এবং

'ব্যাবিলনিয়ান ক্যাপটিভিটি'

ধর্মানুষ্ঠানে যাজকদের প্রাধান্য অস্বীকার করিলেন। পোপের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদের ফলে পোপ লুথারকে চার্চের 'বহিষ্কৃত' বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

কিন্তু ইহাতেও লুথার দমিলেন না। জার্মানীর বহু যুক্তিবাদী ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সমর্থন লাভ করায় লুথার শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। এই অবস্থায় পোপ দশম লিও-র ইচ্ছানুক্রমে পবিত্র রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লস, ওয়ার্মস্ (Worms) নামক স্থানে এক সভা আহ্বান করিয়া লুথারকে তাঁহার মতবাদ ত্যাগ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু লুথার তাহা করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সম্রাট ও পোপ তাঁহাকে 'আইনের-বহির্ভূত' (out-law) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইতিমধ্যে লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিলে জার্মানীতে লুথারবাদ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। বহু জার্মান ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম গ্রহণ করিল।

১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে লুথারবাদকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইলে জার্মানীতে উহার তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইল। এই সময় হইতে লুথারের শিষ্যগণ প্রোটেস্টাণ্ট নামে পরিচিত হইল। জার্মানীর এই ধর্ম আন্দোলন 'রিফরম্যাশন' নামে অভিহিত। ১৫৪৬ হইতে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধ চলিল। এই ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই মার্টিন-লুথারের মৃত্যু হয়।

লুথারের মৃত্যু

প্রথম দিকে জার্মানীর প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে ঐক্যের অভাব থাকায় সম্রাট পঞ্চম চার্লস জয়ী হইলেন। স্পেনীয় সৈন্যবাহিনী নিষ্ঠুর-ভাবে জার্মানীর প্রোটেস্টাণ্টগণকে দমন করিতে লাগিল। কিন্তু ইতিমধ্যে জার্মানীর প্রোটেস্টাণ্ট নৃপতিগণ সম্মিলিত-ভাবে সম্রাট চার্লসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে চার্লস প্রোটেস্টাণ্ট দমনের আশা ত্যাগ করিলেন। অবশেষে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অগস্‌বার্গ-এর সন্ধি (Peace of Augsburg) দ্বারা জার্মানীতে সাময়িকভাবে ধর্মযুদ্ধের অবসান হইল। এই সন্ধির শর্তানুসারে (১) জার্মানীতে লুথারবাদ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করিল, (২) প্রত্যেক দেশের রাজা সেই দেশের ধর্মব্যবস্থা প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং (৩) রাজার ধর্মই প্রজাবর্গের ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইল।

সম্রাট চার্লসের বিরুদ্ধে জার্মান নৃপতিগণের অস্ত্রধারণ

অগস্‌বার্গের সন্ধি (১৫৫৫) ধর্মযুদ্ধের অবসান

প্রথম অধ্যায়

ইওরোপের বাহিরে ইওরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশ বিস্তার

[অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত]

উপনিবেশ বিস্তারের কারণঃ প্রথমদিকে ইওরোপের বাহিরে ইওরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশ বিস্তারের দুইটি প্রধান কারণ ছিল —ধর্মসংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক।

ধর্ম সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক কারণ

ধর্মযুদ্ধের যুগে (Age of Crusades) বহির্জগতের সহিত ইওরোপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই যুগে ইওরোপে এশিয়ার পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সেই সময় প্রয়োজনীয় বহু পণ্যদ্রব্যের জন্য ইওরোপ বহির্জগতের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে এশিয়া ও মধ্য-প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য আরব বণিকদের একচেটিয়া ছিল। আরব-বণিকগণ এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে বহু প্রয়োজনীয় ও বিলাসের সামগ্রী ইটালীয় বণিকদের নিকট বিক্রয় করিত। ইটালীয় বণিকগণ সেইগুলি উচ্চদরে ইওরোপের অপরাপর দেশগুলিতে বিক্রয় করিত। ধর্মযুদ্ধের যুগে ইওরোপে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে মধ্য-প্রাচ্যে তুর্কীদের প্রভুত্ব স্থাপন প্রভৃতি কারণে ইওরোপে এক দারুণ অর্থসংকট দেখা দেয়। ফলে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের দ্বারা বহির্জগৎ হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করার এক প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে উহাদের চেষ্টাও শুরু হইল।

এই বিষয়ে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ ইওরোপীয় বণিকগণকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে খ্রীষ্টান-ধর্মযাজকগণ ইওরোপে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার সমাপ্ত করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকায় উহা প্রচারের জন্য বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই দুই মহাদেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাণিজ্যের সম্ভাবনার কথা ইওরোপে প্রচার করেন। ইহাতে প্রলুব্ধ হইয়া ইওরোপীয় বণিকগণ দলে দলে বাণিজ্য-উদ্দেশ্যে সমুদ্র-অভিযানে বাহির হইয়া পড়ে।

ভৌগোলিক আবিষ্কার (Discoveries)

ইওরোপে ধর্মযুদ্ধের পর বহির্জগতে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণের ধর্মপ্রচার এবং এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাণিজ্যের সম্ভাবনায় উৎসাহিত হইয়া ইওরোপীয় নাবিক ও বণিকগণ দলে দলে সমুদ্র-অভিযানে বাহির হয়। এই

ব্যাপারে পর্তুগালের প্রিন্স হেনরী ও ইংল্যাণ্ডের টিউডর-বংশীয় রাজা সপ্তম হেনরী-র উৎসাহদান এবং দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র, নক্ষত্রপরিমাপক যন্ত্র বিষুবরেখা ও অক্ষরেখা নিরূপণ-যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার দেশ-আবিষ্কারের সহায়ক হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধি ও দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের ফলে সমুদ্রযাত্রা কিছুটা সহজ হইয়াছিল। ইহার পর নূতন নূতন দেশ ও সমুদ্রপথ আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হইল।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের সহায়ক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারের পটভূমিকা হইল ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নূতন জলপথের আবিষ্কার। অতি প্রাচীনকাল হইতে গ্রীস, মিশর, রোম প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের জল ও স্থলপথে বাণিজ্যের চলাচল ছিল। কিন্তু অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরব বণিকগণ ভূমধ্যমহাসাগর, আরবসাগর ও ভারত মহাসাগরে উহাদের আধিপত্য স্থাপন করিলে ইওরোপীয় বণিকদের নিকট ভারতের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। ইওরোপীয় বণিকগণকে আরব বণিকদের নিকট হইতে ভারতীয় সামগ্রী ক্রয় করিতে হইত। সুতরাং ইওরোপীয় নাবিক ও বণিকগণ ভূমধ্যসাগরের জলপথ ও পার্শ্ববর্তী স্থলপথের পরিবর্তে নূতন জলপথের আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু করিল।

ইওরোপীয় নাবিকগণ কর্তৃক বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ব্যাপারে পর্তুগীজ ও ইটালীয় বণিক ও নাবিকগণ প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ইতিহাসে পর্তুগালের প্রিন্স হেনরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার চেষ্টা ও উৎসাহে বিভিন্ন নৌ-যন্ত্রপাতি ও দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও উন্নতি সাধিত হয়। নৌ-বিদ্যা ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি ইতিহাসে 'নাবিক-হেনরী' (Henry the Navigator) নামে খ্যাত।

হেনরী দি নেভিগেটর

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বার্থলোমিউ দিয়াজ (Bartholomeu Diaz) নামে জনৈক পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-সীমানায় 'উত্তমাশা অন্তরীপ' (Cape of Good Hope) প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে আসিবার একটি নূতন জলপথের সন্ধান দেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে জেনোয়া-নিবাসী কলম্বাস মসলা দ্বীপ আবিষ্কারের চেষ্টায় তিনখানি জাহাজ লইয়া যাত্রা করেন। তিনি আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। আমেরিকা মহাদেশ সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত ইওরোপ অজ্ঞ ছিল। অবশ্য কলম্বাস নিজেই জানিতেন না যে তিনি একটি নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করিয়াছেন। পরবর্তী ফ্লোরেন্স নিবাসী নাবিক

দিয়াজ (১৪৮৬)

কলম্বাস (১৪৯২) : আমেরিগো ভেসপুচ্চি (১৫০৩)

আমেরিগো-ভেসপুক্কি ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা মহাদেশের উপকূল পরিভ্রমণ করিয়া এই মহাদেশের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁহার নামানুসারে এই মহাদেশের নাম হইল আমেরিকা। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা নামে অপর এক পর্তুগীজ নাবিক উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কালিকট বন্দরে আগমন করেন। এইভাবে ইওরোপ হইতে ভারতে আসিবার এক নূতন জলপথ আবিষ্কৃত হইল। এই পথ দিয়া পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি ইওরোপীয় বণিককুল একের পর এক ভারতে আগমন করিয়া উহাদের বাণিজ্য স্থাপন করে এবং শেষ পর্যন্ত ইংরাজগণ ভারতে উহাদের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করে।

ভাস্কো-ডা-গামা (১৪৯৮)

ব্যালবোয়া নামে জনৈক স্পেনীয় নাবিক প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন (১৫১৩)। ম্যাগিলন নামে অপর এক স্পেনীয় নাবিক স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের অনুমতি ও সাহায্য লইয়া দক্ষিণাভিমুখে আতলান্তিকের পথে যাত্রা করেন এবং অনতিকাল মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে একটি দ্বীপ আবিষ্কার করেন। স্পেনের রাজপুত্র ফিলিপের নামানুসারে এই দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ হইল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ (১৫২১)। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ইতিহাসে ম্যাগিলনের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

ম্যাগিলন

কর্টেজ নামে জনৈক স্পেনীয় নাবিক মেক্সিকো অধিকার করিয়া তাহা স্পেন-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। জন ক্যাবট, সিবাসিটয়ান ফ্যাবট নামে ইংরাজ নাবিকগণ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও লাব্রাডর আবিষ্কার করেন। ফরাসী নাবিক কার্টিয়ার সেণ্ট লরেন্স ও কানাডা আবিষ্কার করেন (১৫৩৬)।

কর্টেজ, সিবাস্টিয়ান

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল (Results): (১) নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন দেশের সাহিত ইওরোপের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। নবাবিষ্কৃত দেশগুলি কাঁচামাল আমদানি ও তৈয়ারী মাল রপ্তানির কেন্দ্রে পরিণত হইল। ইহার ফলে বৃহৎ বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইল এবং কালক্রমে ধনী ও শ্রমিক সমাজের উৎপত্তি হইল। (২) সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ভৌগোলিক আবিষ্কারের অবদান কম নহে। সমাজে মধ্যবিত্ত ও বণিক শ্রেণীর উদ্ভব হইল। (৩) বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ নবাবিষ্কৃত দেশগুলিতে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারে বাহির হইলেন এবং ইহার ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হইল।

(খ) ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক বিস্তারের আগ্রহ ক্রমে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করিল। ষোড়শ শতাব্দীতে শুরু হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইল পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ এবং আমেরিকা।

(১) পর্তুগীজদের উপনিবেশ বিস্তার

ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক বিস্তারের ব্যাপারে পর্তুগাল ও স্পেন ছিল অগ্রণী। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্পেনের শাসনাধীন থাকাকালীন পূর্ব দ্বীপপুঞ্জের সহিত পর্তুগালের একচেটিয়া ব্যবসার সমাপ্তি ঘটে। জাভায় ওলন্দাজগণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং ভারতে ইংরাজদের বাণিজ্য শুরু হইল। ১৬৪০ হইতে ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পর্তুগাল স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত থাকাকালীন উহার উপনিবেশগুলি ওলন্দাজদের হস্তগত হইল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একমাত্র আফ্রিকার সমুদ্রোপকূল এবং সুদূর-প্রাচ্যে ম্যাকাও, গোয়া, দমন, দিউ ও টিমোর ভিন্ন পর্তুগালের অবশিষ্ট উপনিবেশগুলি অপরাপর ইওরোপীয় দেশগুলির অধিকারে চলিয়া গেল।

সুদূর প্রাচ্য ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসা হস্তচ্যুত হইলে পর্তুগাল দক্ষিণ-আমেরিকার প্রতি মনোনিবেশ করিল। তের বৎসর ধরিয়া (১৬৪১-৫৪ খ্রীঃ) যুদ্ধ করিবার পর ব্রেজিলের পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকগণ ব্রেজিলের উপকূল হইতে ওলন্দাজগণকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রেজিলে পর্তুগীজদের ব্যবসা-বাণিজ্য অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইল।

(২) স্পেনের উপনিবেশ বিস্তার

সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগালের ন্যায় স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের এইরূপ ব্যাপক ক্ষতি হয় নাই। ইওরোপে দুর্বল হইয়া পড়িলেও স্পেনের আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলি ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশগুলি অক্ষুন্ন ছিল। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত স্পেনের উপনিবেশগুলি ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদের দখলে চলিয়া যায়। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত জামাইকা দখল করিল। দক্ষিণ-আমেরিকার অন্তর্গত গিয়ানা অঞ্চলে ওলন্দাজ ও ফরাসীগণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া স্পেনীয়গণ মেক্সিকো অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিল। স্পেনীয়গণ আমেরিকায় নিজেদের বাণিজ্য ও উপনিবেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইলেও, সপ্তদশ শতাব্দীতে উহাদের ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসীদের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইয়াছিল।

(৩) হল্যাণ্ডের উপনিবেশ বিস্তার

সপ্তদশ-শতাব্দীতে সমুদ্রের উপর ওলন্দাজদের প্রভুত্ব ছিল। নৌ-শক্তির বলেই উহারা স্পেনের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা ও রাষ্ট্রের পরিধির দিক দিয়া হল্যাণ্ড অপরাপর ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে উহারা ছিল শ্রেষ্ঠ। বাল্টিক উপকূলে উহাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। নিকট-প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যেও উহারা এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিত। আমেরিকার সহিতও উহাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আমেরিকার অন্তর্গত নিউ-আমস্টারডাম ছিল উহাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। পূর্ব-প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত উহারা সংশ্লিষ্ট ছিল।

হল্যাণ্ডের বাণিজ্য-উন্নতি ও উপনিবেশ বিস্তারের ব্যাপারে ডাচ্-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এক সনদ (Charter) অনুসারে কোম্পানিকে যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপন করার এবং উপনিবেশগুলিকে শাসন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ব-প্রাচ্যে ডাচ্-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি পর্তুগীজগণকে বিতাড়িত করিয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। স্পেনের সহিত এই কোম্পানিকে বহুদিন পর্যন্ত সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। ওলন্দাজগণ ঔপনিবেশিক-নীতি বলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি বুঝিত। আমেরিকায় উহাদের উপনিবেশের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উহারা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, হাড্‌সন-নদীর উপত্যকা, গিয়ানার এক বৃহদংশ ও ব্রেজিলের কিছু অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। অবশ্য ইংরাজগণ কর্তৃক উহারা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে গিয়ানা হইতে বিতাড়িত হয়। কিন্তু পূর্ব প্রাচ্যে ওলন্দাজগণ এক শক্তিশালী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উহারা পর্তুগীজগণকে বিতাড়িত করিয়া 'মসলা-দ্বীপপুঞ্জে' (ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ) উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহা ছাড়া জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিওতেও উহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতেই ওলন্দাজদের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই শতাব্দীতেই তিনবার ইংল্যাণ্ড এবং তিনবার ফ্রান্সের সহিত উহাদের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউট্রেক্টের সন্ধির পর হইতে ওলন্দাজদের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক অবনতি ঘটিতে থাকে।

(৪) ইংরাজদের উপনিবেশ বিস্তার

সপ্তদশ শতাব্দীতে স্বদেশের জনসংখ্যা ও পরিধির দিক দিয়া ফ্রান্স ও স্পেনের তুলনায় ক্ষুদ্র হইয়াও ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তৃতির পথে ইংল্যাণ্ড বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত জেম্‌সটাউনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর হইতে উত্তর-আমেরিকায় আরও কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়—যেমন প্লাইমাউথ, বোস্টন, মেরিল্যাণ্ড, নিউহ্যাভেন, ক্যারোলিনা ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও ইংরাজদের উপনিবেশ বিস্তারলাভ করে—যেমন সেণ্ট্ ক্রিস্টোফার, বারমুদা, বারবাদোস, জামাইকা ইত্যাদি। ওলন্দাজ ও ফরাসীদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়া আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলেও ইংরাজ-উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ওলন্দাজদের বিরোধিতার ফলে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপনে ব্যর্থ হইয়া ইংরাজগণ ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাট বন্দরে ইংরাজদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইল। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে উহারা ওরমাজ দখল করিয়া পারস্য-উপসাগরে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিল। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উহারা মাদ্রাজে অপর একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করিল। ইহার পর দশ বৎসরের মধ্যে হুগলীতে উহাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইল। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে মোগল সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও কলিকাতায় ইংরাজদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইল। এইভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই ভারতের উভয় উপকূলে ইংরাজেরা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রথমদিকে ব্রিটিশ-সরকার উপনিবেশগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালক্রমে এই হস্তক্ষেপ-নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং উপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইংলিশ-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও সামুদ্রিক-ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে।

(৫) রাশিয়ার উপনিবেশ বিস্তার

পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ যখন সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তারে ব্যস্ত, সেই সময় রাশিয়াও পূর্বাঞ্চলে সাম্রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাতার রাষ্ট্রদ্বয় কাজান (Kazan) ও আসত্রাখান (Astrakhan) রাশিয়ার অধিকারভুক্ত হইল। রাশিয়ার সীমানা উরাল পর্বত ও ক্যাসপিয়ান-সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া রাশিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈকাল-হ্রদ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিল। রুশ-অধিকৃত নূতন অঞ্চলগুলিতে ক্রমশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রসারলাভ করিতে লাগিল। সপ্তদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়া আমুর উপত্যকা পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া চীনের সংস্পর্শে আসিল। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাই হইল চীনের সহিত ইওরোপীয় রাষ্ট্রের প্রথম সন্ধি। ইহার দ্বারা রাশিয়া চীন সাম্রাজ্যে বাণিজ্যাধিকার লাভ করিল। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সহিত অপর একটি সন্ধি দ্বারা রাশিয়া পিকিং-এ বৎসরে দুইশত রুশ-ব্যবসায়ীদের আগমনের অধিকার পাইল।

(৬) ফরাসীদের উপনিবেশ বিস্তার

উপনিবেশ বিস্তারের ব্যাপারে ফ্রান্সও উদাসীন ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফ্রান্স উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে কুইবেকে উহাদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিছু অঞ্চলে ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়—যেমন মারটিনিক (Martinique), গ্রেনাডা (Grenada), সেণ্ট বারথলোমিউ (St. Bartholomew), এবং সেণ্ট ক্রিস্টোফার (St. Christopher)। এতদ্ভিন্ন নোভাস্কশিয়া, গিয়ানা ও আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূলেও ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। প্রথমদিকে ফরাসী উপনিবেশগুলি ছিল জনবিরল।

কিন্তু ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে কোলবার্ট ফ্রান্সের অর্থ-মন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পর হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা নূতন করিয়া শুরু হয়। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়। নৌ-শক্তির সাহায্যে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ওলন্দাজগণকে বিতাড়িত করা হয়। আমেরিকার অন্তর্গত মিসিসিপি অঞ্চলে ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং লুসিয়ানা উহাদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতেও ফরাসীদের ছয়টি বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। কিন্তু ওলন্দাজের সহিত সংঘর্ষের ফলে একমাত্র সুরাট ও পণ্ডিচারী ভিন্ন অবশিষ্ট কুঠিগুলি উহাদের হস্তচ্যুত হয়। ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে করমোণ্ডল উপকূলে এবং বাংলাদেশে (চন্দননগর) উহাদের আরও কয়েকটি কুঠি স্থাপিত হয়।

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা (Anglo-French Rivalries):

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল হল্যাণ্ড। কিন্তু হল্যাণ্ডের নৌ-শক্তির পতনের পর এবং হল্যাণ্ডরাজ উইলিয়াম ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত হইলে পর (ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের পর, ১৬৮৮) ইঙ্গ-ওলন্দাজ প্রতিদ্বন্দ্বীতার অবসান হয়। অতঃপর ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বি হইল ফ্রান্স। ফরাসী-মন্ত্রী কোলবার্টের চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অভাবনীয়ভাবে বিস্তারলাভ করে। ফ্রান্স আমেরিকা ও ভারতেও সাম্রাজ্য-বিস্তারে উদ্যোগী হইলে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে আঘাত পড়িল। ফলে উভয় দেশের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ শুরু হইল।

ইওরোপে সংঘটিত অগসবার্গ-লীগের যুদ্ধ (War of the League of Augsburg—1688-1697) হইতে ইঙ্গ-ফরাসী ঔপনিবেশিক সংঘর্ষের প্রথম সূত্রপাত হয়।* হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক উইলিয়ামের নেতৃত্বে ফ্রান্সের-বিরোধী ইওরোপীয় শক্তিবর্গ অগ্‌সবার্গ-শক্তি সংঘ গঠন করিয়াছিল। ফ্রান্সের সহিত ইওরোপীয় শক্তিগুলির যুদ্ধ শুধু ইওরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই ধরনের যুদ্ধ আমেরিকায় ইংরাজ ও ফরাসী ঔপনিবেশিকগণের মধ্যেও সংঘটিত হইয়াছিল এবং তাহা 'রাজা উইলিয়ামের যুদ্ধ' (King William's War) নামে খ্যাত। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের পর হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক উইলিয়াম ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলে ইংল্যাণ্ডও অগ্‌সবার্গ শক্তিসংঘে যোগদান করিল। ফলে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে।

প্রথম পর্ব

এই দুই শক্তি অন্যূন ২২৫ বৎসর ধরিয়া ঔপনিবেশিক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত রহে এবং উহার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। রাইসউইক-এর সন্ধি দ্বারা ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম পর্বের অবসান হইল। এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের নৌ-শক্তি বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পর্ব

স্পেনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৭০১-১৭১৩) হইতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হইল। এই যুদ্ধের অপরাপর কারণের সহিত স্পেন-অধিকৃত আমেরিকায় ফ্রান্স কর্তৃক ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ বিপন্ন হইবার কারণ জড়িত ছিল।

স্পেনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ ও ইংল্যাণ্ডের লাভ

ইওরোপ ও আমেরিকার রণাঙ্গণে ইংরাজ-নৌ-শক্তির নিকট ফ্রান্স চূড়ান্তভাবে পরাজিত হইল। ইউট্রেক্টের সন্ধি (১৭১৩) দ্বারা বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্য সূচিত হইল। (১) ইওরোপে ইংল্যাণ্ড জিব্রালটার, মিনর্কা

* ফরাসী-রাজ চতুর্দশ-লুই-এর আক্রমণাত্মক-নীতির বিরুদ্ধে হল্যাণ্ডের নেতৃত্বে জার্মানী, সুইডেন, স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইয়াছিল তাহা লীগ-অফ-অগসবার্গ নামে পরিচিত।

লাভ করিয়া ভূমধ্যসাগরে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিল; (২) আমেরিকায় ইংল্যাণ্ড নোভাস্কশিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড লাভ করিল এবং (৩) স্পেনিশ-আমেরিকায় বাণিজ্যাধিকার লাভ করিল। ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে ইউট্রেক্টের সন্ধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্স ও স্পেনের সিংহাসন সংযুক্ত না হওয়ায় বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের পক্ষে ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইবার পথ রুদ্ধ হইল। অপরদিকে আতলান্তিক মহাসাগরে ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্য স্থাপিত হইল এবং স্পেনীয়-আমেরিকার সহিত বাণিজ্যের অধিকার লাভ করায় ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইল।

ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ইউট্রেক্ট সন্ধির গুরুত্ব

ইউট্রেক্টের সন্ধি আমেরিকায় ফ্রান্স ও স্পেনের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থবিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ফলে ইউট্রেক্টের সন্ধির পর হইতে আমেরিকায় ফরাসী ও স্পেনীয় ঔপনিবেশিকগণের সহিত ইংরাজ ঔপনিবেশিকগণের দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে।

অষ্ট্রিয়ার-উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৭৪০-৪৮) হইতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার তৃতীয় পর্ব শুরু হইল। ইওরোপের ন্যায় আমেরিকায় ও ভারতেও উভয় জাতি সংগ্রামে লিপ্ত হইল। ভারতে ফরাসীগণ মাদ্রাজ দখল করিল। অপরদিকে আমেরিকায় ইংরাজগণ লুইবার্গ দখল করিল। আয়লাস্যাপলের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল। ইংরাজ ও ফরাসীগণ উভয় উভয়ের নিকট বিজিত অঞ্চল প্রত্যর্পণ করিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হইল ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ পর্ব।

তৃতীয় পর্ব

অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ ও ইংল্যাণ্ডের লাভ

সংক্ষিপ্তসার

নবজাগরণ: মধ্যযুগ যখন অবসানের দিকে যাইতেছিল—সেই সময় ইওরোপে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। সাধারণভাবে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের নিকট কনস্টান্টিনোপল-এর পতন ঘটিলে সেই সময় হইতে রেনেসাঁসের আরম্ভ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। রেনেসাঁস কথাটির মূল অর্থ হইল পুনর্জন্ম। সাধারণতঃ রেনেসাঁস বলিতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতি সম্পর্কে জানিবার উৎসাহ বুঝায়। কারণ—প্রথমতঃ ক্রুসেডের ফলে ইওরোপীয়গণ আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। আরবদের সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব ইওরোপে বিস্তার লাভ করে। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই উদ্যম রেনেসাঁসের সহায়ক হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ ইটালীর শহরগুলির আবহাওয়া এক বলিষ্ঠ,

আত্মনির্ভরশীল ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের অনুকূল ছিল। সাংস্কৃতিক গৌরবের জন্য ফ্লোরেন্স শহরটি বিখ্যাত ছিল। তৃতীয়তঃ রেনেসাঁসের প্রসারে হিউম্যানিস্টদের অবদান ছিল অপরিসীম। মানব-জাতির জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করাই ইহাদের জীবনের ব্রত ছিল। এই সকল হিউম্যানিস্টদের মধ্যে পেত্রার্ক, বোক্কাচো, লিওনার্দো-দা-ভিনিসি—প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চতুর্থতঃ কনস্টান্টিনোপল-এর পতনের পর তথাকার গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পণ্ডিতগণ ইটালীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানিবার প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহল ইওরোপে দেখা দিল। পঞ্চমতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনিল এবং রেনেসাঁসের বিস্তারে যথেষ্ট সহায়ক হইল। রেনেসাঁসের বিস্তার—ইটালীর সীমানা অতিক্রম করিয়া রেনেসাঁসের প্রভাব ইওরোপে বিস্তারলাভ করিল। ফ্রান্সে রেনেসাঁসের বিস্তার শুরু হয় গ্রীক ও রোমান সাহিত্য সৃষ্টির ভিতর দিয়া। ইংল্যাণ্ডে সাহিত্যের ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের প্রভাব দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ডের নাট্য-সাহিত্য ও সংগীতেও রেনেসাঁসের প্রভাব দেখা দেয়। স্পেন ও পর্তুগালে রেনেসাঁস সাহিত্যানুরাগের সৃষ্টি করে।

রেনেসাঁসের ফলাফল ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। ইহার প্রধান ফলাফল হইল নূতন জীবন আদর্শ, রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার, ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত এবং ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন—কারণ—প্রথমতঃ ক্যাথলিক চার্চের নৈতিক অধঃপতন ও দুর্নীতিমূলক ধর্মানুষ্ঠান। পোপ ও ধর্মযাজকগণের ধর্মচর্চার কাযে অবহেলা এবং উহাদের ভোগবিলাস ও কলঙ্কময় জীবন ইওরোপের জণগণকে প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ পোপের রাজতুল্য ক্ষমতা ও মর্যাদা ইওরোপের নবজাগ্রত রাজশক্তির ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনূদিত হইলে ইওরোপের জনগণ ধর্মের ব্যাপারে পোপের অনুশাসন মানিয়া লইতে অসম্মত হইল। চতুর্থতঃ জার্মানীতে পোপের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথারের প্রতিবাদ ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করিল। ফলাফল—ইওরোপে ধর্ম নৈতিক ঐক্যের আদর্শের বিনাশ হইল, ইওরোপের সর্বত্র জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের সঞ্চার হইল, সর্বত্র রাজশক্তি প্রাধান্য লাভ করিল এবং কোন কোন দেশে গণতান্ত্রিক আদর্শের সূত্রপাত হইল।

ইওরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশ বিস্তার—প্রথমদিকে ধর্ম নৈতিক ও অর্থ নৈতিক কারণে এবং পরবর্তীকালে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইওরোপীয় জাতিগুলির বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক বিস্তার শুরু হয়। প্রথমদিকে আরব বণিকগণ ইওরোপীয়দের চাহিদা মিটাইত। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যে তুর্কীদের আধিপত্য স্থাপিত হইলে আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিনষ্ট হয়। ফলে ইওরোপে এক দারুণ অর্থসংকট দেখা দেয় এবং ইওরোপবাসীদের মধ্যে জীবনধারণের জন্য বহির্জগৎ হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করার এক প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধি, দিকনির্ণয় করার যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এবং এশিয়ায় ও আফ্রিকায় বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনার কথা প্রচারিত হইলে ইওরোপীয় বণিকগণ দলে দলে বাণিজ্য-উদ্দেশ্যে সমুদ্র অভিযানে বাহির হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যেই প্রাচ্যের এবং প্রশান্ত ও আতলান্তিক মহাসাগরীয় বহু অঞ্চলের আবিষ্কার হয় এবং ইওরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে সেই সকল অঞ্চলে উপনিবেশ ও বাণিজ্য বিস্তারের উদ্যোগ শুরু হয়।

উপনিবেশ বিস্তারের ব্যাপারে অগ্রণী ছিল পর্তুগাল ও স্পেন, পর্তুগীজগণ আতলান্তিক উপকূল অধিকার করিয়া প্রাচ্য-অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই প্রসঙ্গে পর্তুগীজ রাজকুমার হেনরীর নাম উল্লেখ-

যোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীতেই পর্তুগীজগণ সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, কোচিন, ওরমুজ, মোজাম্বিক, গোয়া, ব্রেজিল প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। কলম্বাস, ব্যালবোয়া, ম্যাগিলন প্রভৃতি স্পেনীয় নাবিকগণ আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল আবিষ্কার করেন। আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো, পেরু, আর্জেন্টিনা, চিলি এবং ক্যারিবিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে স্পেনের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সমৃদ্ধির ভিত্তি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতেই রচিত হয়। জন-ক্যাবট উত্তর-আমেরিকা আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে আমেরিকার অন্তর্গত বোস্টন, হার্টফোর্ড, নিউ-হ্যাভেন, মেরীল্যাণ্ড এবং পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইংরাজদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ভারতে মসলিপট্টম, সুরাট, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলা দেশেও ইংরাজদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ফ্রান্সও নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া ছিল না। ফরাসী নাবিকদের মধ্যে কার্টিয়ারের নাম উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ-শতাব্দার প্রথমভাগেই ফরাসীগণ কুইবেক, কানাডা, আকেডিয়া এবং ভারতে পণ্ডিচারী, মাহে, কারিকল, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ওলন্দাজগণও এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল। উহারা গিয়ানা, সিংহল, জাভা, সুমাত্রা ও মসলা দ্বীপপুঞ্জ হইতে পর্তুগীজ-গণকে বিতাড়িত করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানেও উহাদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

সপ্তদশ-শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল হল্যাণ্ড। অষ্টাদশ-শতাব্দীতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ এই প্রতিদ্বন্দ্বীতার চরম নিদর্শন।

প্রশ্নমালা

১। রেনেসাঁস কথাটির অর্থ কি? ইহার কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
[What is meant by Renaissance? Describe its causes and results.]

২। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
[Describe the causes and result of the Reformation.]

৩। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।
[Write a short account of the Reformation in Germany up to 1555.]

৪। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইওরোপীয় দেশগুলির বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।
[Give a short account of the commercial and colonial expansion of the European countries upto the mid 18th century.]

৫। ইওরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ বিস্তারের কারণগুলি বর্ণনা কর।
[Describe the causes of the colonial expansion of the European countries.]

প্রথম অধ্যায়

ইওরোপের রাজনৈতিক অবস্থা (১৭৪০-১৭৬৩)

(Political Condition of Europe)

রাজনৈতিক অবস্থা (Political Condition): ইওরোপের ইতিহাসে ১৭৪০ খ্রীঃ হইতে ১৭৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত—এই সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের (১৭০১-১৩) পর ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাময়িক অবসান হইয়াছিল মাত্র। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে (১৭৪১) এবং তৃতীয় পর্ব সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩)। দ্বিতীয়তঃ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলে প্রাশিয়ার ক্রমোন্নতির যুগ শুরু হয় এবং প্রাশিয়ার অভ্যুত্থান ইওরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। তৃতীয়তঃ, এই সময়ের মধ্যে বাল্টিক সাগরে স্বীয় প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া রাশিয়া উত্তর-ইওরোপে প্রবেশ করিলে ইওরোপের ইতিহাসে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

ইওরোপের ইতিহাসে ১৭৪০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের বৈশিষ্ট্য

চতুর্থতঃ, এই সময়ের মধ্যে ইওরোপে প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসকশ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইলেন প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট, রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিন ও অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ: অষ্টাদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে ইওরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

জার্মানী: ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে জার্মানবাসীর জাতীয়তাবোধ বলিয়া কিছুই ছিল না। ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর (১৬১৮-১৬৪৮) জার্মানী ৩০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল রাষ্ট্রের নৃপতিগণ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। সেই সময় সমগ্র জার্মানী তথা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন অষ্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ-বংশীয় রাজা। জার্মান-নৃপতিগণ অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের প্রতি মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করিতেন মাত্র। রাজনৈতিক জীবনের ন্যায় অর্থনৈতিক জীবনেও জার্মানবাসীর কোনরূপ ঐক্য ছিল না। সুতরাং ওয়েস্টফেলিয়া-সন্ধি (১৬৪৮)-র

শতধা বিভক্ত জার্মানী

পর হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জার্মানীর ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অনৈক্য এবং সামরিক দুর্বলতা।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম নৈতিক অনৈক্য

জার্মান-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোনরূপ ঐক্য বা সংহতি না থাকায় জার্মানীর সামরিক শক্তিও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-'৬৩) জার্মানী তথা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের চরম দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। জার্মান-রাষ্ট্রগুলি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

অষ্ট্রিয়া ঃ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অষ্ট্রিয়া ছিল সর্বপ্রধান। ১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় একবার্ট-এর সিংহাসনলাভের সময় হইতে হ্যাপসবার্গবংশীয় নৃপতিগণ অষ্ট্রিয়ায় রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন এবং জার্মান-সাম্রাজ্যের সম্রাট-পদ অলংকৃত করিয়া আসিতেছিলেন। ভিয়েনা ছিল অষ্ট্রিয়া-রাজ্যের রাজধানী। ওয়েস্টফেলিয়ার-সন্ধির পর হইতে অষ্ট্রিয়ার নৃপতিগণ জার্মানীর স্বার্থের বিনিময়ে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ বৃদ্ধি করিতেই অধিক তৎপর হইয়া উঠেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের জার্মান-স্বার্থ বিরোধী মনোভাব এবং জার্মান নৃপতিগণের অধিকারে সম্রাটের অন্যায়-মূলক হস্তক্ষেপ প্রভৃতি কারণে জার্মান নৃপতিগণ ক্রমশঃ ফ্রান্সের উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিতে থাকেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের রাজত্বকালে জার্মানীতে সম্রাটের ক্ষমতা ও আধিপত্য বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয় এবং জার্মান নৃপতিগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত প্রাশিয়া, স্যাক্সনী, হ্যানোভার প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণ একরূপ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন এবং ইহাদের উপর অষ্ট্রিয়ার কোনরূপ কর্তৃত্ব ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু তথাপি পশ্চিমে ইওরোপে অষ্ট্রিয়া তখনও অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী সমন্বয়ে অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফলে উহার কেন্দ্রীয় শক্তি কখনও শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই ধরনের আইনকানুন ও একই ধরনের শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন করা কখনও সম্ভব হয় নাই। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনৈক্য অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের প্রধানতম দুর্বলতা ছিল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মেরিয়া থেরেসার উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া ইওরোপে এক যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়ার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মেরিয়া থেরেসা কিছু উন্নয়নমূলক সংস্কার করেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের নেতৃত্বে প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হয়।

প্রাশিয়া : প্রাশিয়া ছিল জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র। প্রাশিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল—যথা ক্লিভস, মার্ক, ব্র্যাণ্ডেনবার্গ, ম্যাগডেবার্গ ইত্যাদি।

ফ্রেডারিক প্রথম উইলিয়াম ও ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের আমলে প্রাশিয়া তথা জার্মানীর নবজাগরণ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাশিয়ার নৃপতিগণ প্রাশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার নীতি গ্রহণ করেন। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন ফ্রেডারিক প্রথম উইলিয়াম ও ফ্রেডারিক দি-গ্রেট। এই দুই রাজার আভ্যন্তরীণ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য প্রাশিয়ার রাজনৈতিক সংহতি বজায় রাখা ও কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা করা। ইহাদের পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল ইওরোপে প্রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করা।

ফ্রেডারিক প্রথম উইলিয়াম (১৭১৩-'৪০) ও ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট (১৭৪০-'৮৬)-এর আমলে প্রাশিয়ায় কেন্দ্রীয়করণ ও রাজ্যবিস্তার-নীতি অনুসৃত হইতে থাকে। প্রথম

প্রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও শক্তিবৃদ্ধি

ফ্রেডারিকের চেষ্টায় প্রাশিয়ায় কেন্দ্রীভূত প্রশাসনী ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। প্রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পন্ন হইলে উহা অভাবনীয়ভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রাশিয়ার অভ্যুত্থান ও ক্রমোন্নতি স্বভাবতঃই অষ্ট্রিয়ার মনঃপুত হয় নাই। ১৭৪০ হইতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের

জার্মানীতে প্রাশিয়ার আত্মপ্রতিষ্ঠা

মধ্যে জার্মানীর কর্তৃত্ব লইয়া প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয় এবং সপ্তবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধের পর জার্মানীতে প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার সমকক্ষ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ব্যাভেরিয়া : উইটেলস্‌বাক্ রাজবংশের একটি শাখা ব্যাভেরিয়ায় রাজত্ব করিত। ব্যাভেরিয়া জার্মানীর অপর একটি রাষ্ট্র। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাভেরিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার শর্তানুসারে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ-রাজ্যে তথা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটপদে ব্যাভেরিয়ার ডিউকের দাবি সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুত হয়। অষ্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ বংশের সহিত ব্যাভেরিয়ার সম্পর্ক কখনও ভাল ছিল না এবং ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাভেরিয়ার ডিউক ফ্রান্সের সমর্থনে অষ্ট্রিয়ার বিরোধিতা করিয়া যাইতে থাকেন।

হ্যানোভার : হ্যানোভার ছিল জার্মানীর একটি প্রোটেস্টাণ্ট রাজ্য। ইহার শাসকগণ 'ইলেক্টর' নামে অভিহিত হইতেন। ইহার ইলেক্টর প্রথম জর্জ উপাধি ধারণ করিয়া ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় হইতে হ্যানোভার ইওরোপের ইতিহাসে গুরুত্ব অর্জন করেন। প্রাশিয়ার সহিত ইংল্যাণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ রহিলেও প্রাশিয়ার সহিত ইহাদের সম্পর্ক মোটেই

সন্তোষজনক ছিল না। একমাত্র সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া দ্বিতীয় জর্জ প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন।

পোল্যাণ্ড: রাজতন্ত্র-শাসিত ইওরোপে বহু শতাব্দী ধরিয়া পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় জীবন ছিল বিশৃংখলাপূর্ণ ও হীনবল। শাসনতন্ত্র অনুসারে পোল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল বটে কিন্তু ইহা ছিল একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ইহার রাজপদ ছিল নির্বাচনমূলক। স্পেন ও তুরস্কের ন্যায় পোল্যাণ্ডও একসময় ছিল সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হইতে পোল্যাণ্ডের পতন শুরু হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ড ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের কূটনীতির ক্ষেত্রে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদের প্রশ্ন লইয়া উহার প্রতিবেশী রাষ্ট্র প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হইয়াছিল। ১৭৩৩-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে এক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। অবশেষে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সমর্থিত প্রার্থী তৃতীয় অগস্টাস পোল্যাণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় অগস্টাসের মৃত্যু হইলে পুনরায় পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। শেষ পর্যন্ত ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ড বণ্টিত হয় এবং উহার স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার বিলুপ্তি ঘটে।

ইটালী: জার্মানীর ন্যায় ইটালীতেও বিভিন্ন রাজবংশ উহার বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিত। ইটালীর কোনরূপে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তা ছিল না বলিলেই চলে। মধ্যযুগের শেষভাগে ইটালী ছিল ইওরোপীয় নৃপতিগণের উচ্চাভিলাষের ক্রীড়াস্থল ও সমরক্ষেত্র। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর উত্তর ইটালীতে অষ্ট্রিয়া, ভিনিস ও জেনোয়া-র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইটালীর কেন্দ্রস্থলে ছিল মোডেনা, টাস্কানী ও পোপ-শাসিত রাষ্ট্র। দক্ষিণ-ইটালীতে নেপলস্ ছিল অষ্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত এবং সিসিলি ছিল স্যাভয়-বংশের অধিকারভুক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শতধা বিভক্ত ইটালীর কোন জাতীয় সংহতি বা রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিল না।

রাশিয়া: সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত রাশিয়া পশ্চিম ইওরোপ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। বাল্টিক ও কৃষ্ণসাগরে যথাক্রমে সুইডেন ও তুরস্কের আধিপত্য থাকায় বহির্বিশ্বে রাশিয়ার নির্গমনের পথ অবরুদ্ধ ছিল। পশ্চিম ও দক্ষিণ-সীমান্তে রাশিয়া সুইডেন, পোল্যাণ্ড, তুরস্ক ও পারস্য প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে জার পিটার-দি-গ্রেটের আমলে (১৬৮২-১৭২৫) রাশিয়ার

এই বিচ্ছিন্ন অবস্থার অবসান হয় এবং রাশিয়া ইওরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিনের শাসনকালে (১৭৬২-১৭৯৬) রাশিয়া তুরস্ক ও পোল্যাণ্ডের এক বৃহৎ অংশ দখল করিয়া ইওরোপের এক অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়। তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আক্রমণাত্মক মনোভাব ইওরোপের ইতিহাসে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সমস্যা বহুদিন যাবৎ ইওরোপীয় শক্তিবর্গকে বিব্রত রাখিয়াছিল।

ফ্রান্স: চতুর্দশ-লুই-এর মৃত্যুর পর (১৭১৫) তাঁহার পৌত্র পঞ্চদশ-লুই সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় তিনি ছিলেন নাবালক। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চদশ-লুই স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া কার্ডিনাল ফ্লিউরি-কে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ফ্লিউরি-র বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ফলে ফ্রান্সের সামরিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং ফ্রান্সে শান্তি পুনঃ স্থাপিত হয়। কিন্তু পঞ্চদশ লুই-এর-চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তার ফলে ফ্লিউরি-র সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং ফ্রান্সের রাজনৈতিক দুর্বলতা সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক দুর্বলতাও ক্রমে চরমে পৌছিতে থাকে।

পঞ্চদশ-লুই ১৭১৫-১৭৭৪

পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রেও ফ্লিউরি প্রথমদিকে সাফল্য অর্জন করেন। ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি (১৭১৩) দ্বারা ফ্রান্সের সীমানা সুরক্ষিত হয়, ফ্রান্সের সীমানা সম্প্রসারিত হয় এবং ফ্রান্সের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইওরোপে ফ্রান্সের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল বটে কিন্তু ইহার পর ফ্রান্সকে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুইটি ইওরোপীয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে হয় এবং এই দুই যুদ্ধের ফলে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ফ্রান্সের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে থাকে।

ইংল্যাণ্ড: ইউট্রেক্ট-এর সন্ধিতে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের চেষ্টায় ইওরোপে শক্তি সাম্য (balance of power পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে হ্যানোভার বংশের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি বিরাজ করিতেছিল। এই সময় ইংল্যাণ্ডের রাজনীতির ক্ষেত্রে ওয়ালপোল ছিলেন সর্বাধিক প্রভাবশালী। ১৭২১ হইতে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ওয়ালপোল ছিলেন ইংল্যাণ্ডের প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক। তাঁহার সময়ই ইংল্যাণ্ডে ক্যাবিনেট শাসন-পদ্ধতি চালু হয়। ওয়ালপোলের বহুবিধ অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে ইংল্যাণ্ডে আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ওয়ালপোলের পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল ইওরোপের গোলযোগ হইতে ইংল্যাণ্ডকে দূরে রাখা। তিনি

ওয়ালপোল

যুদ্ধ-নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। ওয়ালপোল মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করিলে ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

১৭৪০ হইতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুইটি ইওরোপীয় যুদ্ধ

১৭৪০ হইতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইওরোপে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল—যথা অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ।

(১) **অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ১৭৪১-৪৮** (War of Austrian succession) ঃ

ভূমিকা ঃ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। প্রথম দিকে এই যুদ্ধ অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলেও পরে ইওরোপের অন্যান্য প্রধান রাষ্ট্রগুলিও এই যুদ্ধের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে। অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ও অষ্ট্রো-প্রাশিয়ার দ্বন্দ্ব এই দুই প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণতি লাভ করে। অষ্ট্রো-প্রাশিয়া সংঘর্ষ ইওরোপে সীমাবদ্ধ রহিলে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব আমেরিকা ও ভারতে বিস্তার লাভ করে।

যুদ্ধের কারণ ঃ এই যুদ্ধের প্রধান কারণ হইল প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের উচ্চাভিলাষী পররাষ্ট্রনীতি। ফ্রেডারিকের পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রাশিয়াকে ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করা। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার কন্যা মেরিয়া থেরেসা সিংহাসনে আরোহণ করিলে ফ্রেডারিকের সুযোগ আসিল। ইওরোপে প্রচলিত 'স্যালিক-আইন' (Salic Law) অনুসারে সিংহাসনে কোন স্ত্রীলোকের অধিকার স্বীকৃত হইত না। এই দোষ কাটাইবার জন্য ষষ্ঠ চার্লস মৃত্যুর পূর্বে ইওরোপের প্রধান নৃপতিবর্গের নিকট হইতে মেরিয়া থেরেসার সিংহাসন অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করেন। এই স্বীকৃতি 'প্র্যাগম্যাটিক-স্যাংসন' (Pragmatic Sanction) নামে পরিচিত। কিন্তু ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাগম্যাটিক-স্যাংশনে চুক্তিবদ্ধ নৃপতিগণ তাঁহাদের পূর্বপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া মেরিয়া থেরেসার সিংহাসনারোহণের দাবির বিরোধিতা করিলেন।

প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট মেরিয়া থেরেসার এই দুরবস্থার সুযোগ লইয়া প্রাশিয়ার রাজ্যবিস্তারে যত্নবান হইলেন। ফ্রেডারিকের পিতা ফ্রেডারিক প্রথম উইলিয়াম অষ্ট্রিয়ার কিছু রাজ্যাংশ লাভের আশায় ষষ্ঠ চার্লসের 'প্র্যাগম্যাটিক-স্যাংসনে' সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা লাভ না করায় ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট

মেরিয়া থেরেসার দাবি অস্বীকার করিলেন এবং সাইলেশিয়ার উপর দাবি করিয়া বসিলেন। মেরিয়া থেরেসা ফ্রেডারিকের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করিলেন। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক সাইলেশিয়া আক্রমণ করিলেন। এইভাবে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূত্রপাত হইল।

যুদ্ধঃ এক বৎসরের মধ্যে ফ্রেডারিক প্রায় সমগ্র সাইলেশিয়া দখল করিয়া লইলেন। মলউইট্জ (Mollwitz)-এর যুদ্ধে ফ্রেডারিকের নিকট অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইলে একে একে স্পেন, ব্যাভেরিয়া, স্যাভয় অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিল। ফ্রান্সও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিল। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করিলেন। রাশিয়া ও স্যাক্সনীও অষ্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিল।

এইভাবে পুনরায় ইওরোপ দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং দলের নেতৃত্ব করিতে লাগিল যথাক্রমে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। অতঃপর অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুধু 'প্র্যাগম্যাটিক স্যাংসনে' প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না। ইহা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে নৌ-শক্তি ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইল। শুধু ইওরোপেই এই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রহিল না। আমেরিকা ও ভারতেও ইহা বিস্তারলাভ করিল।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আয়-লা-স্যাপল-এর সন্ধি (Treaty of Aix-la-Chapelle) দ্বারা অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের অবসান হইল। ইহার শর্তানুসারে (১) সাইলেশিয়ার উপর প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত হইল, (২) পঞ্চদশ-লুই ফ্রান্স হইতে প্রিটেণ্ডার গণকে (Pretenders) বহিস্কৃত করিতে এবং দ্বিতীয় জর্জকে ইংল্যাণ্ডের রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন, (৩) প্রাশিয়া মেরিয়া থেরেসার স্বামী ফ্রান্সিসকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিল, (৪) আমেরিকায় লুইবার্গ ফ্রান্সকে এবং ভারতে মাদ্রাজ ইংল্যাণ্ডকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল এবং (৫) স্পেনীয় আমেরিকায় ইংল্যাণ্ডের বিশেষ বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা স্বীকৃত হইল।

যুদ্ধের অবসান ও আয়লা-স্যাপলের সন্ধি

ফলাফল (Results): (১) অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের ফলে সর্বাধিক লাভবান হইয়াছিল প্রাশিয়া। সাইলেশিয়া লাভ করায় প্রাশিয়ার রাজ্যসীমা বর্ধিত হইল এবং জার্মানীতে প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। ইহা ছাড়া ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাশিয়ার প্রাধান্য স্বীকৃত হইল।

ইওরোপের রাজনীতিতে প্রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন

(২) অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে মেরিয়া থেরেসার দাবি স্বীকৃত হইল।

মেরিয়া থেরেসার দাবি স্বীকৃত

(৩) এই যুদ্ধের ফলে ইটালীর রাষ্ট্র সার্ডিনিয়া স্যাভয়, নীস ও লোম্বার্ডি লাভ করিল। ফলে ভবিষ্যতে ইটালীতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের সূচনা হইল।

ইটালীর ভবিষ্যৎ ঐক্যবদ্ধতার সূচনা

(৪) এই যুদ্ধের ফলে ইওরোপে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হইল। বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। অপরদিকে ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

ফ্রান্সের প্রতিপত্তি ও মর্যাদাহানি ও ইংল্যাণ্ডের লাভ

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩)
(Seven Years' War)

কারণঃ ইওরোপের ইতিহাসে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করিয়াই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল—যথা সাইলেশিয়ার অধিকার লইয়া অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ, ফ্রান্সে ও প্রাশিয়ার মধ্যে সামরিক স্বার্থসংঘাত এবং ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

(১) আয়-লা-স্যাপলের সন্ধি অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে যথার্থ শান্তি স্থাপন করার পরিবর্তে উহাদের পারস্পরিক শত্রুতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। মেরিয়া থেরেসা সাইলেশিয়া হারাইবার দুঃখ কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই। একদিকে সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধার করিতে মরিয়া থেরেসার দৃঢ়সংকল্প এবং অপরদিকে তাহা দখলে রাখিতে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিকের সমান দৃঢ়-সংকল্প উভয়ের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল।

অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ

(২) ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অপর প্রধান কারণ। ইওরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং ফ্রান্স প্রাশিয়ার শক্তি ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প হইল।

ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্যিক, সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটাইতে পারে নাই, বরং উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রা তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল। ইওরোপ অপেক্ষা আমেরিকা ও ভারতে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

সম্পর্ক ক্রমশঃ তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। ইংল্যাণ্ড প্রাশিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল এবং ইহার পরিণামে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্রপাত হইল।

১৭৫৬ খ্রীঃ হইতে ১৭৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলিল। শুধু ইওরোপেই এই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারত ও আমেরিকাতেও এই যুদ্ধ বিস্তারলাভ করিয়াছিল। অবশেষে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

প্যারিসের সন্ধি

প্যারিসের সন্ধি (১৭৬৩) দ্বারা ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের নিকট হইতে কানাডা, নোভাস্কসিয়া ও পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশ লাভ করিল। ভারতে পণ্ডিচারী, কারিকল, ও মাহে, ফ্রান্সের অধিকারে রহিল। এইভাবে (১) আমেরিকায় ও ভারতে ইংরাজদের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং (২) ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হইল। ইংরাজদের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জ্ঞানদীপ্তির যুগ (Age of Enlightenment)**:** ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগকে জ্ঞানদীপ্তি ও প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারের (Enlightened Despotism) যুগ বলা হইয়া থাকে। ইওরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নূতন প্রগতিমূলক যুগের সূচনা হয়। এই যুগের রাজনৈতিক ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রই হইল রাজনৈতিক জীবনের সারাংশ, জাতি বা দেশের জনসমাজ কিছু নহে। রাজা হইলেন রাষ্ট্রের সকল শক্তির উৎস ও আধার। তিনি সার্বভৌম-শক্তির একমাত্র অধিকারী। 'প্রজাহিতৈষী-স্বৈরাচারবাদের' মূর্ত প্রতীক হইলেন প্রাশিয়ার রাজা মহান ফ্রেডারিক, যিনি নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান সেবক ("I am but the first servant of the state."—*Frederick*) বলিয়া মনে করিতেন। 'বিশ্বকোষ' (Encyclopaedia)-প্রণেতা ডিডেরো (Diderot) প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এইরূপ রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক ছিলেন এবং এইরূপ মতবাদের বশবর্তী হইয়া ইওরোপের বহু নৃপতিবর্গ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্ব-স্ব রাজ্য শাসন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন, সুইডেনের তৃতীয় গুস্তাভাস, স্পেনের তৃতীয় চার্লস এবং অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের মতে স্বৈরতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হইল জনকল্যাণ সাধন করা। একথা অনস্বীকার্য, ফরাসীবিপ্লবের প্রারম্ভে ইউরোপের একাধিক নৃপতিগণ নিজেদের স্বৈরতন্ত্রের সমর্থনে ও জনসমাজের সমগ্র কল্যাণের জন্য যেরূপ আপ্রাণ চেষ্টা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে
জ্ঞানদীপ্তির প্রসার
প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারের যুগ

করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই।* বস্তুতঃ প্রজাহিতৈষী রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকে সমসাময়িক দার্শনিক চিন্তাধারা ও দার্শনিকদের সহিত পরিচিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট, রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিন ও অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা হিসাবে দ্বিতীয় জোসেফ ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা জনস্বার্থের জন্য যথেষ্ট করিয়া গিয়াছেন সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। মানসিক উৎকর্ষবশতঃ ও প্রগতিপন্থী দার্শনিকদের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা স্ব-স্ব রাষ্ট্রে প্রজাদের কল্যাণার্থে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন মাত্র।

প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রের ত্রুটি

কিন্তু প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি হইল এই যে প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের শাসনকার্যে জনসাধারণের অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ ছিল না। ইহার ফলে জনসাধারণ স্বৈরাচারী রাজগণ কর্তৃক গৃহীত সংস্কার সহজমনে গ্রহণ করিতে পারিত না। দ্বিতীয়তঃ, প্রজাহিতৈষী রাজগণ তাঁহাদের সংস্কারগুলিকে স্থায়িত্ব দান করিতে বা সামন্ত প্রথায় দুষ্ট শাসনযন্ত্রকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সমর্থ হন নাই। তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সামন্তপ্রথা-জনিত দোষত্রুটি বিদ্যমান থাকায় প্রজাহিতৈষী রাজগণ কর্তৃক গৃহীত সংস্কার প্রজাবর্গের মনে কোনরূপ উৎসাহ দান করিতে পারিত না। চতুর্থতঃ, জনগণ কর্তৃক রাজ্যশাসন করিবার যে রাজনৈতিক মতবাদ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল তাহা প্রজাহিতৈষী রাজগণের সংস্কারগুলিকে স্থায়ী করার পথে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছিল।

রাজার ব্যক্তিত্বের উপর শাসনব্যবস্থা নির্ভরশীল

রাজতন্ত্রের স্থায়িত্ব তথা শাসনব্যবস্থার দক্ষতা রাজার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করিত। রাজাই ছিলেন শাসনযন্ত্রের শক্তি ও আধার। মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীগণ ছিলেন রাজার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। শাসনব্যবস্থায় রাজকর্মচারীগণের কোনরূপ সত্তা বা প্রভাব ছিল না। এই কারণেই প্রাশিয়ারাজ ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট ও ফরাসীরাজ চতুর্দশ-লুই-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উভয় দেশের শাসনযন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং ইহার প্রভাব ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রেও পড়িয়াছিল।

---

*"Never was more earnest zeal displayed in promoting the material wellbeing of all classes, never did monarchs labour so hard to justify their existence or effect such important civil reforms as on the eve of the French Revolution......"
—*M. Stephens.*

তখন রাজারা নিজেদের ক্ষমতা ভগবান-প্রদত্ত বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ ক্ষমতার বিরোধিতা করা বা উহার সমালোচনা করা ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করার সামিল বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার ফলে প্রজাবর্গের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার কোন উপায় ছিল না।

রাজগণের ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতার দাবি

একমাত্র ইংল্যাণ্ড ছাড়া ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট শাসনতন্ত্র বা সংবিধান ছিল না বলিলেই চলে। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা ও প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা কোন কোন দেশে ছিল বটে কিন্তু এগুলির কার্যকরী ক্ষমতা একরূপ ছিলই না। স্বৈরাচারী রাজগণ কর্তৃক এই সভাগুলির কার্যাবলী পরিচালিত হইত। ফ্রান্সে স্টেট্স-জেনারেল (States-General) নামক কেন্দ্রীয় সভা ছিল বটে কিন্তু দেশের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে স্টেট্স-জেনারেলের কোনরূপ ক্ষমতা বা প্রভাব ছিল না। ইহার ফলে শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রজাবর্গের মতামত প্রকাশ করিবার বা রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন উপায় ছিল না। ফ্রান্সের ন্যায় ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রেও প্রতিনিধি সভার অস্তিত্ব থাকিলেও রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা উহাদের ছিল না। একমাত্র ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়াছিল।

প্রতিনিধি সভার ক্ষমতাহীনতা

ব্যবসায়ী ও ধনী কৃষিজীবীদের লইয়া সে সময় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গঠিত ছিল। অবশ্য ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও সুইডেন ভিন্ন অন্যত্র কোথাও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলিয়া তখনও কিছু গড়িয়া উঠে নাই। পশ্চিম ইওরোপের রাইন অঞ্চল এবং বিশেষ করিয়া ফ্রান্সে কৃষিজীবীরা ছিল সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও কর্মসংস্থানের উপায় ছিল বলিয়া এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছিল। আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা প্রসার লাভ করিতেছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ শুধু যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত দার্শনিকদের উপরই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এমন নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইওরোপের অভিজাতগণও ইহার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ইওরোপীয় সকল দেশের অভিজাতগণ ছিল শিক্ষায় ও সমৃদ্ধিতে সর্বাগ্রণী। বিলাসব্যসনে তাহারা ছিল শ্রেষ্ঠ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। প্যারিস নগর ছিল অভিজাতগণের বিলাসকেন্দ্র যেখানে রুশ, অষ্ট্রিয়ান, সুইডিশ ও ইংরাজ অভিজাতগণ সমপদমর্যাদা লাভ করিত। কিন্তু জ্ঞান

উচ্চ বা অভিজাত শ্রেণী

ও শিক্ষার দিক দিয়া ফরাসী অভিজাতগণ ছিল সকলের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ফরাসী অভিজাতগণ অপেক্ষা ইওরোপের অন্যান্য দেশের অভিজাতগণ অধিক ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিল।

মানসিক উৎকর্ষতার অগ্রগতি: ইওরোপের অনুন্নত ও নির্যাতিত জাতিগুলির সম্মুখে ফরাসী-বিপ্লব যে সকল সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছিল তাহা বিপ্লবের পূর্বে ইওরোপের চিন্তাজগতে এক জাগরণ আনিয়াছিল রেনেসাঁস প্রসূত অনুসন্ধানী ও সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও পূর্ণ মাত্রায় কার্যকরী ছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য—সকল ক্ষেত্রেই যুক্তিবাদ বা Rationalism-এর প্রভাব চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।

যুক্তিবাদের প্রসার; ফরাসী দার্শনিকদের প্রভাব; শক্তিশালী জনমতের সৃষ্টি

ফরাসী-দার্শনিকগণ ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী এবং তাঁহাদের রচনা ইওরোপের সর্বত্র যুক্তিবাদ বিস্তারে ও প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গঠন করিতে সাহায্য করিয়াছিল। ভল্টেয়ার (Voltaire), মণ্টেস্কু (Montesquieu), ডিডেরো (Diderot), রুশো (Rousseau) প্রমুখ অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসী দার্শনিকগণ ইংরাজ দার্শনিক লক্ (Locke)-এর আদর্শ ও চিন্তাধারার দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। স্বতন্ত্রভাবে তাঁহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে প্রজাবর্গের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্যই সরকার ও শাসনতন্ত্র। তাঁহারা গভর্নমেণ্ট ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের স্থান স্থির করিলেন। তাঁহাদের রচনা ও চিন্তাধারার ফলে এযাবৎ প্রচলিত স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের আদর্শের এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। সভ্য সমাজের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা প্রচার করিলেন। ফরাসী-বিপ্লবের মূল কারণ ছিল অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক, দার্শনিক বা সামাজিক নহে। ফরাসী দার্শনিকদের আদর্শ ও রচনা ফরাসী বিপ্লব সংঘটনে সাহায্য না করিলেও বিপ্লবের মূলনীতিগুলি ইওরোপে বিস্তার করিতে তাঁহাদের রচনা যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল।

দার্শনিকদের রচনার ফল

জার্মান দার্শনিকগণও (যেমন গেটে, কাণ্ট, হারডার) এ বিষয়ে কম অগ্রণী ছিলেন না। অবশ্য ফরাসী দার্শনিক ও জার্মান দার্শনিকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারার মূল কথাই ছিল রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের স্থান সম্পর্কে। কিন্তু জার্মান দার্শনিকগণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক তারতম্য-প্রসূত বিবাদের

ফরাসী ও জার্মান দার্শনিকদের মধ্যে পার্থক্য

সমাধানের পরিবর্তে মানুষের মানসিক উৎকর্ষতা ও জ্ঞানপ্রসারের কথাই অধিক চিন্তা করিয়াছিলেন। গেটে ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্ব অনুভব করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু জার্মানীর উপর উহার প্রভাব সম্পর্কে তাঁহার কৌতূহল ছিল কম।

জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী যুগে অর্থনৈতিক নীতি ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত এবং ইহা সাধারণভাবে 'রাজনৈতিক-অর্থনীতি' নামে পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রত্যেক দেশে 'মার্কেণ্টাইলবাদের' ভিত্তির উপর অর্থনীতি গড়িয়া উঠিতেছিল। মার্কেণ্টাইল-নীতি অনুসারে জাতির সম্পদ ও সংহতি রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রাধীনে রাখিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কিন্তু পার্লামেণ্টে জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য থাকায় সামুদ্রিক বাণিজ্য, আমদানি, রপ্তানি ও উপনিবেশগুলি সম্পর্কে মার্কেণ্টাইল-নীতি অনুসৃত হইতে থাকে। কিন্তু ইওরোপের অন্যান্য দেশে জাতির অর্থনৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকে। ফরাসী মন্ত্রী কোলবার্টের অর্থনীতি বহু দেশে অনুসৃত হইতে থাকে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে মার্কেণ্টাইল-নীতি, একচেটিয়া ব্যবসা এবং উচ্চহারে শুল্ক স্থাপনের বিরুদ্ধে দারুণ প্রতিবাদের উদ্ভব হয়। দার্শনিক ডেভিড-হিউম (David Hume) প্রচার করিতে থাকেন যে রাষ্ট্রের উচিত হইল বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত না হওয়া। ফ্রান্সে "Physiocrats" নামে একদল দার্শনিকদের আবির্ভাব হয়। কুইসনে (Quesnay) ছিলেন এই দলের মুখপাত্র। ইহারা কৃষি সম্পর্কেই অধিক উৎসাহী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে শিল্প বা বাণিজ্যের পরিবর্তে কৃষি-ই প্রকৃত পক্ষে জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করে; সুতরাং কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণাধীনে না রাখিয়া কৃষির প্রতি অধিক মনোনিবেশ করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। এ্যাডাম-স্মিথ উপরোক্ত দুইটি মতবাদের মধ্যে এক সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতি সাধন করে। তাঁহার মতে মুদ্রার পরিবর্তে সামগ্রী হইল যথার্থ সম্পদ এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণের ফল হইল সামগ্রীর স্বল্পতা। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ইংল্যাণ্ড কর্তৃক স্মিথের নীতি গৃহীত হয়।

জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব তৎকালীন যুগের শাস্তিদান ব্যবস্থা ও দাসত্বপ্রথার উপরও পড়িয়াছিল। ইটালীর জনৈক খ্যাতনামা, অধ্যাপক বেকারিয়া (Beccaria) তাঁহার স্ব-রচিত গ্রন্থে ('On Crimesand Punishments') অপরাধীদের প্রতি অধিক মানবোচিত আচরণ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি অপরাধীদের প্রতি নির্যাতনমূলক ব্যবহার ও মৃত্যুদণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁহার মতে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে অপরাধ ঘটিতে না দেওয়াই রাষ্ট্রের কর্তব্য। কোয়েকার (Quaker) নামে এক সম্প্রদায় দাসত্ব-প্রথা ও দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে থাকে। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্প্রদায়-ভুক্ত সদস্যগণ স্বেচ্ছায় দাস-ব্যবসা পরিত্যাগ করে। দাস-প্রথা ও দাস-ব্যবসার বিরুদ্ধে উইলবারফোর্স (Wilberforce) ইংল্যাণ্ডে জোর প্রচারকার্য চালাইয়া-ছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে একাধিক দাস-প্রথা বিরোধী সমিতির উদ্ভব হয়।

শাস্তিদান ও দাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক নূতন প্রগতিমূলক যুগের সূচনা হয়। এতদ্ভিন্ন সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার ক্ষেত্রেও জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাবিধ আবিষ্কারের ফলে পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন-প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। যে সকল বৈজ্ঞানিক মৌলিক আবিষ্কার করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আইজাক নিউটন, এডমাণ্ড-হেইলি, রবার্ট বোয়েল, জোসেফ ব্ল্যাক, জেমস হাটন্ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য, সঙ্গীত, ধর্ম জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যঙ্গাত্মক ও রোমান্টিক রচনার মধ্যে জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ডেনিস-ডিটেরো কর্তৃক সংকলিত ('encyclopaedia') বা বিশ্বকোষ নামক গ্রন্থটি সে যুগের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে রুশো সঙ্গীত সম্পর্কে, ভল্টেয়ার ইতিহাস সম্পর্কে, কুইসনে অর্থনীতি সম্পর্কে এবং ডি-এলেমবার্ট গণিত সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে ইওরোপের প্রচলিত ধর্মব্যবস্থা এবং যাজকশ্রেণী সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা রহিয়াছে। গ্রন্থের অন্যান্য অংশে মানুষের জন্মগত অধিকার, মানবধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও তথ্যপূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে।

জ্ঞানদীপ্ত বা প্রজাহিতৈষী শাসকবৃন্দ
(Enlightened or Benevolent Despots)

অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানদীপ্ত বা প্রজাহিতৈষী নৃপতিগণের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইলেন প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ।

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বা ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট ১৭৪০-১৭৮৬ (Frederick II) :

সিংহাসন লাভ

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল প্রাশিয়ায় তথা ইওরোপের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

পিতার অতি কঠোর শাসনে ফ্রেডারিকের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। পিতা প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম ছিলেন উগ্রস্বভাব ও সমরনীতিতে বিশ্বাসী।

চরিত্র

সাহিত্য ও শিল্পচর্চা অপেক্ষা শারীরিক চর্চা ও কঠোর সমর-শিক্ষার প্রতি তিনি ছিলেন অধিক অনুরাগী। ফ্রেডারিক উইলিয়াম সঙ্গীত, সাহিত্য ও দর্শনচর্চা কখনও পুরুষোচিত বলিয়া মনে করিতেন না। এই কারণে তিনি স্বীয় পুত্র দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে কঠোর শাসনাধীনে রাখিয়া তাঁহাকে রণনৈপুণ্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সহজাত অনুরাগ ছিল। পিতার কঠোর শাসনের ফলে ফ্রেডারিকের আচরণ অত্যন্ত রূঢ় হইয়া উঠে এবং পরবর্তীকালে তিনি স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হন। কপটতা, নীতিজ্ঞান-হীনতা ও স্বার্থপরতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। মানবজাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কতকগুলি অপূর্ব গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং অসাধারণ কর্মোদ্যমসম্পন্ন পুরুষ। কূটনীতিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। রণনৈপুণ্যেও তিনি ছিলেন সমকালীন ইওরোপীয় নৃপতিগণের মধ্যে অন্যতম। প্রজাহিতৈষী শাসক হিসাবেও তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তিনি মণ্টেস্কু, টুর্গো, ভলটেয়ার ও এ্যাডাম-স্মিথ প্রভৃতি সমসাময়িক দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদগণের চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা সাহিত্য-সমালোচক।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে একক-অধিনায়কত্বের অধীনে প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার স্থাপন করাই দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার পক্ষপাতী। তিনি রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি সেই ক্ষমতা সর্বদা প্রজাবর্গের কল্যাণার্থেই নিয়োজিত করিতে যত্নবান ছিলেন। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান সেবক (First Servant of the State) বলিয়া মনে করিতেন। মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীগণ ছিলেন তাঁহার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। তিনি রাষ্ট্রে সকল ব্যাপার নিজেই পরিদর্শন করিতেন এবং আদেশ জারী করিতেন। তাঁহার আভ্যন্তীরণ নীতির অপর উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়াকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের মর্যাদা দান করা। এই সকল কারণেই কার্লাইল (Carlyle) দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে "Last of the Kings" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আভ্যন্তরীণ নীতি

রাজার সর্বাত্মক ক্ষমতা স্থাপন

ফ্রেডারিক বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করিয়া প্রাশিয়াকে উন্নত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কৃষির উন্নয়নের প্রতিও তিনি সমভাবে আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি প্রাশিয়ার অনুর্বর অঞ্চলে বিদেশীয় কৃষকগণকে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া কৃষির উন্নয়নের চেষ্টা করেন। তিনি কৃষকগণকে অকাতরে ঋণ ও নানাবিধ সাহায্য দান করিতেন। দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে তিনি বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উন্নয়নমূলক কার্যাদি

ফ্রেডারিক ভূমিদাস বা সার্ফ (Serf)-প্রথার উচ্ছেদসাধনেও যত্নবান ছিলেন। কিন্তু প্রাশিয়ার অভিজাতগণের বিরোধিতাহেতু তিনি এই বিষয়ে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই।

তিনি বহুবিধ উন্নয়নমূলক কার্যাদির দ্বারা রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

ফ্রেডারিক ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। তিনি সকলকে স্ব-স্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়া মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন।

শিক্ষার প্রতিও ফ্রেডারিকের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। শিক্ষাবিস্তারকল্পে তিনি বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আইনসংস্কার করিয়া তিনি তাহা সুস্পষ্ট করেন এবং আসামীদের অপরাধ নির্ণয় করার ব্যাপারে সকল প্রকার দৈহিক অত্যাচার নিষিদ্ধ করেন।

পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় ফ্রেডারিক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জার্মানী হইতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিনষ্ট করিয়া প্রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করা এবং প্রাশিয়াকে ইওরোপের এক অন্যতম রাষ্ট্রে পরিণত করা। তিনি অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া সাইলেশিয়া জয় করেন। ইহার ফলে প্রাশিয়ার রাজ্য সংঘবদ্ধ হয়। তিনি পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদে অংশ গ্রহণ করিয়া পশ্চিম প্রাশিয়া লাভ করেন। ইহার ফলে প্রাশিয়ার রাজ্য সুবিন্যস্ত হয়। তিনি সাফল্যের সহিত অষ্ট্রিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া প্রাশিয়ার নিরাপত্তার বিধান করেন। ফ্রেডারিকের বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতির ফলে প্রাশিয়া ইওরোপে প্রতিপত্তি এবং জার্মানীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

পররাষ্ট্র-নীতি

দ্বিতীয় ক্যাথারিন—১৭৬২-১৭৯৬ (Catherine II): রাশিয়ার জার তৃতীয় পিটারের মৃত্যুর পর ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ক্যাথারিন রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় ক্যাথারিন ছিলেন উত্তর-জার্মানীর স্বল্পখ্যাত এক রাজ্যের রাজকন্যা। রাজনৈতিক কারণে তৃতীয় পিটারের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের পর তিনি রাশিয়াকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন এবং রুশ জাতির ভাগ্যের সহিত নিজের ভাগ্য অবিচ্ছেদ্য বলিয়া মনে করিতেন। বিবাহের পর তিনি গ্রীকচার্চের অনুগামিনী হন। তিনি রুশ-ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া রুশ-মহিলায় পরিণত হন। নারী হইয়াও তাঁহার চরিত্রে পুরুষোচিত বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁহার শিষ্টাচার ছিল প্রশংসনীয়। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রে নৈতিকতার যথেষ্ট অভাব ছিল, কিন্তু তাঁহার চারিত্রিক জঘন্যতা কখনও রাষ্ট্রীয় আদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন স্নেহপ্রবণা এবং পৌত্র ও বিশ্বস্ত কর্মচারীদের প্রতি তাঁহার স্নেহপ্রবণের বহু কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। আশ্রিতের প্রতি দয়া এবং বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহার চরিত্রকে মহান্ করিয়াছিল। তিনি ভলটেয়ার, ডিডেরো প্রমুখ ফরাসী দার্শনিকদের ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন এবং উহাদের সহিত পত্রালাপও করিতেন।

চরিত্র

দ্বিতীয় ক্যাথারিন ছিলেন প্রজাহিতৈষিণী সম্রাজ্ঞী। রাশিয়ার জাতীয় জীবনের উন্নয়নকল্পে তিনি নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয়করণ-নীতি ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের উগ্র সমর্থক। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি আমলাতন্ত্রের উপর সর্বাত্মক ক্ষমতা স্থাপন করেন।

আভ্যন্তরীণ নীতি

তিনি চার্চের ভূ-সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করেন এবং রাজকোষ হইতে যাজকগণকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। চার্চের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করা তাঁহার রাজত্বের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ক্যাথারিন অভিজাতসম্প্রদায়ের ক্ষমতাও বিশেষভাবে ক্ষুন্ন করিয়া রাজশক্তিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তোলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা স্থাপন করেন। এইভাবে তিনি শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয়করণ করিতে সমর্থ হন।

কেন্দ্রীয়করণ নীতি

সমগ্র দেশে একই ধরনের আইনব্যবস্থা প্রবর্তিত করার উদ্দেশ্যে ক্যাথারিন একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নাই।

প্রস্তাবিত আইনসংস্কার

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তিনি কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারকল্পে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। দেশের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্যের অবাধ চলাচলের সুবিধার জন্য তিনি বহু পথ নির্মাণ ও খাল খনন করেন।

ক্যাথারিনের রাজত্বকালে 'সার্ফ' বা ভূমিদাস-প্রথা রাশিয়ার সমাজজীবনের একটি বিরাট সমস্যা ছিল। ভলটেয়ার ও রুশোর আদর্শে প্রভাবিত হইয়া তিনি দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত যদিও তাঁহার সংকল্প সার্থক হয় নাই তথাপি তিনি রাজকীয় ভূমিদাসদের অবস্থার কিছুটা উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ক্যাথারিন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষায়তন স্থাপন করেন এবং দেশের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কয়েকটি রাষ্ট্রীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্যাথারিন ছিলেন পিটার-দি-গ্রেটের সুযোগ্যা অনুগামিনী। তিনি কূটনীতি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে রাশিয়াকে ইওরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনবার পোল্যাণ্ডের* ব্যবচ্ছেদ ঘটাইয়া তিনি প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থান রুশ-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। দুইবার তুরস্কের সহিত যুদ্ধ† করিয়া তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্যের কিছু অংশ লাভ করেন এবং কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত রুশ-সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। ইহার ফলে রাশিয়ার বহির্বাণিজ্যের পথ সুগম হইয়াছিল।

পররাষ্ট্র-নীতি

* প্রথম ব্যবচ্ছেদ ১৭৭২, দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদ ১৭৯৩ এবং তৃতীয় ব্যবচ্ছেদ ১৭৯৫।

† ১৭৬৮ ও ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

দ্বিতীয় জোসেফ—১৭৬৫-১৭৯০ (Joseph II) : ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জোসেফ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মাতা মেরিয়া থেরেসার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জোসেফ অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ হইতে ১৭৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত জোসেফ মেরিয়া থেরেসার সহিত অষ্ট্রিয়ার যুগ্ম-শাসক ছিলেন। সুতরাং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ও অষ্ট্রিয়ার রাজ্য পুনরায় একই শাসকের শাসনাধীন হয়।

সিংহাসন লাভ

বিদ্যা, বুদ্ধি, চিত্তের প্রসারতা ও প্রজাহিতৈষণার দিক দিয়া দ্বিতীয় জোসেফ ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াও তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী শাসক। ইওরোপের রাজন্যবর্গের মধ্যেই তিনি-ই সর্বপ্রথম স্বৈরতন্ত্রী কেন্দ্রীয় শাসনের পরিচালনাধীনে গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি অষ্ট্রিয়াকে একটি অখণ্ড ও সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। সম্রাটের সর্বাত্মক ক্ষমতা জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল-সাধনে নিয়োজিত করাই ছিল তাঁহার রাষ্ট্রনীতির একমাত্র লক্ষ্য। হাঙ্গেরী ও নেদারল্যাণ্ডে তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছিল বটে কিন্তু অষ্ট্রিয়ায় তাঁহার সংস্কারকার্য ফলপ্রসূও হইয়াছিল। সার্ফ-প্রথার বিলুপ্তিসাধন করিয়া এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নাকচ করিয়া জোসেফ অষ্ট্রিয়ার সমাজজীবনের মান উন্নত করিয়াছিলেন। প্রদেশগুলিতে বিচার-ব্যবস্থার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া এবং ভিয়েনার সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করার প্রথা প্রবর্তন করিয়া তিনি অভিজাতগণের দুর্নীতি ও অত্যাচারের মাত্রা লক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র পক্ষপাতশূন্য বিচার-ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করিয়া এবং খাল খনন করিয়া তিনি আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারেও তিনি উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। চার্চকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া এবং সকলকে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দান করিয়া তিনি প্রগতিমূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন।

প্রজাহিতৈষী শাসক

সমাজজীবনের মান উন্নয়ন : ন্যায়বিচার শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন : ধর্মীয় উদারতা

জোসেফের চরিত্রে দোষগুণের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী ও প্রজাকল্যাণকামী নরপতি। দর্শনশাস্ত্র অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া প্রজাবর্গের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করাই তাঁহার প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। তিনি সমসাময়িক ফরাসী দার্শনিকদের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যুক্তিবাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল গভীর এবং এই বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানও ছিল অগাধ। শিক্ষা ও জ্ঞানের দিক দিয়া তিনি ছিলেন সমকালীন ইওরোপীয় নৃপতিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রগতিমূলক এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁহার দেশপ্রেম ছিল প্রশংসনীয়। সাম্রাজ্যের অধিবাসীগণের আঞ্চলিক মনোবৃত্তি ও প্রাদেশিক মনোভাবের বিলুপ্তি ঘটাইয়া সমগ্র সাম্রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করিয়া তোলাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারেও তাঁহার কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না—এবং এই বিষয়ে তিনি মাতা মেরিয়া থেরেসার তুলনায় অধিক উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জোসেফ ধর্মীয় কুসংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অব্যবস্থিতচিত্ত ও অস্থিরমতি। স্থৈর্য ও ধৈর্যের অভাব তাঁহার চরিত্রের সর্বাধিক ত্রুটি ছিল এবং এই কারণেই তাঁহার সকল মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছিল।

চরিত্রে দোষগুণের অপূর্ব সংমিশ্রণ

দার্শনিক প্রভাব : প্রগতিমূলক আদর্শ প্রীতি স্থৈর্য ও ধৈর্যের অভাব.

সংক্ষিপ্তসার

ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা (১৭৪০-৬৩) : এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের ইতিহাসে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম পরিণতি লাভ করে, প্রাশিয়া জার্মানী তথা ইউরোপের রাজনীতিতে প্রাধান্য স্থাপন করে, রাশিয়া উত্তর-ইউরোপে আধিপত্য স্থাপনে যত্নবান হয় এবং ইউরোপে প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসকশ্রেণীর উদ্ভব হয়।

১৭৪০ হইতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলি ছিল জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ফ্রান্স, ইটালী, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড। জার্মানী ছিল শতধা বিভক্ত এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অনৈক্য ছিল জার্মানীর ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অষ্ট্রিয়া ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের গঠনব্যবস্থা ছিল উহার প্রধান দুর্বলতা। আইনতঃ জার্মানীর উপর অষ্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মানীর নৃপতিগণ একরূপ স্বাধীন হইয়া উঠেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়ার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। প্রাশিয়া ছিল জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম-

ভাগ হইতে প্রাশিয়া ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের শাসনাধীনে প্রাশিয়া জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং ইউরোপের রাজনীতিতে প্রতিপত্তি অর্জন করে। জার্মানীর ন্যায় ইটালীতেও বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শতধা বিভক্ত ইটালীর ইটালীতে জাতীয় ঐক্য ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত রাশিয়া পশ্চিম ইওরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়ার এই বিচ্ছিন্নতার অবসান হয় এবং রাশিয়া ইওরোপের রাজনীতিতে প্রবেশ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের শাসনাধীনে রাশিয়া ইওরোপের এক অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। ইওরোপে ফ্রান্সেব প্রতিপত্তি তখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল বটে কিন্তু অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর হইতে ফ্রান্সের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে শান্তি বিরাজিত ছিল। ইংল্যাণ্ডেব আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব হয়। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডকে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে ইউরোপে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়—যথা অষ্ট্রিয়াব উত্তরাধিকাব যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। অস্ট্রো-প্রাশিয়া ও ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেই এই দুইটি যুদ্ধেব উৎপত্তি হয়।

জ্ঞানদীপ্তির যুগ : ফবাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগকে জ্ঞানদীপ্তিব যুগ বলা হয়। এই যুগে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজা সার্বভৌম শক্তির অধিকারী এবং তিনি তাঁহার ক্ষমতা প্রজাব কল্যাণার্থে নিয়োগ করিবেন ইহাই ছিল সেই যুগের রাজনৈতিক আদর্শ। এই আদর্শের বশবর্তী হইয়া ইওরোপের অনেক নৃপতি রাজ্যশাসনে যত্নবান হন। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইলেন ফ্রেডারিক দি গ্রেট, দ্বিতীয় ক্যাথারিন ও দ্বিতীয় জোসেফ। প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রের ত্রুটি—(১) রাজার ব্যক্তিত্বের উপর শাসনব্যবস্থার নির্ভরশীলতা, (২) নৃপতিগণ-কর্তৃক ভগবান-প্রদত্ত ক্ষমতার দাবি, (৩) প্রতিনিধি সভার ক্ষমতাহীনতা ও (৪) সুষ্ঠ আইন-বিধির অভাব। মানসিক উৎকর্ষের অগ্রগতি—বিপ্লবপূর্ব ইওরোপে মানসিক উৎকর্ষেব অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। যুক্তিবাদের প্রসার, দার্শনিকদের প্রভাব ও শক্তিশালী জনমতেব উন্মেষ—এই যুগের বৈশিষ্ট্য। এই যুগের দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ভলটেয়ার, ডিডেরো, রুশো, মণ্টেস্কু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব, অর্থনৈতিক, সাহিত্য ও শিল্পেব ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। এই যুগে প্রায় প্রত্যেক দেশেই 'মার্কেণ্টাইল-নীতি' অনুসারে অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাবিধ আবিষ্কারের ফলে পদার্থ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়। ব্যঙ্গাত্মক ও রোমান্টিক রচনার মধ্যে জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্নমালা

১। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইওরোপের অবস্থা বর্ণনা কর।
[Describe the conditions of Europe during the mid-18th century.]

২। অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
[Describe the causes and results of the Austrian War of succession.]

৩। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
[Describe the causes and results of the Seven Years' War.]

৪। জ্ঞানদীপ্ত-যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
[Discuss the chief characteristics of the Age of Enlightenment.]

৫। 'জ্ঞানদীপ্ত-স্বৈরাচার' বলিতে কি বোঝায়? অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের মধ্যে কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর?
[Define the term 'Enlightened Despotism'. Whom do you regard as the best Enlightened despot of the 18th century ?]

৬। ফ্রেডারিক-দি-গ্রেটের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
[Describe the character and achievements of Frederick-the Great.]

৭। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।
[Write a short account of Catherine II' domestic and foreign policy.]

৮। দ্বিতীয় জোসেফের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
[Describe the character and achievements of Joseph II.]

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লব ঃ আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ

(French Revolution : American War of Independence)

বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্স (France before the Revolution) ঃ চতুর্দশ-লুই (Louis XIV)-এর মৃত্যুর (১৭১৫) ফ্রান্স তথা ইওরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি ফ্রান্সে রাজতন্ত্রকে সর্বাত্মক শক্তিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফরাসী রাজশক্তির প্রাধান্য ও চতুর্দশ-লুই-এর ব্যক্তিগত চরিত্র ইওরোপীয় রাজনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি স্বরাজ্যে এককেন্দ্রিক স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রজাবর্গের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ধ্বংস করিয়া রাজনীতি, ধর্ম ও এমনকি সাহিত্যের উপর একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

চতুর্দশ-লুই-এর কৃতিত্ব ; স্বদেশে নিরঙ্কুশ রাজশক্তি স্থাপন ; ইওরোপে প্রাধান্য স্থাপন

জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই রাজতন্ত্র চূড়ান্তভাবে স্বৈরাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন এবং আমলাশ্রেণী ছিল রাজার একান্ত আজ্ঞাবাহী। ফ্রান্সের সীমানাবিস্তার, আর্থিক সচ্ছলতা এবং ইওরোপীয় রাজনীতিতে ফরাসী রাজশক্তির প্রাধান্য স্থাপন—চতুর্দশ-লুই-এর শাসনকালের চরম সাফল্য। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে ফ্রান্সকে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ফলে ফ্রান্সের আর্থিক শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রটেস্টান্ট দেশমাত্র ফ্রান্সের শত্রুতে পরিণত হয়।

ফ্রান্স ও ইওরোপে চতুর্দশ-লুই-এর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া

পঞ্চদশ-লুই (১৭১৫-৭৪) ঃ ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দশ-লুই-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র পঞ্চদশ-লুই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নাবালকত্বে তাঁহার খুল্লতাত ডিউক অফ্ অর্লিয়েন্স দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। পার্লামেণ্ট ও অভিজাত সমর্থকদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য অর্লিয়েন্স প্রতিক্রিয়াশীল-নীতি গ্রহণ করিলেন। অভিজাতগণকে পুনরায় শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হইল এবং পার্লামেণ্টকেও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হইল। এই সকল পরিবর্তন প্রচলিত

পঞ্চদশ-লুই-এর নাবালকত্বে অর্লিয়েন্সের রাজপ্রতিনিধিত্ব

শাসনব্যবস্থার উপর দারুণ আঘাত হানিল। কিন্তু এই শাসন-পরিবর্তন সাফল্য-মণ্ডিত হইল না। ইহার কারণ হইল শাসনকার্যে অভিজাতদের ও পার্লামেণ্টের অনভিজ্ঞতা এবং ডিউক অফ্ অর্লিয়েন্সের স্বার্থপরতা।

অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা

এ সময় ফ্রান্সে অর্থনৈতিক সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন ছিল। আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে ধনীদের নিকট হইতে নানা উপায়ে অর্থ-সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। ধনীদের গুপ্তধনের সংবাদদাতাগণকে পুরস্কৃত করা হইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ বলপূর্বক সংগৃহীত অর্থ ফ্রান্সের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় কতকজনকে বিত্তশালী করিয়া তুলিল।

জন লার ব্যবস্থা

জন লা নামে জনৈক অর্থবিশেষজ্ঞ সচ্ছলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে সরকারের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও মিসিসিপি কোম্পানি নামে একটি যৌথ-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে কাগজী-মুদ্রার বহুল প্রচলন করা হইল। মিসিসিপি কোম্পানির প্রচুর শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হইল এবং প্রথম কয়েক বৎসর কোম্পানি প্রচুর লাভ করিল। কিন্তু কাগজী-মুদ্রা স্ফীত হইয়া উঠিলে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ইতিমধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল এবং মিসিসিপি কোম্পানির ব্যবসা মন্দা হইয়া পড়িল। ফলে জনসাধারণের মধ্যে এক দারুণ চাঞ্চল্য ও ভীতির সঞ্চার হইল।

ফলাফল অর্থনৈতিক বিপর্যয়

ফ্লিউরির প্রধান মন্ত্রিত্ব

এইরূপ অবস্থায় পঞ্চদশ-লুই কার্ডিনাল ফ্লিউরি (Fleury) নামক একজন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন। ফ্রান্সের সেই সময়কার শাসকদের তুলনায় ফ্লিউরি ছিলেন অধিক নিঃস্বার্থপর, পরিশ্রমী এবং মিতব্যয়ী। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ফ্লিউরি বহুলাংশে চতুর্দশ লুই-এর শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করিলেন। ব্যয়সঙ্কোচের দ্বারা ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার চেষ্টা করিয়া তিনি আংশিকভাবে সফলকাম হইলেন। তাঁহার শাসনকালে একমাত্র ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে ফ্রান্সে গোলযোগ হইয়াছিল।

ফ্লিউরির পররাষ্ট্র-নীতি

পররাষ্ট্র-নীতিতে ফ্লিউরি শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন, যদিও তাঁহাকে পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার ও অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দুইটি যুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছিল।

পঞ্চদশ-লুই-এর আমলে পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধে যোগদান করিয়া ফ্রান্স লোরেন প্রাপ্ত হয় এবং উহা ফ্রান্সের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ফ্লিউরির পররাষ্ট্র-নীতি পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে (১৭৪১-৪৮) যোগদান করিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৭-৬৩) ইংল্যাণ্ডের নিকট ফ্রান্সকে পরাজয় ও মর্যাদাহানির গ্লানি ভোগ করিতে হয়। এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের আমেরিকা ও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে পরিত্যাগ করিতে হয়।

পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধে ফ্রান্সের লাভ

অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের ক্ষতি

ফ্লিউরির মৃত্যুর পর ফ্রান্সে অব্যবস্থা শুরু হইল। উচ্ছৃঙ্খল ও আড়ম্বরপ্রিয় পঞ্চদশ-লুই-এর ঔদাসীন্যের ফলে তাঁহার কয়েকজন প্রিয়পাত্রীর দ্বারা দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতে লাগিল। এইসব প্রিয়-পাত্রীদের মধ্যে মাদাম্-ডি-পম্পাডোর-এর নাম উল্লেখ-যোগ্য। পঞ্চদশ-লুই-এর দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্বার্থান্বেষী অভিজাত ব্যক্তিগণ রাজসভায় স্থানলাভ করিয়া শাসনব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল। নিঃশেষিত রাজকোষ, স্বদেশের আর্থিক দুরবস্থা ও বিদেশে পরাজয়ের গ্লানি প্রভৃতি কারণে রাজবংশের উপর জনসাধারণের আস্থা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল এবং শাসনপদ্ধতির সমালোচনা শুরু হইল। জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়া প্যারিসের পার্লামেণ্ট রাজার সহিত বিরোধ শুরু করিল। ফ্রান্সে মহাঝটিকা যে আসন্ন তাহা অনুমান করিয়াই পঞ্চদশ-লুই বলিয়াছিলেন—"After me the Deluge"। রাজনৈতিক দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক দুরবস্থা যখন চরমে পৌছিতেছিল সেইসময় পঞ্চদশ-লুই-এর মৃত্যু হয় (১৭৭৪)।

পঞ্চদশ-লুই-এর উচ্ছৃঙ্খলতা, শাসনসংক্রান্ত অবস্থা, জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ

ষোড়শ-লুই (১৭৭৪-৯৩)

পঞ্চদশ-লুই-এর মৃত্যুর পর ষোড়শ-লুই সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ছিলেন দয়াপরায়ণ ও উদারচেতা এবং প্রজাবর্গের কল্যাণসাধনে ইচ্ছুক। কিন্তু মানসিক দুর্বলতা ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব তাঁহাকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল। ফ্রান্সে তখন প্রয়োজন ছিল একজন সুদক্ষ শাসক, ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠন। উপরন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে অভিজাতগণকে করদানে বাধ্য করারও প্রয়োজন ছিল।

ফ্রান্সের সমস্যা : শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও অভিজাতসম্প্রদায় দমন

ষোড়শ-লুই টুর্গো (Turgot) নামে একজন অভিজাত অর্থনীতিবিদ্‌কে অর্থ-নৈতিক সংস্কারের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। এসময় ফরাসী সরকার একমাত্র ঋণের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিল। মোট আয় ছিল ২১৩ মিলিয়ন অথচ ব্যয় ছিল ২৩৫ মিলিয়ন—অর্থাৎ প্রতি বৎসর ২২ মিলিয়ন ঘাটতি পড়িত। সরকারের আর্থিক অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে টুর্গোর নীতি ছিল (১) নূতন কর স্থাপন না করা এবং (২) ঋণ গ্রহণ না করা। সরকারী ব্যয় সংকোচ করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে সরকারের বাৎসরিক ঘাটতি ১১ মিলিয়ন উদ্বৃত্তে পরিণত হইল। এতদ্ভিন্ন অপ্রয়োজনীয় সরকারী পদগুলি উঠাইয়া দিয়া তিনি আর্থিক অব্যবস্থা বহুলাংশে দূর করিলেন। কিন্তু অর্থসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে গিয়া টুর্গো অভিজাত ব্যক্তিগণকে তাহাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও সরকারী বৃত্তিভোগ হইতে বঞ্চিত করিলেন। ফলে ইহারা রাষ্ট্রের শত্রুতে পরিণত হইল।

টুর্গোর নীতি নূতন কর স্থাপন না করা ও ঋণ গ্রহণ না করা

টুর্গো অবাধ বাণিজ্য-নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা লাঘব করার উদ্দেশ্যে তিনি খাদ্যদ্রব্যের চলাচলের উপর প্রচলিত নানা প্রকার শুল্ক ও বিধিনিষেধগুলি উঠাইয়া লইলেন; খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ করিলেন এবং ব্যবসায়ীদের সংঘ ও তাহাদের একচেটিয়া অধিকার বাতিল করিয়া দিলেন। তিনি কৃষকদের নিকট হইতে জবরদস্তি-মূলক শ্রম-গ্রহণ-নীতি (Corvee) নাকচ করিয়া রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় রাজস্ব হইতে নির্বাহ করার ব্যবস্থা করিলেন; লবণের উপর কর নূতনভাবে ধার্য করিয়া অসামঞ্জস্য দূর করিলেন। এতদ্ভিন্ন উদার ধর্ম-নীতি গ্রহণ করিয়া তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহাতে ফ্রান্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাথলিক ধর্মযাজকগণ টুর্গোর বিরোধী হইয়া উঠিল। টুর্গোর অর্থসঞ্চয়-নীতি, বাণিজ্য-নীতি ও ধর্ম-নীতির প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই দেখা দিল। অভিজাত, ব্যবসায়ী ও ধর্মযাজক এই তিনটি সম্প্রদায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাহারা টুর্গোর শত্রুতে পরিণত হইল। টুর্গো পদচ্যুত হইলেন।

অবাধ বাণিজ্য-নীতি

উদার ধর্ম-নীতি

টুর্গোর পদচ্যুতি

টুর্গোর পদচ্যুতির পর ষোড়শ-লুই নেকার (Necker) নামে অপর একজন অর্থনীতিবিদের উপর রাজস্ব বিভাগের ভার অর্পণ করিলেন। নেকার ছিলেন বিদেশী ও প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বী। তিনি টুর্গোর অবাধ বাণিজ্য-নীতির বিরুদ্ধে বিরোধীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রার

নেকারের আর্থিক সুবন্দোবস্তের প্রচেষ্টা

স্ফীতি ঘটাইয়া তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করার নীতি গ্রহণ করিলেন। তিঁনি সরকারের ব্যয় সংকোচ করিলেন; অপ্রয়োজনীয় সরকারী পদগুলি উঠাইয়া দিলেন এবং কর্মচারী ও রাজপরিবারের পেনসন্ কমাইয়া দিলেন। এইভাবে নেকার যখন অর্থসঞ্চয় করিতে ব্যস্ত, সেই সময় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হইল এবং ফরাসী সরকার ঔপনিবেশিকগণকে অর্থসাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য নেকার অভিজাতগণের নিকট হইতে উচ্চহারে কর আদায় করিতে লাগিলেন; রাজপ্রাসাদের প্রায় ৫০০ কর্মচারীর পদ বিলুপ্ত করিলেন; নৌ ও সেনাবিভাগের কোষাধ্যক্ষের পদ ২৭ হইতে কমাইয়া ২ জন করিলেন। এই সকল বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কর্মচারী-শ্রেণী ও অভিজাতশ্রেণী দারুণ বিক্ষোভ শুরু করিল। অবশেষে বিরোধীদের চাপে ষোড়শ লুই নেকারকে পদচ্যুত করিলেন। একদিক দিয়া নেকারের শাসনকাল ফ্রান্সের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। রুশোর ন্যায় তিনিও রাজতন্ত্র শাসিত ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। এ্যাসেমব্লিগুলিকে অধিকতর প্রতিনিধিমূলক করিয়া নেকার জনসাধারণের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি ফরাসী বিপ্লবের পথ অনেকাংশে প্রস্তুত করেন।* নেকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রচেষ্টার অবসান ঘটে। নেকারের প্রথম পদচ্যুতি এবং দ্বিতীয়বার নিয়োগের মধ্যবর্তীকালে রাজস্ব-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন ক্যালোন (Calonne)। ক্যালোন এই দায়িত্বের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজসভা, জনসাধারণ এবং এমনকি নিজের নিকট হইতেও স্বদেশের যথার্থ পরিস্থিতি গোপন রাখা। তিনি যথেচ্ছভাবে অপ্রয়োজনীয় কার্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া রাজপুত্র ও অভিজাতদের অর্থলোভে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন; জনসাধারণের মনে আর্থিক স্বচ্ছলতার ভ্রম সৃষ্টি করিয়া প্রচুর ঋণ সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহের উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি শ্রেণী-নির্বিশেষে সকলের উপর নূতন কর ধার্য করিলেন। ইহাতে সুবিধা-ভোগী শ্রেণী বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ষোড়শ লুই কাউন্সিল অফ নোটেবল্‌স্ (Council of Notables) আহ্বান করিলেন। এই কাউন্সিলে সুবিধাভোগীগণই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং ক্যালোনের সমভাবে সকলের উপর কর স্থাপন এবং আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক বাতিল করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব সহজেই নাকচ

নেকারের অর্থনৈতিক নীতি

নেকারের কার্যাদি

নেকারের পদচ্যুতি

নেকার ও ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শ

ক্যালোন

ক্যালোনের ভ্রান্ত নীতি

কাউন্সিল অফ নোটেবল্‌স্ ও ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত

* 'Thus he did much to prepare the way for the Revolution.'—*Lodge.*

হইল। ক্যালোনকে পদচ্যুত করিয়া ষোড়শ লুই অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি বিধান করিলেন। এই সভাতেই আসন্ন ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হইল।

স্টেটস্ জেনারেল অধিবেশনের ঘোষণা ও বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত

সরকারের আর্থিক দুরবস্থা চরমে পৌছিলে এবং স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশনের দাবি ব্যাপক হইয়া উঠিলে ষোড়শ লুই ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে (৫ই জুলাই) স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করিলেন। বস্তুতঃ জনসাধারণ যখন নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় জাতীয় সভার আহ্বান ফরাসী বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করিল।*

ফরাসী বিপ্লব

(French Revolution)

বিপ্লবের কারণ (Causes of the Revolution): স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হইলেও এই যুগান্তকারী বিপ্লব কোন একটি আকস্মিক ঘটনার ফল নহে। বিপ্লবের কারণগুলি ছিল বিভিন্ন ধরণের এবং ব্যাপক।

(১) রাজনৈতিক কারণ (Political): সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্‌ল্যু, কোলবার্ট ও চতুর্দশ লুই-এর আমলে ফ্রান্স ছিল স্বৈরাচারী ও সমৃদ্ধশালী দেশ। কিন্তু

---

* স্টেটস্-জেনারেল আহ্বানের যৌক্তিকতা: স্টেটস্ জেনারেল আহ্বানের পশ্চাতে কারণ ছিল (১) ক্যালোনের ভ্রান্ত নীতি, (২) সুষ্ঠু শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টার ব্যর্থতা (৩) সুবিধা-ভোগী সম্প্রদায়গুলির বিরোধিতা, (৪) আর্থিক দুরবস্থা, (৫) অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে জনসাধারণের ব্যাকুলতা এবং (৬) ষোড়শ লুই-এর দুর্বলচিত্ততা ও আত্মপ্রত্যয়হীনতা।

অনন্যোপায় হইয়াই যে ষোড়শ-লুই স্টেটস্-জেনারেল আহ্বান করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জাতীয় সভা আহ্বান করিবার পরিবর্তে শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার একমাত্র উপায় ছিল ব্যাপক সংস্কার সাধন করা। সে সময় রাজশক্তি ছিল শাসন পরিচালনায় অসমর্থ, শাসনব্যবস্থা বিকল, রাজশক্তির উপর অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তি, চরম আর্থিক দুরবস্থা এবং ষোড়শ-লুই ছিলেন দুর্বলচেতা ও আত্মপ্রত্যয়হীন। কোনরূপ বিকল্প পন্থা গ্রহণ করিয়া রাজ্যের কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলার মত রাজনৈতিক দূরদর্শিতা রাজা তথা মন্ত্রী কাহারও ছিল না। অপর দিকে ফরাসী জাতি মন্টেস্কু, এ্যাডাম স্মিথ, রুশো প্রভৃতি দার্শনিকদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের দৃষ্টান্তে তাহারা ছিল অনুপ্রাণিত। এইরূপ অবস্থায় স্টেটস্ জেনারেল আহ্বান করিয়া উহার সাহায্য প্রার্থনা করা ছাড়া ষোড়শ লুই-এর অন্য উপায় ছিল না। জাতীয় সভা আহ্বান করিবার ব্যাপারে ষোড়শ লুই-এর অক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে রাজতন্ত্রকে বাঁচাইবার উপায় যে ছিল না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সভা আহ্বান না করিলে ফরাসী বিপ্লব প্রথম হইতেই উগ্র আকার ধারণ করিত এবং বিপ্লবের মধ্যেও রাজতন্ত্র যে কিছুদিন বাঁচিয়া ছিল তাহা সম্ভব হইত না। 'স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশনের দ্বারা রাজা দেশের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিতভাবে রাজতন্ত্রকে রক্ষা করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতেই স্টেটস্ জেনারেল আহ্বানের সার্থকতা পাওয়া যায়। অবশ্য শেষপর্যন্ত নিজ দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতা হেতু ষোড়শ লুই সে সুযোগ কার্যকরী করিতে পারেন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডিউক অফ অর্লিয়েন্স, পঞ্চদশ লুই ও মাদাম-ডি-পম্পাডোর-এর প্রভাবাধীনে ফ্রান্স ছিল এক পতনোন্মুখ রাজ্য।

ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল স্বৈরাচারী এবং চতুর্দশ লুই-এর আমলে রাজশক্তি অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বৈরাচারী কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় প্রতিনিধিমূলক সভা বা জনমতের কোন স্থান ছিল না। রাজা নিজেকে ভগবান-প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। ফ্রান্সে স্টেটস্ জেনারেলের নামে সামন্তযুগীয় এক প্রতিনিধি পরিষদ ছিল বটে কিন্তু বস্তুতঃ উহা ভূম্যধিকারীদের প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এই সভা আহুত হয় নাই। চতুর্দশ লুই-এর ব্যক্তিত্ব ও শাসন-ক্ষমতার ফলে এবং উপযুক্ত প্রতিনিধি পরিষদের অভাববশতঃ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্বৈরাচারী শাসন নিরঙ্কুশভাবেই চলিতেছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী-রাজগণ স্বৈরাচারী কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখিলেও তাঁহাদের শাসনদক্ষতা মোটেই ছিল না। পঞ্চদশ লুই ছিলেন পিতার অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তিনি ছিলেন আড়ম্বরপ্রিয় ও উচ্ছৃঙ্খল। ষোড়শ লুই ব্যক্তিগতভাবে সংস্কারকামী ছিলেন। কিন্তু এই কামনাকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা বা চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া অভিজাতশ্রেণী পুনরায় রাজসভায় স্থানলাভ করিয়া শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে শুরু করিয়াছিল। ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ রাজপরিবার ও অভিজাতদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রাজকর্মচারীগণও স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ সর্বত্র কার্যকরী করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র

প্রতিনিধিমূলক পরিষদের অভাব

চতুর্দশ লুই-এর উত্তরাধিকারীদের অপদার্থতা

অভিজাতশ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপন

রাজকর্মচারীগণ কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ অমান্য

শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার ফলে অত্যাচার ও অবিচার ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল। বিচারের নামে অবিচার চালাইয়া দুর্নীতিপরায়ণ বিচারক-গণ নিজেদের আয়ের পথ প্রশস্ত করিতেছিল। আইনের চক্ষে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী সমান অধিকার ও মর্যাদা পাইত না। "Letters de Cachet" নামে গ্রেফতারী পরোয়ানার দ্বারা রাজা অনির্দিষ্ট কালের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে কারাগারে আটক রাখিতে পারিতেন। চতুর্দশ লুই-এর যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে সরকারের আর্থিক সচ্ছলতা বিনষ্ট হইয়াছিল। ইহার উপর পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই-এর আড়ম্বরপ্রিয়তা ও অমিতব্যয়িতার ফলে জাতীয় ঋণের অঙ্ক স্ফীত হইতে স্ফীততর হইয়া উঠিয়াছিল।

দুর্নীতিপূর্ণ বিচারব্যবস্থা

ব্যক্তিস্বাধীনতা লুপ্ত

এতদ্ভিন্ন আর্থিক সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান ও অর্থ সাহায্যদানের ফলে সরকারের আর্থিক দুরবস্থা চরমে পৌছিয়াছিল এবং রাজতন্ত্রের উপর জনসাধারণ আস্থা হারাইয়াছিল।

শূন্য রাজকোষ

(২) সামাজিক কারণ (Social) : ইওরোপের অপরাপর দেশের ন্যায় ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল সামন্তনীতি। সামন্তযুগে সমাজে দুইটি বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল—যেমন অভিজাত সম্প্রদায় ও যাজকসম্প্রদায়। এই দুই সম্প্রদায় রাষ্ট্র ও সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধার একমাত্র অধিকারী ছিল। সামন্ত বা ফিউডাল প্রথা অনুসারে এই দুই সম্প্রদায় রাষ্ট্রকে সাহায্য করার পরিবর্তে নানারকম সুবিধা ও করপ্রদান হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিত। যদিও সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে রাজশক্তি স্বৈরাচারী ও কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে অভিজাতগণ তাহাদের বহু কর্তব্য ও প্রতিপত্তি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিল তথাপি তাহারা শ্রেণীসুলভ অহমিকা ও ঔদ্ধত্য তখনও বজায় রাখিয়াছিল। তাহারা কোনপ্রকার করদানে বাধ্য ছিল না এবং অধীনস্থ প্রজাদের নিকট হইতে বলপূর্বক শ্রম ও বহু বিরক্তি কর কর আদায় করিত। ইহার ফলে প্রজাবর্গ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল।

সুবিধা-ভোগী অভিজাতশ্রেণী

যাজক শ্রেণীর মধ্যে উচ্চতর সম্প্রদায় সামন্তপ্রথা অনুসারে বহু সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিল। তাহারা ধর্মীয় কর্তব্যের জন্য যে সকল সুবিধা ভোগ করিত তাহার বিন্দুমাত্র প্রতিপালন করিত না। উপরন্তু অভিজাতদের ন্যায় রাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপারেও তাহারা প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল। উচ্চতর যাজকগণ যেমন ছিল বিত্তশালী তেমনি রাজানুগ্রহভোগী এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় রাজসভায় আমোদ প্রমোদ করিয়া কাটাইত। অধস্তন যাজকগণ ছিল দরিদ্র, উচ্চতর যাজক-সমাজে অপাংক্তেয় এবং পদোন্নতির আশা-ভরসা হইতে বঞ্চিত। ফলে উচ্চতর যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অধস্তন যাজকদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং আসন্ন বিপ্লবে তাহারা তৃতীয় শ্রেণী বা অধিকারহীন জনসাধারণের সহিত হাত মিলাইতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

সুবিধা-ভোগী যাজকশ্রেণী

দুই ভাগে বিভক্ত উচ্চতর বা ধনী যাজক এবং অধস্তন বা দরিদ্র যাজক

মধ্যবিত্তসম্প্রদায় ছিল সমাজের তৃতীয়শ্রেণী। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী, শিক্ষাজীবী, ব্যবহারজীবী এই শ্রেণীভুক্ত ছিল। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি উপরোক্ত দুই শ্রেণীর একচেটিয়া হওয়ায় তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত লোকেরা বিভিন্ন রকমের পেশা বা জীবিকা গ্রহণ করিয়াছিল। বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থের দিক দিয়া এই সম্প্রদায়ের অনেকেই অভিজাতদের অপেক্ষায় বহু ঊর্ধ্বে ছিল। এই কারণে ইহারা প্রথম দুই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক

তৃতীয় শ্রেণী : মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়

সুযোগ-সুবিধা সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারিত না। প্রথম দুই সম্প্রদায় রাজসম্মান রাজকার্য ও বিভিন্ন রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত বটে কিন্তু রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব ছিল এই তৃতীয় শ্রেণীর। সুতরাং এই ধরনের বৈষম্য এই সম্প্রদায়কে প্রথম দুই সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

এই মধ্যবিত্তসম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত। নিম্ন-মধ্যবিত্ত লোকেরা উচ্চ-মধ্যবিত্ত লোকদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিল। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় একপ্রকার উচ্চ-মধ্যবিত্তদের একচেটিয়া ছিল এবং চাকুরির ক্ষেত্রেও ইহাদের কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না।

সামাজিক বৈষম্য বিপ্লবের অন্যতম কারণ

সুতরাং সামাজিক বৈষম্য ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ। রাইকারের মতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক সমতালাভের আন্দোলন ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে অহমিকা বা স্বাধীনতার দাবি বিপ্লবের অজুহাত মাত্র, বিপ্লবের মূল কারণ ছিল—শ্রেণী সংঘাত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক সমতার দাবি।*

চতুর্থ শ্রেণী : কৃষক ও শ্রমশিল্পী

সমাজের সর্বনিম্নে ছিল কৃষক ও শ্রমিক। ইহারা সংখ্যায় সর্বাধিক হইলেও ইহাদের দুরবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। ব্যবসা-বাণিজ্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া হওয়ায় শ্রমিক বা শ্রমশিল্পীদের পক্ষে দিনমজুরির কার্য করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। অল্প বেতন ও অধিক পরিশ্রমে ইহাদের জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত। কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা কৃষকদের অবস্থা ছিল অত্যধিক মন্দ। কৃষকরা ছিল সর্বপ্রকারে জমিদারদের অধীন। ইহাদের উপর সমভাবে অত্যাচার করিত রাজা, রাজকর্মচারী, জমিদার ও চার্চ। অপরাপর ইওরোপীয় দেশের কৃষকদের তুলনায় ফ্রান্সের কৃষককুল অধিক সঙ্গতিপন্ন ও বুদ্ধিসম্পন্ন থাকায় ইহারা নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল এবং ইহাদের সহায়তা ব্যতীত বিপ্লব কার্যে পরিণত হইত কিনা সন্দেহ। এই নির্যাতিত ও অত্যাচারিত চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং নিজেদের উপযোগী করিয়া পুরাতন সমাজের সমাধির উপর এক নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল।*

---

* "What made Revolution ? Vanity, Liberty was only the excuse."
—*Napoleon.*

** "The mass of the people in its majority, its lowest and most profound strata, marked by the yoke and by exploitation, rose spontaneously and stamped on the course of the evolution the seal of their demands, their attempts to construct in their own manner a new society in place of the old one they were destroying."
—Lenin

(৩) অর্থনৈতিক কারণ (Economic) **:** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দারুণ বৈষম্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী সমাজ প্রধানতঃ অধিকার-প্রাপ্ত (Privileged) ও অধিকারহীন (Unprivileged)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ এক শ্রেণী কর প্রদান না করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত এবং অপর শ্রেণী উহা প্রদান করিয়াও সকল সুযোগ-সুবিধা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। প্রথম দুই শ্রেণী ফ্রান্সের অধিক ভূমির মালিক ছিল; অথচ তাহারা কোন প্রকার কর প্রদান করিত না। রাষ্ট্রের সকল করভার নিম্নস্তরের লোকদের বিশেষতঃ কৃষকদের বহন করিতে হইত। উহারা তিন প্রকারের কর প্রদানে বাধ্য থাকিত—ভূস্বামীকে কর প্রদান, চার্চকে আয়ের এক-দশমাংশ বা Tithe প্রদান এবং রাজাকে ভূমিরাজস্ব প্রদান। করভারে জর্জরিত কৃষকদের পক্ষে চাষের উন্নতিসাধন করা একরূপ অসম্ভবই ছিল। কর আদায়ের ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং ইহার ফলে রাজ-কর্মচারী ও ভূস্বামীগণ কর্তৃক কৃষকগণ নির্যাতিত ও নানাভাবে লাঞ্ছিত হইত। এককথায় ফ্রান্সের কৃষকসমাজ একপ্রকার ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছিল।

অধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণী অর্থনৈতিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কর্তৃক সমগ্র কর-ভার বহন

কৃষকদের দুরবস্থা

অর্থনৈতিক কারণই যে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই ("The Revolution was precipitated by the economic factor…")। চতুর্দশ লুই-এর যুদ্ধ-বিগ্রহাদির ফলে ফ্রান্সের রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই-এর উচ্ছৃঙ্খলতা এবং আড়ম্বর প্রিয়তার ফলে সরকারের ঋণের বোঝা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নূতন কর ধার্য করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিবার কোন উপায় তখন ছিল না। কারণ করপ্রদান হইতে মুক্ত অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণী কর প্রদান করিত না এবং অধিকারহীন শ্রেণীর করপ্রদানের ক্ষমতা আর ছিল না। অবশেষে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ফ্রান্সের আর্থিক কাঠামোর উপর চরম আঘাত হানিয়াছিল। অর্থ সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা ষোড়শ লুই স্টেট্‌স-জেনারেল আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই কারণে বলা হইয়া থাকে "The fiscal causes lay at the root of the Revolution."

(৪) বিপ্লবী সাহিত্য ও ফরাসী দার্শনিকের প্রভাব (Influence of Philosophers) **:** ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্বেই ভাবজগতে বিপ্লব আসিয়াছিল। বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য—সকল ক্ষেত্রেই যুক্তিবাদ (Rationalism)-এর প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং রাজা ও প্রথম দুই সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সমালোচনা চলিতে থাকে।

ভাবজগতের বিপ্লব

(১) ফিজিওক্র্যাটস্ (Physiocrats) নামে এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ্ অর্থনীতির নূতন ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বিরোধী ছিলেন। [illegible]

ফিজিওক্র্যাটস্

ক্ষেত্রে তাঁহারা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। (২) ডিডেরো, ডি' এলেমবার্ট প্রভৃতি বিশ্বকোষ প্রণেতৃবর্গ (Encyclopaedists) তাঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া ফ্রান্সের ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা শুরু করেন। তাঁহাদের রচনার ফলে নির্যাতিত জনসাধারণ রাষ্ট্রতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে পরিবর্তন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এনসাইক্লোপিডিয়া

বিপ্লব ত্বরান্বিত করিতে যাঁহারা বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মণ্টেস্কু (Montesquieu), ভলটেয়ার (Voltaire), রুশো (Rousseau) ছিলেন অন্যতম।

মণ্টেস্কু (১৬৮৫-১৭৫৫)

মণ্টেস্কু ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল ইংল্যাণ্ডে বসবাস করিবার ফলে ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের উপর শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কখনই বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি ও দায়িত্বহীন স্বৈরাচারী শাসন পদ্ধতির তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক। 'দি পার্সিয়ান লেটার্স' (The Persian Letters) নামক গ্রন্থে তিনি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ 'দি স্পিরিট অফ লজ' (The Spirit of Laws) নামক গ্রন্থে তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের দাবি উত্থাপিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি পরবর্তীকালে বিপ্লবী শাসনতন্ত্র রচনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ভল্‌টেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮)

বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভলটেয়ার-এর অবদান শ্রেষ্ঠ ("Of the many assistants of authority, tradition and custom, Voltaire was most famous")। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মূর্ত প্রতীক এবং সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সকল প্রকার দুর্নীতি ও অন্যায়ের মূর্ত প্রতিবাদ স্বরূপ। তিনি প্রাশিয়ারাজ ফ্রেডারিক-দি গ্রেট-এর সম্মানিত অতিথি ছিলেন এবং রুশ রানী দ্বিতীয় ক্যাথারিন তাঁহার সহিত পত্রালাপ করিতেন। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, নাট্যকার ও প্রহসনাত্মক লেখক। নাস্তিক না হইয়াও তিনি ছিলেন চার্চের তীব্র সমালোচক। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী না হইয়াও তিনি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও স্বাধীন রচনার সমর্থক ছিলেন। তিনি রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াও ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতির তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদে বিশ্বাসী। জনসাধারণকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে তাঁহার ন্যায় অন্য কেহ এতটা সফলকাম হন নাই। তিনি নিজেই এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "লুথার বা ক্যালভিন অপেক্ষা আমার যুগে আমি কম করি নাই"।

রুশো ফরাসী বিপ্লবের কয়েক বৎসর পূর্বে ফ্রান্সে এক অভূতপূর্ব প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম যুদ্ধের মন্ত্র প্রচার করেন এবং ইওরোপীয় সমাজের উপর এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ভীরু এবং ষড়যন্ত্রকারী। কিন্তু তাঁহার রচনা সমসাময়িকদের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি মনে করিতেন "মানুষ স্বাধীন সত্তা লইয়া জন্মগ্রহণ করে কিন্তু মানুষ সর্বত্র পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হইল সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া জন্মজগত স্বাধীন সত্তা অর্জন করা"। রুশো ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। প্রচলিত কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁহার আস্থা ছিল না। সমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃসংঘের দ্বারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত রাষ্ট্রের উপর তাঁহার অধিক বিশ্বাস ছিল। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির উৎস হইল জনসাধারণ। সুতরাং জনসাধারণের মতানুসারে রাজা রাষ্ট্র পরিচালনা না করিলে তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করার ক্ষমতা জনসাধারণের রহিয়াছে। ইহাই হইল তাঁহার রচিত 'সোসিয়েল কন্‌ট্রাক্ট' (Social Contract) নামক গ্রন্থের মূল কথা। তাঁহার রচনায় গুরুত্ব সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক মর্লে (Morley) বলিয়াছেন—প্রথমতঃ তিনি জনসাধারণের এই ধারণাই বদ্ধমূল করিয়াছিলেন যে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাদির ত্রুটি বৃহৎ মানব সভ্যতাকে নষ্ট করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, তিনি ফরাসী জনসাধারণকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার মত উপযোগী উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছেন। একথা অনস্বীকার্য যে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় 'মানব অধিকার ঘোষণা'-র মধ্যে রুশো-র প্রভাব ছিল।

রুশো (১৭১২-১৭৭৮)

রুশো প্রচলিত রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের অসারতা প্রমাণিত করেন

জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের দাবি করেন

তাঁহার রচিত Social Contract গ্রন্থ

রুশোর প্রভাব সম্পর্কে মর্লের মতামত

ফরাসী দার্শনিকগণ তাঁহাদের রচনার দ্বারা রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের দোষত্রুটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিপ্লবের পথ সহজ ও ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন। প্রায় একই উপায়ে জার্মান সমাজতন্ত্রী কার্ল মার্ক্স-এর রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রাশিয়ার বলশেভিকগণ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জারতন্ত্রের উচ্ছেদকল্পে বিদ্রোহী হইয়াছিল। এই দুই দেশেই শক্তিশালী ও অত্যাচারী সংখ্যালঘু-সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর কয়েক শতাব্দী ধরিয়া শাসন চালাইয়া আসিতেছিল। উভয় দেশের জনসাধারণ পুর্বতন শাসন-ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া এক নূতন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল।

উপসংহার

ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের মধ্যে সাদৃশ্য

(৫) ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব (Influence of Glorious Revolution and American War of Indepen-

dence) দার্শনিকদের প্রভাব ছাড়াও আরও দুইটি ধারার প্রভাব ফরাসী বিপ্লবে সাহায্য করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে একটি হইল ইংল্যাণ্ডের প্রভাব ও অপরটি হইল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব। ("The flow of ideas which directed France towards the Revolution, was composed of two streams, one English and the other American.")

দুইটি ধারার প্রভাব

ফরাসী দার্শনিকগণ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এই বিপ্লবের সমসাময়িক ইংরাজ লেখক লক্ (Locke)-এর 'জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের' মতবাদ ফরাসী দার্শনিকগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। লক্-এর রচনা ও গৌরবময় বিপ্লব ফ্রান্সের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণিত করিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের আদর্শে প্রভাবিত হইয়া ভলটেয়ার ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। মণ্টেস্কুও ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের প্রভাব

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধও ফরাসী বিপ্লবে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে ফরাসীগণ দলে দলে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকগণের সহিত যোগদান করিয়াছিল। তথায় তাহারা রুশোর মতবাদ কার্যকরী হইতে দেখিয়া স্বদেশে নিজেদের মুক্তির জন্য অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। লাফায়েৎ প্রমুখ অভিজাত ব্যক্তিগণ আমেরিকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশে প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ঔপনিবেশিকগণকে অর্থসাহায্য দান করিয়া ফরাসী সরকার কপর্দকশূন্য হওয়ায় ফরাসী বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব

ফ্রান্সে প্রথম বিপ্লব আরম্ভ হইবার কারণঃ বিপ্লবের পূর্বে ইওরোপীয় দেশগুলির রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রায় একই প্রকার ছিল। তথাপি কয়েকটি কারণে বিপ্লব সর্বপ্রথম ফ্রান্সেই আরম্ভ হয়। কারণগুলি হইল :—

(১) ফ্রান্সে রাজতন্ত্র অত্যধিক স্বৈরাচারী ও কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে সামন্ত প্রথার কার্যকারিতা বহুপূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। সামন্তপ্রথা অনুসারে শান্তিরক্ষা, শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ এবং রাজাকে সামরিক সাহায্য দানের বিনিময়ে সামন্তগণ করদান হইতে নিষ্কৃতি পাইত এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। কিন্তু রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ায় পূর্বোল্লিখিত কোন কর্তব্যই সামন্তদের ছিল না। কিন্তু তথাপি

তাহারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছিল। ইহার ফলে সামন্ত ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

(২) ফ্রান্সের কৃষককুল অপরাপর ইওরোপীয় দেশের কৃষকদের তুলনায় অধিক স্বাধীন, সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত ছিল। সুতরাং ভূস্বামীদের বিশেষ সামাজিক সুযোগ-সুবিধা কৃষকদের মনে ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল।

(৩) অপরাপর ইওরোপীয় দেশগুলি অপেক্ষা ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শিক্ষা দীক্ষায় অধিক অগ্রসর ছিল। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আর্থিক সচ্ছলতা ও শিক্ষার দিক দিয়া অভিজাতদের অপেক্ষায় অধিক শ্রেষ্ঠ ছিল অথচ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত ছিল। এই কারণে বিপ্লবের প্রাথমিক নেতৃবর্গ এই শ্রেণী হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইও-রোপের অন্যত্র এইজাতীয় সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব থাকায় সেইসব রাষ্ট্রে বিপ্লব দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই।

(৪) অপরাপর ইওরোপীয় দেশগুলি অপেক্ষা ফরাসীগণ অধিক মাত্রায় ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করিত এবং এই কারণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহারা উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারাই সর্বপ্রথম সমাজিক সমতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল।

(৫) ফরাসী রাজতন্ত্রের আর্থিক দুরবস্থার অনুরূপ দুরবস্থা ইওরোপের অন্য কোন দেশে ছিল না।

এই সকল কারণে বিপ্লব ফ্রান্সেই প্রথম দেখা দিয়াছিল।

ফরাসী বিপ্লব ও উহার গতি (১৭৮৯-১৮০৪)

(French Revolution : Its Course)

স্টেটস্ জেনারেল-এর অধিবেশন ও বিপ্লবের সূচনা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে স্বদেশের আর্থিক দুরবস্থা চরমে পৌছিলে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই ষোড়শ লুই স্টেটস্ জেনারেল বা জাতীয় প্রতিনিধি সভার অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সভা আহূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সে বিপ্লবের সূচনা হয়।

তৃতীয় শ্রেণী কর্তৃক সংখ্যা হিসাবে ভোট গণনার দাবি

স্টেটস্ জেনারেল—অভিজাত, যাজক ও জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি গণকে লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সমষ্টিগতভাবে এক একটি ভোটদানের অধিকার ছিল। প্রথম দুই সম্প্রদায় অপেক্ষা তৃতীয় সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা বেশী হইয়াও কোন সুবিধা ছিল না। কারণ স্বার্থের খাতিরে প্রথম দুই সম্প্রদায় সর্বদাই তৃতীয় সম্প্রদায়ের বিপক্ষে থাকিত। অধিবেশনের প্রারম্ভেই প্রথম দুই শ্রেণীর সহিত তৃতীয় শ্রেণীর বিবাদ শুরু হইল। তৃতীয় শ্রেণী দাবি করিল যে

ভোট গণনা শ্রেণী হিসাবে না করিয়া সংখ্যা হিসাবে করিতে হইবে। প্রথম দুই শ্রেণীর আধিপত্য লুপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় উহারা তৃতীয় শ্রেণীর এই প্রস্তাবে অসম্মত হইল। কিন্তু অভিজাতগণের মধ্যে নরমপন্থীগণ যেমন লাফায়েৎ, প্রভৃতি এবং অধস্তন যাজকগণ তৃতীয় শ্রেণীর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। রাজার নিকট হইতে কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় স্টেটস্ জেনারেলের তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ নিজেদেরকে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ (National Assembly) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সময় হইতে বিপ্লব শুরু হইল বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণী কর্তৃক জাতীয় পরিষদের ঘোষণা (১৭ই মে, ১৭৮৯-১৭৯১)

ষোড়শ লুই তৃতীয় শ্রেণী কর্তৃক জাতীয় পরিষদ গঠনের ঘোষণা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তিনটি শ্রেণীর একত্রে বসিয়া আলোচনা করার প্রস্তাব নাকচ করিলেন। তৃতীয় শ্রেণী এই ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রাজা তৃতীয় শ্রেণীর অধিবেশন কক্ষ বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্ষুব্ধ তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ মিরাবোঁ নামক একজন প্রতিনিধির নেতৃত্বে নিকটবর্তী টেনিস কোর্টে সমবেত হইলেন এবং শপথ গ্রহণ করিলেন যে যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা ফরাসী জাতির জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে না পারিবেন ততদিন তাঁহারা ঐক্যবদ্ধভাবে অধিবেশনের কাজ চালাইয়া যাইবেন।

টেনিস কোর্ট শপথ (২০শে মে, ১৭৮৯)

ষোড়শ লুই এক অধিবেশনে স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিলেন যে তিন সম্প্রদায়ের ভোট পৃথকভাবে দিতে হইবে। রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া প্রথম দুই শ্রেণী সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন কিন্তু জনসাধারণের নেতা মিরাবোঁ উত্তর করিলেন, "আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং আমাদিগকে এখান হইতে বাহির করিতে হইলে বলপ্রয়োগ ভিন্ন অন্য উপায় নাই।"

ষোড়শ-লুই-র ঘোষণা

ইতিমধ্যে অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর অনেকে সাধারণ প্রতিনিধিদের সহিত যোগদান করিলে রাষ্ট্রীয় পরিষদ প্রকৃত জাতীয় পরিষদের আকার ধারণ করিল। পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া ষোড়শ-লুই জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের দাবি স্বীকার করিয়া লইলেন। জনসাধারণের সর্বপ্রথম সাফল্য ঘটিল।

জনগণের প্রথম সাফল্য

সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া জনসাধারণ প্যারিস নগরীতে বিপ্লবাত্মক কার্যাদি শুরু করিল। দরিদ্র কৃষকগণ দলে দলে খাদ্যের সন্ধানে প্যারিস নগরীতে আসিতে লাগিল। চারিদিকে লুটপাট শুরু হইল এবং সৈন্যদের মধ্যেও এই বিপ্লব প্রভাব বিস্তার করিল। গ্রামাঞ্চলেও লুটপাট ও অরাজকতা ছড়াইয়া পড়িল। উত্তেজিত জনতা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই বিদ্রোহী হইয়া অত্যাচারী শাসনের প্রতীক বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করিল। বাস্তিল দুর্গের পতনকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সাফল্য বলিয়া জনসাধারণ মনে করিল।

প্যারিস নগরীতে বিপ্লবাত্মক কার্যাদি

বাস্তিল-দুর্গ ধ্বংস : জনতার জয়লাভ

বাস্তিল দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী জনসাধারণ প্যারিসের পৌরশাসনভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিল। নিজেদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া 'প্যারিস-কমিউন' নামে এক অস্থায়ী পৌর-পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিল। প্যারিস নগরীর শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীগণ ন্যাশনাল-গার্ড নামে এক জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করিল। লাফায়েৎ ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

প্যারিস-কমিউন ও ন্যাশনাল-গার্ড

বাস্তিল ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া সর্বত্র দেখা দিল। সর্বত্র কৃষকগণ সামন্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। প্রাণরক্ষার জন্য ভীত বহু জমিদার অন্যত্র পলায়ন করিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট সামন্ত ও যাজকগণ স্বেচ্ছায় নিজ নিজ অধিকার ত্যাগ করিল। এইভাবে একদিনের মধ্যেই ফ্রান্স হইতে সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ ঘটিল এবং সামাজিক বৈষম্যের স্থলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতিমধ্যে প্যারিসে বেকারত্ব ও খাদ্যাভাব দেখা দিল। খাদ্যাভাব চরমে পৌঁছিলে প্যারিসের কয়েক হাজার স্ত্রীলোক খাদ্য দাবি করিতে ভার্সাই নগরীর দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের চাপে পড়িয়া রাজা ও রানী প্যারিসে আসিতে বাধ্য হইলেন। এই ঘটনাকে "রাজতন্ত্রের শব-যাত্রা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

বাস্তিল ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া

ইতিমধ্যে বিপ্লবের প্রসারকল্পে ফ্রান্সে বহু ক্লাব বা সংঘের উদ্ভব হইল। ইহারা বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করিয়া জনমত সৃষ্টি করিতে লাগিল। এইসব ক্লাবের মধ্যে জেকোবিন ক্লাব ও কর্ডেলিয়ার্স ক্লাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিপ্লবী ক্লাব বা সংঘ

অতঃপর জাতীয় পরিষদ ফ্রান্সের জন্য এক নূতন শাসনতন্ত্র গঠনে মনোনিবেশ করিল। ইহা ফরাসী সংবিধান সভা বা Constituent Assembly-তে পরিণত হইল।

জাতীয়-পরিষদ সংবিধান সভায় পরিণত

সংবিধান সভার কার্যাদি (Works of the Constituent Assembly):

সংবিধান সভা এক প্রস্তাব ঘোষণা করিল। ইহাতে বলা হইল (১) স্বাধীনতা লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মানুষমাত্রই সম অধিকারের অধিকারী, এবং (২) আইন জনসাধারণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি এবং আইনের দৃষ্টিতে সকল ব্যক্তিই সমান।

মানবাধিকার ঘোষণা

(১) শাসনতন্ত্র—সংবিধান পরিষদ রচিত শাসনতন্ত্র অনুসারে (১) ফ্রান্স রাজা ও একটি পার্লামেণ্ট দ্বারা শাসিত হইবে এবং এই পার্লামেণ্ট আইন-পরিষদ (Legislative Assembly) নামে পরিচিত হইবে। (২) রাজা মন্ত্রিবর্গ নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাঁহারা আইন পরিষদের সদস্য হইবেন না। এইভাবে কার্যনির্বাহক (Executive) ও আইন-পরিষদকে পৃথক রাখা হইল, (৩) সামরিক ও

রাজা ও কার্য নির্বাহক পরিষদ

নৌ-বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাজার উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তিনি পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার অধিকারী থাকিবেন, কিন্তু তিনি আইন পরিষদের সম্মতি ভিন্ন কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন করিতে পারিবেন না, (৪) আইন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন রাজা বাতিল করিতে পারিবেন না, সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারিবেন মাত্র।

আইন পরিষদ
বিচার ব্যবস্থা

আইন রচনার সকল ক্ষমতা আইন পরিষদের উপর ন্যস্ত হইল। এই পরিষদের সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। ভোট দানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইল। বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করা হইল। উৎপীড়ন ও বিনা বিচারে কাহাকেও কারাদণ্ড প্রদান করার প্রথা রহিত হইল। নূতন কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বিচারালয় স্থাপিত হইল এবং জুরী প্রথার প্রবর্তন করা হইল।

বিভাগীয় শাসনব্যবস্থা

পূর্বতন প্রদেশগুলিকে বাতিল করিয়া তৎস্থলে সমআয়তন ও সমাধিকার বিশিষ্ট ৮৩টি ডিপার্টমেণ্টে ফ্রান্সকে বিভক্ত করা হইল। প্রতিটি ডিপার্টমেণ্টকে জেলা, ক্যাণ্টন ও কমিউনে বিভক্ত করা হইল। ডিপার্টমেণ্টের কার্যাদি নির্বাচিত একটি কাউন্সিলের উপর অর্পিত হইল। এইভাবে ফ্রান্সে স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করা হইল।

(২) অর্থনৈতিক সংস্কার : অতঃপর সংবিধান পরিষদ দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিল। অর্থসংস্থান হেতু চার্চের সকল ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং ইহার ফলে সাময়িকভাবে সরকারের আর্থিক দুরবস্থা দূর হইল।

(৩) চার্চের পুনর্গঠন—যাজক সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রাধীন করার উদ্দেশ্য 'সিভিল কনষ্টিট্যুশন অফ দি ক্লারজি' (Civil Constitution of the Clergy) ঘোষিত হইল। ইহার ফলে চার্চের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইল। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ডাওসেস্ (Dioces) স্থাপন করা হইল এবং চার্চ রাষ্ট্রের একটি বিভাগে পরিণত হইল।

রাজার পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা (২০শে জুন ১৭৯১) : ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মিরাবো-র মৃত্যুতে নিজেকে অসহায় মনে করিয়া ষোড়শ লুই গোপনে পলায়ন করিলেন কিন্তু ভেয়ারনেস নামক স্থানে ধরা পড়িলেন। পুনরায় বন্দী অবস্থায় তাঁহাকে প্যারিসে আনা হইল।

ব্যর্থতার ফলাফল

রাজার ব্যর্থ পলায়নের ফলে বুরবোঁ রাজবংশের সর্বনাশ আসন্ন হইল। রাজতন্ত্রের উপর জনসাধারণের আস্থা লোপ পাইল এবং এই সময় হইতে রোবেসপীয়ার ও দাঁতনের নেতৃত্বে এক সাধারণতন্ত্রী দলের উদ্ভব হইল।

আইন পরিষদ

(Legislative Assembly October 1, 1791 and—September 19, 1792)

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর আইন পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসিল। এই পরিষদে প্রধানতঃ চারিটি দল ছিল—যথা দক্ষিণপন্থী শাসনতান্ত্রিকদল, বামপন্থী জেকোবিন দল, বামপন্থী জিরণ্ডিষ্ট দল ও মধ্যপন্থী নিরপেক্ষ দল। শাসনতান্ত্রিক দল রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিল। জিরণ্ডিষ্ট দল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিল কিন্তু এই দল উগ্রপন্থী ছিল না। জেকোবিন বা মাউণ্টেন দল উগ্রপন্থী সাধারণতন্ত্রী ছিল।

পরিষদের বিভিন্ন দল

আইন পরিষদের কার্যাবলী ঃ (১) একটি আইন পাশ করিয়া বলা হইল যে, সকল ধর্মযাজককে 'সিভিল কনষ্টিট্যুশন' স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা তাহা করিবেনা তাহারা সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন অঞ্চলে অশান্তি ঘটিলে সেই অঞ্চল হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করা হইবে।

(২) অপর একটি আইন পাশ করিয়া বলা হইল যে ফ্রান্সের দেশত্যাগী ব্যক্তিগণকে (ইহারা 'ইমিগ্রি' নামে পরিচিত) নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এই আদেশ প্রতিপালিত না হইলে তাহারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

ষোড়শ লুই পরিষদের উভয় প্রস্তাব নাকচ করিলে রাজার বিরুদ্ধে দারুণ গণবিক্ষোভ দেখা দিল।

ফরাসী বিপ্লবের প্রতি ইওরোপের মনোভাব (Attitude of Europe to French Revolution) ঃ প্রথম হইতেই ফরাসী বিপ্লবের প্রতি ইওরোপীয় দেশগুলির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ইওরোপের উদারপন্থী চিন্তানায়কগণ ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে এক নূতন যুগের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডে ফক্স (Fox) বিপ্লবকে অভিনন্দিত করিয়া উহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোল্‌রিজ প্রমুখ কবিগণ স্বৈরাচারী বুরবোঁ রাজবংশের অবসানে এক নূতন আশার আলো দেখিয়াছিলেন। বিপ্লবের প্রারম্ভে পিট্ ইহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সেও নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হইবে ও দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইবে। কিন্তু বার্ক (যিনি আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের স্বাধীনতা সমর্থন করিয়াছিলেন), প্রথম হইতেই ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে বিপ্লবের

বিপ্লবের প্রতি ইংল্যাণ্ডের সহানুভূতি

ফলে ফ্রান্সে সামরিক স্বৈরতন্ত্র স্থাপিত হইবে এবং উহা সভ্যতার মূলভিত্তি বিনষ্ট করিবে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থও পরে ফরাসী বিপ্লবের নিন্দা করেন। ফরাসী বিপ্লবের ধ্বংসলীলা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ইংল্যাণ্ডবাসীদের অধিকাংশই বার্ক-এর অভিমত সমর্থন করে।

বিপ্লবের প্রকৃতি সম্পর্কে ইওরোপের ভ্রান্ত ধারণা

প্রকৃতপক্ষে প্রথম অবস্থায় ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্ব সম্পর্কে যথার্থ অনুধাবন করিতে পারে নাই। অনেকে ইহাকে ফ্রান্সের স্থানীয় ব্যাপার বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের বিপ্লবের দ্রুত প্রসার ও বিপ্লবী আদর্শের প্রচারকার্য ইওরোপীয় দেশগুলির মনে ভীতির সঞ্চার করিল। সমগ্র ইওরোপ সচেতন হইল এবং বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় যত্নবান হইল।

ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইওরোপঃ ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হইতে ইওরোপীয় সমস্যায় পরিণত হইল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। অপ্রস্তুতির জন্য ফ্রান্সের পরাজয় ঘটিল এবং ইহার ফলে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল।

ফ্রান্সের প্রথম পরাজয়

রাজাকে সাময়িকভাবে অপসারণ

প্রথম পরাজয় সংবাদের পরেই আইন পরিষদ ষোড়শ লুইকে রাজপদ হইতে সাময়িকভাবে অপসারণ করিল এবং এক নূতন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য 'ন্যাশনাল-কনভেনশন্' আহ্বান করিল। রাজার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স প্রকৃত প্রস্তাবে একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল। প্যারিসের কমিউন কয়েক হাজার রাজতন্ত্রী দেশদ্রোহীকে বন্দী করিল এবং কয়েক সহস্র লোকের প্রাণনাশ করিল। এই ঘটনা সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড September Massacre) নামে পরিচিত।

কনভেনশনের আভ্যন্তরীণ কার্যাদি

কনভেনশন ও ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাঃ আইন পরিষদের সময় উত্তীর্ণ হইলে ন্যাশনাল কনভেনশনের অধিবেশন শুরু হইল। এই বিপ্লবী সভার স্থায়িত্বকাল হইল ২১শে সেপ্টেম্বর ১৭৯২ হইতে ২৬শে অক্টোবর ১৭৯৫। এই সভায় দুইটি দল ছিল প্রধান —জিরণ্ডিষ্ট ও জেকোবিন। জিরণ্ডিষ্টগণ জেকোবিনগণের ন্যায় রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকামী ছিল কিন্তু উহাদের ন্যায় উগ্রপন্থী ছিল না। প্রথমেই কনভেনশন রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল। একটি আইন পাশ করিয়া দেশত্যাগীদের বিরুদ্ধে চির-নির্বাসন নীতি ঘোষণা করা হইল।

রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা : নূতন বর্ষপঞ্জী

ইহার পর নূতন বর্ষপঞ্জী ও মেট্রিক পদ্ধতির প্রচলন এবং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হইল। কনভেনশন বা জাতীয় সভার কার্যাবলীর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল আইনের দৃষ্টিতে জনসাধারণের সমতা স্থাপন করার প্রচেষ্টা।

অতঃপর পদচ্যুত রাজা ষোড়শ লুই সম্পর্কে এক বিচারের প্রহসন করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল (২১শে জানুয়ারী, ১৭৯৩ খৃঃ)। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। জিরণ্ডিষ্টদের পতনের পর ফ্রান্সে জেকোবিনদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ম্যারাট, রোবেসপীয়ার ও দাঁতন (Danton)-এর নেতৃত্বে 'সন্ত্রাস শাসন' (Reign of Terror) শুরু হইল। জেকোবিনদল জন-নিরাপত্তা কমিটি গঠন করিয়া হাজার হাজার ফরাসী নর-নারীকে সন্দেহের বশে বিনা বিচারে গিলোটিন নামক একপ্রকার শিরচ্ছেদন যন্ত্রের দ্বারা হত্যা করিল। ষোড়শ লুই-এর রাণী এ্যাণ্টোয়েনেটকেও অতি জঘন্য মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া গিলোটিনে হত্যা করা হইল (১৬ই অক্টোবর ১৭৯৩ খৃঃ)। ইহার পনেরো দিন পরে একুশজন মধ্যপন্থী জিরণ্ডিষ্ট নেতাকে গিলোটিনে হত্যা করা হইল। রক্তের স্রোতে দেশ প্লাবিত হইল। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কনভেনশন বা জাতীয় সভা পাঁচজন পরিচালকের হস্তে দেশের শাসনভার ন্যস্ত করিল। এই পরিচালকগণ ফ্রান্সের ইতিহাসে 'ডাইরেক্টর' (Director) নামে পরিচিত।

ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্ব

ডাইরেক্টরী শাসন প্রবর্তন

কনভেনশন ও বৈদেশিক যুদ্ধ: প্রাথমিক অবস্থায় বিপ্লবের প্রতি ইওরোপীয় দেশগুলি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল এবং ইহাকে অনেকে একটি স্থানীয় বিদ্রোহ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই বিপ্লবের ধ্বংসলীলা ও বিপ্লবী আদর্শের প্রসারে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের পর কনভেনশন ইওরোপের সর্বত্র রাজতন্ত্রের অবসান করিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপনের জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিল। সাম্য ও স্বাধীনতা বিরোধী শাসনতন্ত্রকে সর্বত্র জনসাধারণের শত্রু বলিয়া প্রচার করা হইতে লাগিল। এক কথায় ফ্রান্স রাজতন্ত্রশাসিত ইওরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্রান্সের পররাজ্যগ্রাস মনোভাব এবং সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী সর্বত্র রাজন্যবর্গকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিল। ইহার ফলে আত্মরক্ষা হেতু ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, সার্ডিনিয়া প্রভৃতি দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তিসংঘ গঠন করিল।

ইওরোপে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের প্রচার কার্য

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম রাষ্ট্রজোট

প্রথম অবস্থায় ফ্রান্স রাষ্ট্রজোটের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। বেলজিয়াম ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হইল। রাইন হইতে ফরাসী সৈন্য প্রাশিয়া কর্তৃক বিতাড়িত হইল। ইংল্যাণ্ড ডানকার্ক অবরোধ করিল এবং স্পেন পীরিনিজ অতিক্রম করিয়া রৌমিলন দখল করিল।

যুদ্ধের ঘটনাবলী

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহীদের আয়ত্তাধীন করিয়া অতঃপর ফ্রান্স বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিল। ইংল্যাণ্ড ডানকার্কের অবরোধ উঠাইয়া লইল,

অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইয়া বেলজিয়াম ফ্রান্সের হস্তে প্রত্যর্পণ করিল; প্রাশিয়া ও স্পেন ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিল। সর্বত্র ফ্রান্সের সাফল্যের ফলে ইওরোপীয় শক্তিসংঘ ভাঙ্গিয়া গেল। একমাত্র ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল। ফ্রান্সের সন্ত্রাস শাসনকালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট টুলোঁ নামক ফরাসী বন্দর হইতে ইংরাজ বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া দেশকে এক দারুণ বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ডাইরেক্টরী নামে এক নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইল।

বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত হইল

নেপোলিয়নের উত্থান (Rise of Napoleon)

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কর্সিকা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপের এজাকৃচো নামক স্থানে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল কার্লো বোনাপার্ট ও মাতার নাম লেটিজিয়া বোনাপার্ট। যৌবনে তিনি ব্রিয়েন ও প্যারিস-এর সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ভলটেয়ার, রুশো, মন্টেস্কু প্রভৃতি দার্শনিকদের আদর্শ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বিদ্যার্জনে তাঁহার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তিনি প্লুটার্ক, প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকদের রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন এবং ইংল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, স্পার্টা প্রভৃতি দেশের ইতিহাস সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করেন। ফরাসী নাগরিক হিসাবে তিনি ফ্রান্সের জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন।

নেপোলিয়নের প্রথম জীবন

নেপোলিয়ন ছিলেন জেকোবিন দলের সমর্থক। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বাহিনী টুলোঁ বন্দর অবরোধ করিলে তিনি বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া টুলোঁ রক্ষা করেন। তাঁহার সামরিক জীবনের ইহাই হইল প্রথম সাফল্য। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জনতা কর্তৃক জাতীয়-সভা আক্রান্ত হইলে নেপোলিয়ন উহা রক্ষা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।

নেপোলিয়নের প্রথম সামরিক কৃতিত্ব

অতঃপর ডাইরেক্টরী কর্তৃক নেপোলিয়ন ইটালী অভিযানে প্রেরিত হইলেন। ইটালী অভিযানকে নেপোলিয়নের ভবিষ্যৎ সামরিক ও কূটনৈতিক খ্যাতির প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে। ডাইরেক্টরীর এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপীয় রাষ্ট্রসংঘের অবশিষ্ট শক্তিগুলি অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়াকে পরাজিত করা। সেই সময় ফ্রান্স জলপথে ইংরাজ নৌশক্তি দ্বারা আক্রান্ত। উত্তর-পূর্ব সীমানা ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার যুগ্ম-বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার দিকে অষ্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়ার যুগ্ম-বাহিনী দ্রুত ধাবমান। প্রথমেই নেপোলিয়ন সার্ডিনিয়া আক্রমণ করিয়া সার্ডিনিয়াকে শান্তি স্থাপন করিতে বাধ্য করিলেন।

নেপোলিয়নের প্রথম ইটালী অভিযান

সার্ডিনিয়া আক্রমণ

অষ্ট্রিয়া আক্রমণ

ইহার পর তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং সসৈন্যে মিলান-এ প্রবেশ করিলেন। লোম্বার্ডি হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করা হইল এবং ভেনিস নেপোলিয়ন কর্তৃক অধিকৃত হইল।

পোপের রাজ্য আক্রমণ

অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করিয়া নেপোলিয়ন পোপের রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি পোপকে সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে পোপ নিরপেক্ষ থাকিতে এবং ইটালীতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন।

ক্যাম্পোফরমিও সন্ধির গুরুত্ব

ইহার পর নেপোলিয়ন পুনরায় অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিয়া ভিয়েনা অবরোধ করিলেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন (Campoformio Treaty 1797)। এই সন্ধির ফলে ইটালীতে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ফ্রান্সের স্বাভাবিক সীমানা সুরক্ষিত হইল; ভবিষ্যতে মিশর আক্রমণের পথ সুগম হইল এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম রাষ্ট্রসংঘের অবসান ঘটিল। অপরদিকে নেপোলিয়নের নির্ভীকতা, সামরিক জ্ঞান ও কূটনৈতিক চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া গেল।* সামরিক কৃতিত্বের ফলে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল।

মিশর অভিযানের উদ্দেশ্য

এখন ফ্রান্সের একমাত্র শত্রু রহিল ইংল্যাণ্ড। অতঃপর নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরী কর্তৃক ইংল্যাণ্ড অভিযানে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু সরাসরি ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করার অসুবিধা থাকায় নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করিলেন। মিশর অভিযানের পশ্চাতে নেপোলিয়নের অপর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে ইংরাজ শক্তির পতন সাধন করা এবং তুরস্ককে পরাজিত করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত এশিয়া মাইনর ও বল্কান অঞ্চল দখল করা। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন মিশর অভিযানে বাহির হইলেন।†

ব্রিটিশ নৌবহরের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া নেপোলিয়ন মিশরে উপস্থিত হইলেন তিনি বিখ্যাত পিরামিড যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মিশরে ফ্রান্সের প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন কিন্তু ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি নেলসন নীল নদের যুদ্ধে ফরাসী নৌবহর আক্রমণ করিয়া উহা বিধ্বস্ত করিলেন। নেপোলিয়ন কোনক্রমে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হইলেন।

---

* ইটালীতে অবস্থানকালীন নেপোলিয়ন অনুচরদের নিকট এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন, "Do you suppose that I am gaining my victories in Italy in order to advance the lawyers of the Directory? I am only at the beginning of my career."

† নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের সময় এক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক নীলনদের তীরে বিখ্যাত রোসেটা প্রস্তর (Rosetta Stone) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই প্রস্তরের সাহায্যেই প্রাচীন মিশরীয় ভাষার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়।

ডাইরেক্টরীর পতন: ইতিমধ্যে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া ডাইরেক্টরীর সদস্যদের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়াছিল। রাজতন্ত্রী এবং উগ্রপন্থীরা নানাভাবে ডাইরেক্টরীকে বিপদগ্রস্ত করার চেষ্টা করিতেছিল। ডাইরেক্টরীর পররাষ্ট্রনীতিও মোটেই জনপ্রিয় ছিল না। পুনরায় ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন করিল। নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরীর একজন সদস্য এ্যাবি সাইস্-এর সহযোগিতায় ডাইরেক্টরী ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং কন্সালেট (Consulate) নামে এক নূতন শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিলেন।

ডাইরেক্টরীর পদচ্যুতি ও নেপোলিয়ন কর্তৃক কন্সালেট স্থাপন—(১৭৯৯)

কন্সালেট ও নেপোলিয়নের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়: ডাইরেক্টরীর পতনের পর নূতন শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়োজন হইল। শীঘ্রই একটি শাসনতন্ত্র রচিত হইল। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে (১) দশ বৎসরের জন্য সেনেট কর্তৃক নির্বাচিত তিনজন কন্সাল-এর হস্তে শাসনভার প্রদান করা হইল। ইহাদের মধ্যে প্রথম কন্সাল হইলেন নেপোলিয়ন। তাঁহার হস্তে যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন, মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত নিয়োগ প্রভৃতি সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হইল। (২) আইন সভাকে ভাঙ্গিয়া চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হইল। প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হইলেন এবং ভবিষ্যতে নিজেকে সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত করার সুযোগ পাইলেন।

কন্সালেট-এর শাসনতন্ত্র

প্রথম কন্সাল হিসাবে নেপোলিয়নের প্রথম সমস্যা হইল (১) ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গঠিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রসংঘকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং (২) নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে ইওরোপে যে সকল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল তাহার প্রতিবিধান করা। নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়া স্বয়ং ইটালীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ম্যারেংগো-র রণক্ষেত্রে (১৮০০ খৃঃ) তিনি অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া সমগ্র ইটালী পুনরুদ্ধার করিলেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। ইহার পর একমাত্র ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল। কয়েক বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের সহিত এমিন্স-এর সন্ধি (Peace of Amiens) স্বাক্ষর করিল। এই সন্ধি অনুসারে ইংল্যাণ্ড সিংহল ও ত্রিনিদাদ ভিন্ন ফ্রান্সের যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করিল; (২) ফ্রান্স নেপলস্ ও পোপের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিল এবং উক্ত অঞ্চল হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণ করিল। এইভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রাষ্ট্রসংঘের অবসান ঘটিল।

পররাষ্ট্র-নীতি

নেপোলিয়নের অষ্ট্রিয়া অভিযান ও লুনিভাইল-এর সন্ধি—(১৮০০)

ইংল্যাণ্ডের সহিত এমিন্স-এর সন্ধি—(১৮০২)

শাসক হিসাবে নেপোলিয়ন (Napoleon as a Ruler): পররাষ্ট্রক্ষেত্রে

সাফল্য অর্জন করিয়া নেপোলিয়ন অতঃপর ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। সংস্কারের পশ্চাতে তাঁহার দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল—

উদ্দেশ্য

(১) বিপ্লব বিধ্বস্ত ফ্রান্সের শাসনযন্ত্রকে শক্তিশালী করা এবং (২) অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিপ্লবের মূলমন্ত্র 'সাম্য' প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করাই তাঁহার সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার: (১) ফ্রান্সের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হইল। দেশকে পূর্বেকার ৮৩টি ডিপার্টমেণ্ট বা প্রদেশে বিভক্ত রাখা হইল কিন্তু প্রিফেক্ট, সাব-প্রিফেক্ট, মেয়র প্রভৃতি কর্মচারীগণ নেপোলিয়ন কর্তৃক মনোনীত হইবার ব্যবস্থা হইল। বিচার বিভাগে কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া বিচারকগণকে পুনরায় প্রথম কন্সাল (নেপোলিয়ন) কর্তৃক নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত হইল বটে কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব করা হইল।

(২) দলীয় বিভিন্নতার অবসান করিয়া নেপোলিয়ন জাতির সকল সম্প্রদায়ের সহানুভূতি লাভে যত্নবান হইলেন। 'এমিগ্রি'-দের (Emigres) প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইল এবং সরকারী পদগুলি রাজতন্ত্রী ও জিরণ্ডিষ্টদের নিকট উন্মুক্ত করা হইল। অতীতের রাজনৈতিক মতবাদের জন্য নিপীড়ন করার নীতি পরিত্যক্ত হইল।

(৩) অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক-অফ-ফ্রান্স নামে এক ফরাসী জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণকে এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অর্থ সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হইল। ফরাসী মুদ্রানীতির সংস্কার সাধন করা হইল। বহুকাল পরে ফ্রান্সের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়া আসিল।

অর্থনৈতিক সংস্কার

(৪) জনহিতকর কার্যাদির প্রতিও নেপোলিয়নের আগ্রহ কম ছিল না। প্রাচীন সৌধগুলির সংস্কার সাধন ও প্যারিসে নূতন সৌধ নির্মাণ করা হইল। ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়াম ও আর্টগ্যালারী স্থাপিত হইল। বহু পুরাতন রাস্তার সংস্কার সাধন ও নূতন রাস্তা নির্মাণ করা হইল। ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি হইল।

জনহিতকর কার্যাবলী

(৫) নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হইল—ফ্রান্সের জন্য আইন-বিধি (Code Napoleon) প্রণয়ন করা। পূর্বে সকল শ্রেণীর প্রতি প্রযোজ্য কোন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন ছিল না। ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন আইনগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এক সাধারণ আইন সঙ্কলন করা হইল। আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তিমাত্রেরই সমতা স্বীকৃত হইল। কোড-নেপোলিয়নকে বিপ্লবের স্থায়ী ফল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আইন সংস্কার: 'কোড নেপোলিয়ন'

(৬) নেপোলিয়নের সম্মুখে সর্বাধিক জটিল সমস্যা ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চের সহিত আপোষরফা করা। ক্যাথলিক ধর্মের সহিত বিচ্যুতি হইবার ফলে জাতীয় জীবনে বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। নেপোলিয়ন বিশ্বাস করিতেন যে রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্ম অপরিহার্য এবং রাষ্ট্রের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ ফরাসীদের ক্যাথলিক ধর্মের সমর্থন একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন পোপের সহিত এক চুক্তিতে (Concordat—1801) আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তি অনুসারে ফরাসী সরকার ক্যাথলিক ধর্মকে ফ্রান্সের অধিকাংশ লোকের ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন।

ধর্ম সংস্কার

নেপোলিয়নের জীবনের তৃতীয় পর্যায়

নেপোলিয়ন ও ফরাসী সাম্রাজ্য (Napoleon and the French Empire—১৮০৪-১৮১৫)

নেপোলিয়ন এক সময় বলিয়াছিলেন; "আমি ফ্রান্সের রাজমুকুট ধূলায় লুণ্ঠিত দেখিয়া তরবারির সাহায্যে উহা উঠাইয়া লইয়াছি"*। নিম্নলিখিত উপায়ে তিনি নিজেকে সম্রাটপদে উন্নীত করিয়াছিলেন :—(১) তাঁহার গৌরবময় প্রথম ইটালীয় অভিযানের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে প্রথম কন্‌সাল নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে সর্বোচ্চ নির্বাহক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। (২) সংস্কারের মাধ্যমে তিনি বিপক্ষ দলগুলির সমর্থনলাভে সমর্থ হন। (৩) 'লিজিয়ন-অফ-অনার' নামক এক সম্মান প্রতীকের সৃষ্টি করায় তাঁহার উপর নির্ভরশীল এক নূতন অভিজাত সমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্যবাদের প্রথম সোপান। (৪) ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি যাবজ্জীবন কন্‌সাল নিযুক্ত হন। ইহা সম্রাটপদেরই পূর্বাভাষ বলা যাইতে পারে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সর্বময় ভাগ্যনিয়ন্তা হন। (৫) সর্বশেষে তাঁহার বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রের সুযোগ লইয়া নেপোলিয়ন ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রের মুখোস সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। গণভোটের দ্বারা তিনি সম্রাটপদ সমর্থন করেন।

সম্রাট-পদ লাভের পশ্চাতে কারণ সমূহ

১৮০৪ হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সের ইতিহাস হইল ফরাসী সাম্রাজ্যের অগ্রগতির ইতিহাস। এই সময়ের মধ্যে নেপোলিয়নের সহিত ইওরোপের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলিয়াছিল।

* "I found the crown of France lying on the ground and I picked it up with my sword."—Napoleon.

১৮০২ খৃষ্টাব্দে এ্যামিন্স-এর সন্ধি দ্বারা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রাষ্ট্রসংঘের অবসান ঘটিয়াছিল বটে কিন্তু সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পরিণতি দেখিয়া ইওরোপের রাষ্ট্রবর্গ উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। নেপোলিয়ন ইটালী, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রগুলিকে সাম্রাজ্যভুক্ত করিলে ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে তৃতীয় রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হয়।

নেপোলিয়নের যুদ্ধ-বিগ্রহ

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন

ইওরোপের সহিত নেপোলিয়নের পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। ট্রাফালগার-এর নৌযুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি নেল্‌সন ফরাসী নৌ-বাহিনী বিধ্বস্ত করিলেন (১৮০৫ খৃঃ)। নেপোলিয়ন উলম্‌ (Ulm)-এর যুদ্ধে আষ্ট্রিয়ার সেনাপতিকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন এবং অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনীকে অস্টারলিজ (Austerlitz)-এর যুদ্ধে পরাজিত করিলেন (১৮০৫ খৃঃ)। নেপোলিয়ন ইটালীর রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় রাষ্ট্রসংঘ ভাঙ্গিয়া গেল। জেনা-র যুদ্ধে প্রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়ন বার্লিনে উপস্থিত হইলেন। জার্মানীকে পুনর্গঠন করা হইল। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল এবং কতকগুলি পশ্চিম জার্মান রাষ্ট্রকে সম্মিলিত করিয়া নেপোলিয়নের অধীনে 'কনফেডারেশন অফ দি রাইন' (Confederation of the Rhine) নামে এক জার্মান রাষ্ট্র সংঘ স্থাপিত হইল। নেপোলিয়নের ভ্রাতা লুই বোনাপার্ট হল্যাণ্ডের রাজা হইলেন এবং পরে ভ্রাতা জোসেফ নেপলস্‌-এর অধিপতি হইলেন।

ট্রাফালগার-এর যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়

অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাফল্য

নেপোলিয়ন কর্তৃক জার্মানীর পুনর্গঠন

মধ্য ইওরোপে ফ্রান্সের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং ফ্রীডল্যাণ্ড-এর (Friedland) যুদ্ধে রাশিয়াকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিলেন। রুশ-জার প্রথম আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের সহিত টিলজিট-এর সন্ধি (১৮০৭ খৃঃ) স্বাক্ষর করিলেন।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাফল্য

টিলজিট-এর সন্ধি (১৮০৭ খৃঃ) নেপোলিয়নের ক্ষমতার চরম প্রকাশ বলিয়া বিবেচিত হয়। সমগ্র মধ্য-ইওরোপ নেপোলিয়নের অধিকারভুক্ত হয়। রাশিয়া ফ্রান্সের মিত্র শক্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং একমাত্র ইংল্যাণ্ড ব্যতীত নেপোলিয়নের আর কোন অপরাজিত শত্রু রহিল না। অতঃপর নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডকে পদানত করিতে উদ্যোগী হইলেন।

নেপোলিয়ন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় উপনীত

ট্রাফালগার-এর নৌযুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ায় নেপোলিয়ন পরোক্ষভাবে ইংল্যাণ্ডের উপর আঘাত হানিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি কন্টিনেন্টাল সিস্টেম (Continental System) নামে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে

ইংল্যাণ্ডের-বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ (১৮০৬)

অর্থনৈতিক অবরোধনীতি গ্রহণ করিলেন। 'বার্লিন-ডিক্রি' (Berlin Decree) নামক এক ঘোষণা দ্বারা তিনি ইওরোপের বন্দরগুলিতে ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদির প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলেন। নেপোলিয়নের এই নির্দেশের প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ড অর্ডারস-অফ-কাউন্সিল (Orders of Council) ঘোষণা করিয়া ফ্রান্স বা ফ্রান্সের অনুগত সকল রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিল। ইহার উত্তরে নেপোলিয়ন 'মিলান-ডিক্রি' (Milan Decree) দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে নিরপেক্ষ তথা যে কোন রাষ্ট্রের জাহাজ ইংল্যাণ্ডের বন্দরে প্রবেশ করার চেষ্টা করিলে তাহা ধৃত ও বাজেয়াপ্ত করা হইবে। বার্লিন ও মিলান-ডিক্রি একত্রে কন্টিন্যাণ্টাল সিস্টেম নামে অভিহিত হয়।

কিন্তু এই কন্টিন্যাণ্টাল সিস্টেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। সমুদ্রপথে ব্রিটিশ নৌবহরের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকায় ইংল্যাণ্ডের দ্রব্যাদি সর্বত্র রপ্তানি হইতে লাগিল। অপরপক্ষে ইওরোপের জন্য দ্রব্যাদি আমদানি করা অসম্ভব হইল। ফলে ইওরোপীয় দেশগুলি নেপোলিয়নের প্রতি রুষ্ট হইল। কন্টিন্যাণ্টাল সিস্টেম নেপোলিয়নের জীবনের অন্যতম ত্রুটি ও পতনের কারণ।

ফলাফল

কন্টিন্যাণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিতে গিয়া নেপোলিয়ন পর্তুগাল দখল করিলেন। অতঃপর তিনি স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের সুযোগ লইয়া স্বীয় ভ্রাতা জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। স্পেন-বাসী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ফলে পেনিনসুলার যুদ্ধ (Peninsular War—1808-13) শুরু হইল।

পেনিনসুলার যুদ্ধের সূত্রপাত (১৮০৮-১৩)

পেনিনসুলার যুদ্ধ ইওরোপের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করিল। এতদিন পর্যন্ত নেপোলিয়ন ইওরোপের রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করিয়া চলিতেছিলেন কিন্তু এখন ইওরোপের জনসাধারণ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইল। ইংল্যাণ্ড পর্তুগাল ও স্পেনকে সাহায্য করার জন্য আর্থার ওয়েলেসলীর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিল। ওয়েলেসলী টালাভেরা (১৮০৯ খৃঃ) ও সালামাঙ্কা (১৮১২ খৃঃ)-র যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীকে পরাস্ত করিল। পর্তুগাল ও স্পেন হইতে ফরাসীবাহিনী বিতাড়িত হইল। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। নেপোলিয়ন স্বয়ং অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ওয়াগ্রাম-এর যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভের ফলে অষ্ট্রিয়া স্কোনব্রান (Schon-brunn)-এর সন্ধি করিতে বাধ্য হইল (১৮০৯ খৃঃ)। অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সকে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কিছু অংশ ছাড়িয়া দিল এবং কন্টিন্যাণ্টাল সিস্টেম মানিয়া লইল। অষ্ট্রিয়া-রাজকুমারীর সহিত নেপোলিয়নের বিবাহ হইল।

ফ্রান্সের পরাজয়

অষ্ট্রিয়ার পরাজয়

অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু হইল।

এই যুদ্ধের কারণ হইল (১) টিলজিট-এর সন্ধি অনুযায়ী রুশ-জারকে তুরস্কের বিরুদ্ধে সাহায্যদান করার শর্ত ছিল। কিন্তু নেপোলিয়ন তাহা পালন করেন নাই। (২) পোল্যাণ্ডের মধ্য হইতে 'গ্র্যাণ্ড-ডাচি-অফ-ওয়ার্সো' নামে এক নূতন রাষ্ট্র নেপোলিয়ন কর্তৃক সৃষ্ট হইলে জার যারপর নাই রুষ্ট হন। (৩) কন্টিন্যাণ্টাল সিস্টেমের ফলে রাশিয়া অত্যন্ত অসুবিধাগ্রস্থ হইয়াছিল। সুতরাং জার ইহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে উভয় দেশের মাধ্য মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়।

রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ
যুদ্ধের কারণ

যাহা হউক, রাশিয়ার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন এক বিশাল বাহিনী লইয়া মস্কো অভিযানে যাত্রা করিলেন। রুশবাহিনী নেপোলিয়নের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান না করিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল। পশ্চাদপসরণের কালে উহারা 'পোড়ামাটি-নীতি' (Scorched earth policy) অবলম্বন করিয়া খাদ্যশস্য ও গ্রাম নগর প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া দিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বোরোডিলো নামক স্থানে রুশবাহিনীর সহিত নেপোলিয়নের তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নেপোলিয়ন মস্কো নগরী অধিকার করিলেন। কিন্তু রুশদের 'গরিলা' যুদ্ধনীতি ফরাসীবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে নেপোলিয়ন মস্কো ত্যাগের আদেশ দিলেন (অক্টোবর ১৯, ১৮১২ খৃঃ)।

নেপোলিয়নের মস্কো
অভিযান (১৮১২)

রাশিয়া হইতে ফিরিবার পথে দুর্জয় শীত, অনাহার ও কোসাক গরিলা বাহিনীর আক্রমণের ফলে নেপোলিয়নের সৈন্যদলের অধিকাংশই পথিমধ্যে প্রাণ হারাইল। মাত্র কুড়ি হাজার মৃতপ্রায় সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ন ইওরোপে ফিরিলেন।

ইতিমধ্যে প্রাশিয়ায় জাতীয় উভ্যুত্থান দেখা দিল। সর্বত্র জাতীয় জাগরণ শুরু হইল। নেপোলিয়নের জার্মান সেনাপতি ইয়র্ক এবং জার আলেকজাণ্ডার এক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়া সমগ্র ইওরোপকে নেপোলিয়নের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করিতে উদ্যোগী হইলেন। প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সমগ্র জার্মান জাতীকে যুদ্ধের আহ্বান জানাইলেন। প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতা সমগ্র ইওরোপে এক আশার সঞ্চার করিল। ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন ও অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চতুর্থ রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন করিল (১৮১৩ খৃঃ)। লিপজিগের রণক্ষেত্রে নেপোলিয়ন সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর নিকট পরাজিত হইলেন। পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িল। চতুর্দিকে পরাধীন রাষ্ট্রগুলি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। মিত্রবাহিনী প্যারিস নগরী দখল করিল। ফরাসী সেনেট ও আইন-সভা নেপোলিয়নের পদত্যাগের

মুক্তি সংগ্রাম

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চতুর্থ
রাষ্ট্রসংঘ (১৮১৩)

লিপজিগের যুদ্ধ ও
নেপোলিয়নের পরাজয়
(১৮১৩)

দাবি করিল। এই অবস্থায় নির্বান্ধব, পরাজিত ও আশ্রয়হীন নেপোলিয়ন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল সিংহাসন ত্যাগ করিয়া এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত হইলেন।

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন ওয়াটর্লুর যুদ্ধ ও দ্বিতীয়বার নির্বাসন—(১৮১৫)

কয়েকমাস পরে (১৮১৫ খৃঃ) নেপোলিয়ন পুনরায় ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিয়া সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিলেন। পুনরায় সংঘবদ্ধ ইওরোপের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটালুর যুদ্ধে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নিকট পরাজিত হইলেন। দক্ষিণ আতলান্তিকে অবস্থিত সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে তিনি নির্বাসিত হইলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নেপোলিয়নের পতনের কারণ (Causes of Napoleon's Downfall)

(১) উচ্চাভিলাষ

নেপোলিয়নের পতনের কারণগুলি ছিল—প্রথমতঃ, অস্ত্রের সাহায্যে একের পর এক রাজ্য জয় করার ফলে তাঁহার উচ্চাভিলাষ ও আত্মবিশ্বাস এমনি জন্মিয়াছিল যে তিনি শেষ জীবনে কূটনৈতিক বুদ্ধি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি কখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে তাঁহার একার পক্ষে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য শাসন করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল দুর্বল। অস্ত্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের জনগণের বিরোধিতা ও ফরাসী শাসনের প্রতি ঘৃণা নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ। সম্রাট ও সাম্রাজ্যের প্রতি বিজিত রাজ্যের জনগণের আনুগত্যের একান্ত অভাব সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, স্পেনের সহিত উপদ্বীপের যুদ্ধে, পোপের সহিত বিবাদ এবং মস্কো অভিযান নেপোলিয়নের পতন অনিবার্য করিয়াছিল। স্পেনীয় যুদ্ধে নেপোলিয়নের সামরিক ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা দিয়াছিল প্রাশিয়ার নবজাগরণ ও মুক্তিসংগ্রাম। পোপের সহিত বিবাদের ফলে ইওরোপের ক্যাথলিক সম্প্রদায় নেপোলিয়নের প্রতি বিদিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রুশ অভিযানের ব্যর্থতা নেপোলিয়নের সামরিক শক্তি ও তাঁহার মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। চতুর্থতঃ, 'মহাদেশীয় ব্যবস্থা' (Continental System) নেপোলিয়নের পতনের অপর প্রধান কারণ। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ইওরোপের প্রতিটি রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল এবং ইওরোপের রাষ্ট্রবর্গ সংঘবদ্ধভাবে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার পতন অনিবার্য করিয়াছিল। পঞ্চমতঃ, ইংল্যাণ্ডের নৌ-শক্তি নেপোলিয়নের পতনের অপর কারণ। ইংল্যাণ্ডের সহিত নৌ-যুদ্ধে তিনি বরাবর পরাজিত হইয়াছিলেন এবং এই শক্তি তাঁহার মহাদেশীয় ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়াছিল।

(২) সাম্রাজ্যের দুর্বল ভিত্তি

(৩) স্পেন, পোপ ও রাশিয়া

(৪) মহাদেশীয় ব্যবস্থা

(৫) ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তি

নেপোলিয়নের প্রতিভা (Napoleon's genius)

(১) রাষ্ট্রবিদ হিসাবে নেপোলিয়ন : নেপোলিয়ন বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লববিধ্বস্ত ফ্রান্সে শান্তি ও জাতীয় ঐক্য আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি ফরাসীদের জাতীয় আশা আকাঙ্খা চরিতার্থ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি নিজেই মন্তব্য করিয়াছিলেন, "My policy consists in governing men as they wish to be governed"। ফরাসীদের সমরবাদ ও ইওরোপে প্রভুত্ব স্থাপন করার স্পৃহা তিনি চরিতার্থ করিয়াছিলেন। আইনের চক্ষে সকলের সমমর্যাদা স্থাপন করিয়া তিনি বিপ্লবের প্রধান নীতিকে কার্যকরী করিয়াছিলেন। বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ ফ্রান্স ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিবর্তে শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা চাহিয়াছিল। নেপোলিয়ন স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়াও শাসনযন্ত্রকে অধিকতর কার্যকরী ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

(২) শাসক হিসাবে নেপোলিয়ন : আভ্যন্তরীণ শাসন ও সংস্কারের মধ্যে নেপোলিয়নের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম, শাসনতন্ত্র, বিচার, শিক্ষা—সবই তাঁহার সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। দলীয় বিভেদ ও বিবাদের উর্ধ্বে থাকিয়া তিনি দেশের পুনর্গঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও ব্যাঙ্ক-অফ-ফ্রান্স স্থাপন করিয়া তিনি আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পোপের সহিত আপোষ মীমাংসা করিয়া তিনি ধর্মক্ষেত্রে শান্তি ও সংহতি আনিয়াছিলেন। সিভিল কোড বিধিবদ্ধ করিয়া আইনের চক্ষে সকলকে সমমর্যাদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্যও তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারী, ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং সামাজিক সংস্কারক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

(৩) সমর-নায়ক হিসাবে নেপোলিয়ন : রণকুশলতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে অধ্যয়নে তিনি গভীর আনন্দ পাইতেন। ("To him the art of war was a favourite study and pastime")। তিনি তাঁহার সৈনিকদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ছিলেন। সেনাবাহিনী গঠন ও সৈন্য পরিচালনার ব্যাপারে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর। তাঁহার ন্যায় ইওরোপের অপর কোন সমরনায়ক সেনাবাহিনীর শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথম নির্বাসনকালে একমাত্র সৈন্যগণই তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিল। তিনি বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে জয়লাভ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু কোথাও অনর্থক রক্তপাত বা বিজিতদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করেন নাই। সমর চাতুরীতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। অস্টারলিজ-এর যুদ্ধ তাঁহার সমর চাতুরীর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

(৪) কূটনৈতিক হিসাবে নেপোলিয়ন—কূটনীতির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। জার আলেকজাণ্ডার-এর সহিত টিলজিট-এর সন্ধি নেপোলিয়নের কূটনৈতিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

উপসংহার

নেপোলিয়নকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার ও সার্লেমান-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি ছিলেন সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁহার মানসিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্বের জন্য ইতিহাসে তাঁহাকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। রোজ (Rose) মন্তব্য করেন "তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব রুশোর আদর্শে অনুপ্রাণিত অথচ বিপ্লব বিধ্বস্ত ফ্রান্সকে পরিচালিত করিয়াছিল।" একথা স্বীকার্য যে একাধিক সাফল্য তাঁহাকে মোহগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিজয়গর্বে গর্বিত নেপোলিয়নের পররাজ্যগ্রাসী মনোভাব উৎকটরূপ ধারণ করিয়াছিল। অহমিকা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার গৌরব ফরাসী জাতির মনে সাড়া দিয়াছিল এবং তাঁহার গর্বে গর্বিত ফরাসী জাতি কোনরূপ আত্মোৎসর্গ করিতে কার্পণ্য করে নাই। কিন্তু তাঁহার উগ্র সমরবাদের জন্য ফরাসীজাতিকে দুর্দশাগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল। জীবনের শেষান্তে নেপোলিয়ন নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন, "Brute force has never attained anything durable."

নেপোলিয়নের ত্রুটি

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল (Results of the French Revolution): বিশ্বের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিপ্লবের মূল আদর্শ ছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। বুরবোঁ রাজতন্ত্রের শাসনকালে ফ্রান্সে ব্যক্তি স্বাধীনতা মোটেই ছিল না। রাজতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল অভিজাত ও যাজকগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল সুযোগ-সুবিধার একমাত্র অধিকারী ছিল। পোপের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াও চার্চ ছিল রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন। মধ্যবিত্ত এবং কৃষককুল সকল সুযোগ-সুবিধা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত ছিল। শ্রেণীগত বিরোধ ও বৈষম্য ছিল ফরাসীজাতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

ফ্রান্স: বিপ্লবী আদর্শের সাফল্য

পূর্বতন শাসনপদ্ধতির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ স্থায়ীভাবে স্থাপিত হইল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভোটাধিকার, সংবাদপত্রের অধিকার এবং সভা-সমিতির অধিকার স্বীকৃত হইল। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ফলে গণতান্ত্রিক নীতি ক্রমেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাজনৈতিক

অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিলুপ্ত হইলেও সাফ-প্রথার বিলুপ্তি ঘটিলে সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। আইনের চক্ষে সকলের সম মর্যাদা স্বীকৃত হইল। একই

সামাজিক

ধরণের আইন সর্বত্র গৃহীত হইল। রাজার ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি ও অভিজাতদের জমিদারীর বৃহদংশ যেভাবে বণ্টন করা হইয়াছিল তাহার ফলে এক স্বাধীন ও সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত ও কৃষক সমাজের উদ্ভব হইল। ধর্মের ক্ষেত্রেও বৈষম্য দূরীভূত হইল এবং সহিষ্ণুতা দেখা দিল। ধর্মের ব্যাপারে সকলে স্বাধীনতা লাভ করিল।

ধর্ম

বিপ্লবের বাণী স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ইওরোপের সর্বত্র এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। সেণ্ট পিটার্সবার্গ হইতে লণ্ডন পর্যন্ত বিপ্লবের বাণী ইওরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে অনুপ্রাণিত করিল এবং ভবিষ্যতের আশার সঞ্চার করিল। ফরাসী বিপ্লবীগণ ইওরোপের শৃঙ্খলাবদ্ধ জনসাধারণকে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান করার জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীনে আসিয়া ইওরোপের একাধিক রাষ্ট্রে বিশেষভাবে হল্যাণ্ড, নেপলস্, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতিতে শ্রেণীগত বৈষম্য ও সুযোগ-সুবিধার অবসান ঘটিল এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। সর্বত্র সামাজিক সমতা, আইন-সমতা এবং ধর্মসহিষ্ণুতা প্রসারলাভ করিল। সর্বত্র নেপোলিয়নের আইনগুলি জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং ফরাসী শাসন-ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইতে লাগিল। এক কথায় নেপোলিয়নের সংস্পর্শে আসার ফলেই ইওরোপের একাধিক রাষ্ট্রে মধ্যযুগের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অবসান হইয়া আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল।

ইওরোপে প্রভাব

শ্রেণীগত বৈষম্যের অবসান ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত

ইওরোপের ফরাসী বিপ্লবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। জাতীয়তাবাদের আদর্শ মধ্যযুগে সূচিত হইলেও, বস্তুতঃ ফরাসী বিপ্লবের ফলেই এই আদর্শ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রত্যেক দেশ ও জাতি উহাদের স্বতন্ত্র ইতিহাস, স্বতন্ত্র সভ্যতা ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্য সম্পর্কে ক্রমশঃ সজাগ হইয়া উঠিল। তাহারা প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করিয়া জনসাধারণের সমর্থিত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিল। ইটালীর রাজ্য গঠন এবং পোল্যাণ্ডের একাংশ লইয়া গ্র্যাণ্ড ডাচি অফ ওয়ার্সো গঠনের ফলে পোল ও ইটালীয়দের মধ্যে গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। নেপোলিয়ন কর্তৃক জার্মানীর রাষ্ট্রসংখ্যা ৩৫০ হইতে ৪০টিতে পরিণত করা হইলে জার্মানীর ভবিষ্যৎ ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইল। বল্কান অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলি তুর্কীর অত্যাচারমূলক শাসনের অবসান করিয়া জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে উদগ্রীব হইয়া উঠিল এবং অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন জাতিগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনে সচেষ্ট হইল।

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

(War of American Independence)

আমেরিকায় ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য : আমেরিকায় ইংল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত উপনিবেশের সংখ্যা ছিল ১৩। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উপায়ে এই উপনিবেশগুলি অধিকৃত হওয়ার ফলে উহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলি যেমন ভার্জিনিয়া, ক্যারোলিনাস ও জর্জিয়া—তামাক ও তুলার চাষের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল এবং ক্রীতদাসের সাহায্যেই চাষের কাজ করান হইত। উত্তরাঞ্চলের উপনিবেশগুলি যেমন কনেকটিকাট (Connecticut), রোড-দ্বীপ (Rhode Island), নিউ হেম্‌সপিয়ার এবং ম্যাসাচুসেটস (Massachusetts) ইংল্যাণ্ডের পিউরিটানগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের প্রথম জেমস ও প্রথম চার্লস্-এর স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করিতে না পারিয়া এবং ধর্ম-সংক্রান্ত অত্যাচারের ফলে পিউরিটানগণ দলে দলে আমেরিকায় আগমন করিয়া উক্ত উপনিবেশগুলি স্থাপন করিয়াছিল। এই অঞ্চলের ঔপনিবেশিকগণ ছিল পরিশ্রমী, কৃষিজীবী ও শিক্ষিত। মধ্যাঞ্চলের উপনিবেশগুলি প্রথমে ওলন্দাজদের অধিকারভুক্ত ছিল। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময় এইগুলি ইংল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত হয়। এই অঞ্চলের উপনিবেশগুলির মধ্যে ম্যারিল্যাণ্ড (Maryland) উল্লেখযোগ্য। পেনসিলভানিয়া (Pennsylvania) নামক উপনিবেশটি ইংল্যাণ্ডের কোয়েকার (Quakers) নামক পিউরিটান সম্প্রদায়ের এক শাখা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ইহারা হিংসা ও যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিল।

বিদ্রোহের পূর্বে উপনিবেশগুলির অবস্থা

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে স্টুয়ার্ট রাজবংশ পুনঃস্থাপিত হইবার পর আমেরিকায় পুনরায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটিতে থাকে। উত্তরাঞ্চলের উপনিবেশগুলি এবং ম্যারিল্যাণ্ড উপনিবেশটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে হল্যাণ্ড ও সুইডেনের কতকগুলি উপনিবেশ ছিল। ইহাদের মধ্যে নূতন আমস্টারডম (New Amsterdam) নামক শহরটি উল্লেখযোগ্য। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজদের নিকট হইতে এই উপনিবেশগুলি ইংল্যাণ্ডের অধিকারে আসে। ইহার ফলে মেইন (Maine) হইতে ক্যারোলিনা পর্যন্ত সমগ্র উপকূলভূমি ইংল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত হয়। ইহার দক্ষিণদিকে কতকগুলি স্পেনীয় উপনিবেশ ছিল এবং ফ্লোরিডা উহাদের কেন্দ্র ছিল। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড হইতে আগত কয়েকজন বিশ্বপ্রেমিক (philanthropists) সাভানা (Savannah) নামে একটি শহরকে কেন্দ্র করিয়া জর্জিয়া নামক উপনিবেশটির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে টাইরল-এর বহু প্রটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী জর্জিয়ায় বসবাস শুরু করে এবং পেনসিলভানিয়ায় বহু সমৃদ্ধ জার্মান কৃষিজীবীর আগমন শুরু হয়।

এইভাবে আমেরিকায় ইংল্যাণ্ডের ১৩টি উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা হয়। বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক উপনিবেশগুলির উৎপত্তি হওয়ার ফলে উহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সম্ভাবনা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একরকম অসম্ভবই ছিল। ইহার উপর জলবায়ুর বিভিন্নতাও ছিল ঐক্য বন্ধনের পথে অন্তরায়। মেইন ও ডিক্সন লাইনের উত্তরাঞ্চলের উপনিবেশে ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে স্বাধীন ইওরোপীয় কৃষকদের সাহায্যে চাষ-আবাদ করা হইত, আবার কোথাও দক্ষিণ জার্মানীর অনুকরণে উহা করা হইত। উত্তরাঞ্চলের স্বতন্ত্র পরিবেশের প্রভাব সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। প্রভু ও ভৃত্য একত্রে চাষবাসে অংশ গ্রহণ করিত এবং ইহার ফলে সমাজে বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য স্থাপিত হয়। ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত শ্রেণী বৈষম্য এই অঞ্চলে প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। সামাজিক সমতার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তাধারা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে এবং ঔপনিবেশিকদের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের হস্তক্ষেপ ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতে থাকে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপনিবেশগুলির মধ্যে বৈষম্য

কিন্তু ম্যাসন ও ডিক্সন লাইনের দক্ষিণাঞ্চলে এই অবস্থার ব্যতিক্রম দেখা যায়। দক্ষিণাঞ্চলের উষ্ণ জলবায়ু কার্পাস চাষের উপযোগী ছিল। জমির শ্বেতকায় মালিকগণ কার্পাস চাষের উদ্দেশ্যে অগণিত নিগ্রো ক্রীতদাস নিয়োগ করিত। ভার্জিনিয়া মেরিল্যাণ্ড ও ক্যারোলিনা—নিগ্রো-ক্রীতদাস ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল।

উৎপত্তি ও জলবায়ুর বিভিন্নতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলির মধ্যে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তিনটি বিষয়ে উহাদের মধ্যে ঐক্য ছিল। প্রথমতঃ, রেড্-ইণ্ডিয়ান (Red Indians) নামক এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের সমান মনোভাব। এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের বিপদ আশঙ্কা অপেক্ষা ঘৃণার ভাবই ছিল বেশী।

বহুবিধ বিভিন্নতা সত্ত্বেও উপনিবেশগুলির মধ্যে মৌলিক ঐক্য

দ্বিতীয়তঃ, ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে ফরাসী আধিপত্যের আশঙ্কা প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল। ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের ন্যায় আমেরিকায় ব্যাপকভাবে উপনিবেশ স্থাপন করে নাই বটে কিন্তু উপনিবেশগুলির উপর ফ্রান্সের আক্রমণের সম্ভাবনা ঔপনিবেশিকগণকে সর্বদাই উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিত। একমাত্র কানাডার ফরাসী ঔপনিবেশিকদের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাহা হউক সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর আমেরিকায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, উপনিবেশগুলির উপর ইংল্যাণ্ডের রাজা ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রভুত্বের দাবি ঔপনিবেশিকগণ স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। উপরন্তু ব্রিটিশ বণিক ও শিল্পপতিগণ কর্তৃক প্রভাবিত পার্লামেণ্টের ঔপনিবেশিক-নীতি উপনিবেশবাসীগণকে ইংরাজ-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং আমেরিকা হইতে ফরাসীভীতি দূর হইলে পর ঔপনিবেশিকগণের সহিত মাতৃভূমির সংগ্রামের সূত্রপাত হয়।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকা (The background of the American War of Independence)

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং পশ্চিম ইওরোপে প্রচলিত ঔপনিবেশিক শাসন-নীতির ফল হইল আমেরিকার বিপ্লব। বিপ্লবের মূল কারণ হইল ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতি এবং আমেরিকাবাসীদের উগ্র জাতীয়তাবোধ ও স্বাতন্ত্র্যের দাবি।

ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতি

সেই সময় উপনিবেশগুলিকে মাতৃভূমির অংশরূপে মাতৃভূমির স্বার্থসিদ্ধির স্থল বলিয়া মনে করা হইত। ঔপনিবেশিকগণের সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষা মাতৃভূমির (অর্থাৎ যে দেশ হইতে ঔপনিবেশিকগণ আসিয়াছিল সেই দেশ) সুযোগ-সুবিধার জন্য ঔপনিবেশিকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করাই ছিল সেই সময়কার ঔপনিবেশিক নীতির মূল কথা। এইরূপ নীতির সমর্থনে ইংল্যাণ্ড ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে (রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে) নেভিগেশন আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিল। এই আইনের মূল বক্তব্য ছিল—(১) উপনিবেশগুলির তৈয়ারী সামগ্রী ইংল্যাণ্ডের জাহাজ ভিন্ন অন্য কোন দেশের জাহাজে রপ্তানি করা চলিবে না; (২) উপনিবেশগুলির কতকগুলি বিশেষ সামগ্রী একমাত্র ইংল্যাণ্ড ভিন্ন অন্য কোন দেশে রপ্তানি করা চলিবে না; (৩) উপনিবেশগুলিতে কার্পাসজাত সামগ্রী তৈয়ারী করা চলিবে না। কারণ ইহার দ্বারা ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল।

এই সকল আইনকানুন থাকা সত্ত্বেও উপনিবেশগুলির প্রতি ইংল্যাণ্ডের আচরণ মোটেই অনুদার ছিল না। স্পেন, ফ্রান্স ও পর্তুগাল অধিকৃত উপনিবেশগুলির অবস্থা আরও মন্দ ছিল। প্রতিটি ইংরাজ অধিকৃত উপনিবেশ ছিল স্বায়ত্তশাসিত। প্রতিটি উপনিবেশে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গভর্ণর নিযুক্ত থাকিলেও উহার আইনপরিষদ স্থানীয় আইন বিধিবদ্ধ করিত এবং গভর্ণরের বেতন মঞ্জুর করিত। বহুদিন ধরিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করিবার পর স্বাভাবিকভাবেই ঔপনিবেশিকগণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছিল। উপরন্তু ব্রিটেনের নৌশক্তি ঔপনিবেশিকগণের ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট সাহায্য করিত।

আমেরিকাবাসীদের দাবি

আমেরিকাবাসীদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষই যে বিপ্লবের অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমেরিকার ইংরাজ ঔপনিবেশিকগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভৃতি সকল ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার দাবি করিয়াছিল। উহাদের দাবিগুলি ছিল এইরূপ :—(১) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সমতুল্য ঔপনিবেশিক আইন-পরিষদগুলির অধিকারের দাবি, (২) ঔপনিবেশিক রাজস্ব ও শুল্ক নির্ধারণের দাবি, (৩) উপনিবেশগুলি রক্ষার জন্য সামরিক অধিকারের দাবি।

মাতৃভূমির প্রতি ঔপনিবেশিকগণের সহানুভূতি বা আনুগত্য মোটেই ছিল না। ইংল্যাণ্ড হইতে হাজার মাইলের দূরত্ব, যাতায়াতের অসুবিধা, এবং ঔপনিবেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব এবং রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতি কারণ ঔপনিবেশিকগণকে ইংল্যাণ্ড-বিরোধী ও স্বাধীনতাকামী করিয়া তুলিয়াছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময় মাতৃভূমির প্রতি ঔপনিবেশিকদের ঔদাসীন্য মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

ঔপনিবেশিকদের ইংল্যাণ্ড-বিরোধী মনোভাব

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে কানাডা ইংল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত হইলে আমেরিকাস্থ ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের বিরাট মানসিক পরিবর্তন ঘটে। ফরাসী আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হইলে পর ঔপনিবেশিকগণ ইংল্যাণ্ডের আনুগত্য ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হয়।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা স্পৃহা

১৬৬০ খৃষ্টাব্দের নেভিগেশন আইন ঔপনিবেশিকদের মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। অতঃপর ইংরাজ সরকার উহাদের উপর কর স্থাপনের চেষ্টা করিলে উপনিবেশগুলির সহিত ইংল্যাণ্ডের প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সূচনা হইল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্রেনভিল ভবিষ্যতে ফরাসী আক্রমণ হইতে উপনিবেশগুলিকে রক্ষা করার জন্য তথায় ১০ হাজার সৈন্য মোতায়েন করিতে মনস্থ করিলেন। এই সৈন্যের মোট ব্যয়ের কিছু অংশ তিনি ঔপনিবেশিকদের উপর কর স্থাপন করিয়া আদায় করার নীতি ঘোষণা করেন। এতদ্ভিন্ন সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই কারণে লর্ড গ্রেনভিল ঔপনিবেশিকদের উপর স্ট্যাম্প-কর (Stamp-Duty) নামে এক কর স্থাপন করিলেন (১৭৬৫ খৃঃ)।

ইংল্যাণ্ড ও ঔপনিবেশিকদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষের সূত্রপাত

ঔপনিবেশিকদের উপর স্ট্যাম্প-কর স্থাপন

এই কর স্থাপন করা হইলে ঔপনিবেশিকদের মনে এক দারুণ বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। তাহারা প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে তাহাদের কোন প্রতিনিধি নাই। সুতরাং তাহারা কর দানে বাধ্য নহে (No taxation without representation)।

ঔপনিবেশিকদের প্রতিবাদ

ঔপনিবেশিকদের প্রতিবাদ ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। গ্রেনভিল পদত্যাগ করিলেন এবং রকিংহাম প্রধানমন্ত্রী হইলেন। রকিংহাম স্ট্যাম্প-এ্যাক্ট বাতিল করিলেন বটে কিন্তু ইহাও ঘোষণা করিলেন যে উপনিবেশগুলির উপর কর ধার্যের অধিকার ইংল্যাণ্ডের রহিয়াছে। এই ঘোষণা ঔপনিবেশিকদের ইংল্যাণ্ড-বিরোধী মনোভাব আরও তীব্র করিল।

স্ট্যাম্প-এ্যাক্ট বাতিল : ইংরাজ সরকারের কর্তৃত্বের ঘোষণা

আমেরিকার নানা স্থানে ইতস্ততঃ গোলমাল ও হত্যাকাণ্ড শুরু হইল। ইংরাজ সরকার ঔপনিবেশিকদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনে অধিকতর তৎপর হইলেন। উপনিবেশগুলিতে ইংরাজ সৈন্য মতায়েন করা হইল। ইংল্যাণ্ডের রাজস্বমন্ত্রী টাউনসেণ্ড আমেরিকায় আনীত চা, চিনি, কাঁচ ও কাগজের উপর কর স্থাপন করিলে বিক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পাইল।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ ঔপনিবেশিকগণকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে চা ভিন্ন অপর সকল জিনিসের উপর হইতে কর উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু ইহাতেও ঔপনিবেশিকগণ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। অবশেষে বোস্টন বন্দরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চা-বোঝাই করা একখানা জাহাজ আসিলে কয়েকজন ঔপনিবেশিক রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠিয়া চায়ের বাক্স জলে ফেলিয়া দিল। ইংরাজ সরকার ঔপনিবেশিকগণকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে বোস্টন বন্দর বন্ধ করিয়া দিলেন; ম্যাসাচুসেটের স্বায়ত্তশাসন অধিকার বাতিল করিলেন এবং উপনিবেশগুলিতে সৈন্য মোতায়েন করিলেন। ইংরাজ সরকারের এই সকল বিধি-ব্যবস্থা ঔপনিবেশিকগণকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল।

বোস্টনে চায়ের বাক্স জলে নিক্ষেপ

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আমেরিকার তেরটি উপনিবেশের মধ্যে বারোটি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেলফিয়া শহরে এক অধিবেশনে সম্মিলিত হইলেন। এই অধিবেশনে ইংল্যাণ্ডের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য বন্ধ করিবার এবং ইংরাজ সরকারের নিকট এক অভিযোগ পত্র প্রেরণ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। ইতিমধ্যে ৮ই এপ্রিল (১৭৭৫ খৃঃ) রাত্রিকালে হ্যানকক্ (Hancock) ও স্যামুয়েল এ্যাডামস্ (Samuel Adams) নামক দুইজন আমেরিকার নেতাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ইংরাজ সেনাপতি গেগ্ (Gage) সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। এইচ. জি. ওয়েল্স-এর মতে "এই রাত্রি ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা"।* বোস্টন বন্দরের কিছু দূরে লেক্সিংটনে ইংরাজ সৈন্য গুলি চালাইলে বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠিল। সমগ্র আমেরিকায় যুদ্ধের প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চলিল। জর্জ ওয়াশিংটন ঔপনিবেশিকদের নেতৃপদে নির্বাচিত হইলেন।

প্রথম ফিলাডেলফিয়ার কংগ্রেস (১৭৭৪)

লেক্সিংটনের যুদ্ধ (১৭৭৫)

লেক্সিংটনের যুদ্ধ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করিল। প্রথম দিকে অবশ্য ঔপনিবেশিকগণের বহুবিধ অসুবিধা ছিল। তাহাদের কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না; মহাদেশের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থানের ফলে তাহাদের মধ্যে সংহতি স্থাপন করা কষ্টসাধ্য ছিল; সম্মুখ যুদ্ধে ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার মত

* "It was a quite typical instance of that silly 'firmness' which shatters empires."—Wells.

উপযুক্ত রণকৌশল বা যুদ্ধাস্ত্র তাহাদের ছিল না এবং তাহাদের সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত সৈন্যেরও অভাব ছিল। অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনীছিল সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত। সমুদ্রের উপর আধিপত্য থাকায় ইংরাজবাহিনীর পক্ষে বিক্ষিপ্তভাবে উপনিবেশগুলিকে আক্রমণ করা সহজ ছিল।

উভয় পক্ষের সুবিধা-অসুবিধা

লেক্সিংটনের যুদ্ধে ইংরাজবাহিনী পরাজিত হইল। কিন্তু বাংকারহিল-এর যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি উইলিয়াম হো ঔপনিবেশিকগণকে পরাজিত করিলেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হো জর্জ ওয়াশিংটন কর্তৃক পরাজিত হইয়া ম্যাসাচুসেট ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

বাংকারহিল-এর যুদ্ধ

যুদ্ধের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা। ৪ঠা জুলাই (১৭৭৬ খ্রীঃ) আমেরিকার কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। যুদ্ধ পুর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও স্পেন আমেরিকার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইংল্যাণ্ড-অধিকৃত জিব্রাল্টার ও মিনরকা দখল করিতে চেষ্টা করিল।* হল্যাণ্ডও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি কর্ণওয়ালিস নিউইয়র্ক শহরে আত্মসমর্পণ করিলে আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের জয়লাভ সম্পূর্ণ হইল।

আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা : ফ্রান্স ও স্পেনের ঔপনিবেশিকদের পক্ষাবলম্বন

লর্ড কর্ণওয়ালিসের আত্মসমর্পণ

ভার্সাই-এর সন্ধি (১৭৮৩): এই সন্ধি দ্বারা ইংল্যাণ্ড আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। (২) ইংরাজ অধিকৃত কানাডা ও আমেরিকার মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করা হইল। (৩) ফ্রান্স, ইংরাজ-অধিকৃত ফরাসী উপনিবেশ (টোবাগো, গবি, সেণ্টলুসিয়া ইত্যাদি) পুনরুদ্ধার করিল। (৪) স্পেন ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে ফ্লোরিডা ও মিনরকা ফিরিয়া পাইল।

ফলাফল (Results): (১) আমেরিকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের আংশিক ক্ষতি হইল। ইংল্যাণ্ড পূর্বতন ঔপনিবেশিক-নীতির ভ্রান্ততা উপলব্ধি করিয়া অতঃপর উপনিবেশগুলির প্রতি এক অধিকতর সহিষ্ণুতার নীতি (New Colonial Policy) অবলম্বন করিল।

ইংল্যাণ্ডের পূর্বতন ঔপনিবেশিকদের নীতি পরিত্যক্ত

---

* আমেরিকার যুদ্ধে ইওরোপীয় রাজ্যগুলির হস্তক্ষেপের কারণ: প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাব লইয়াই ফ্রান্স ও স্পেন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের এক বৃহদংশ লাভ করিয়াছিল। প্যারিস সন্ধি (১৭৬৩ খৃঃ) দ্বারা ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত কানাডা ইংল্যাণ্ড লাভ করিয়াছিল; ভারতেও ফরাসী উপনিবেশগুলির বেশীর ভাগই ইংল্যাণ্ডের দখলে আসিয়াছিল। স্পেনের নিকট হইতে ইংল্যাণ্ড ফ্লোরিডা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং সুযোগমত ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও স্পেনের অস্ত্রধারণ করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক প্রাধান্য ও নৌশক্তির প্রাবল্য রাশিয়া, সুইডেন, হল্যাণ্ড, প্রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রবর্গের ঈর্ষার কারণ ছিল। সুতরাং আমেরিকার যুদ্ধের সুযোগ লইয়া এই সকল রাষ্ট্রবর্গ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিয়াছিল; যদিও ইংল্যাণ্ডের সহিত ইহাদের প্রকাশ্য সংগ্রাম সংঘটিত হয় নাই।

(২) আমেরিকায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইওরোপীয় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এক দারুণ পরিবর্তন আনিল। পরবর্তীকালে মনরো-নীতি অবলম্বন করিয়া আমেরিকা ইওরোপীয় পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া থাকিলেও বিশ্ব রাজনীতিতে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিল।

বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকার প্রভাব

(৩) ফ্রান্সে এই যুদ্ধের ফলাফল গুরুতর হইয়াছিল। ফ্রান্সের ল্যাফায়েৎ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও ফরাসী সৈনিকগণ আমেরিকাবাসীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশে বুরবোঁ-শাসনের অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্থসাহায্য করায় ফরাসী রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে ফরাসী বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

ফ্রান্সে ফলাফল

(৪) স্পেন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করিয়া ফ্লোরিডা ও মিনরকা পুনরুদ্ধার করিয়াছিল বটে কিন্তু শীঘ্রই এই যুদ্ধের আদর্শ স্পেনীয় উপনিবেশগুলিতেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

স্পেনের লাভ ও ক্ষতি

(৫) এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া হল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক ক্ষতি হইয়াছিল।

(৬) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিরোধের সুযোগ লইয়া রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিন বল্কানে অবস্থিত ক্রিমিয়া দখল করিতে উদ্যোগী হন। সুতরাং পরোক্ষভাবে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ নিকট-প্রাচ্য সমস্যা প্রভাবিত করিয়াছিল।

আমেরিকাবাসীর সাফল্যের কারণ সমূহ

(Causes of the Success of the Americans)

আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের বহুবিধ কারণ ছিল :—

(১) যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে ঔপনিবেশিকদের জ্ঞান ইংরাজ অপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট ছিল।

(২) ইংরাজদের যুদ্ধ পরিচালনার অব্যবস্থা ঔপনিবেশিকগণকে সুযোগ দান করিয়াছিল।

(৩) এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্পেন ও ফ্রান্সের যোগদান ও অর্থ সাহায্য দান ঔপনিবেশিকগণের যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

(৪) ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রাশিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রবর্গের রাষ্ট্রজোটের প্রতিষ্ঠা ইংরাজদের অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

(৫) জর্জ ওয়াশিংটনের উপযুক্ত নেতৃত্ব আমেরিকাবাসীদের মনে গভীর দেশাত্ম-বোধ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

(৬) ইংল্যাণ্ড হইতে আমেরিকার দূরত্ব আমেরিকাবাসীদের পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল।

সংক্ষিপ্তসার

ফরাসী বিপ্লবের কারণ:—(১) রাজনৈতিক: অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ছিল এক পতনোন্মুখ দেশ। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, চতুর্দশ লুই-এর উত্তরাধিকারীদের অপদার্থতা, অভিজাতদের প্রাধান্য, রাজকর্মচারীদের ঔদ্ধত্য, দুর্নীতিগ্রস্ত বিচার-ব্যবস্থা, ব্যক্তি-স্বাধীনতার অভাব, প্রতিনিধিমূলক সভার অভাব, শূন্য রাজকোষ—প্রভৃতি কারণে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং রাজতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণ বিশ্বাস হারাইয়াছিল।

(২) সামাজিক: অভিজাত ও উচ্চ ধর্মযাজকগণ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন, উচ্চ ধর্মযাজকগণ কর্তৃক অধস্তন ধর্মযাজকদের উপর উৎপীড়ন, রাষ্ট্র ও অভিজাতগণ কর্তৃক কৃষক ও শ্রমশিল্পীদের উপর অত্যাচার, উন্নত ও সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় অধিকার ও সামাজিক মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষা—প্রভৃতি কারণে জনসাধারণ বিপ্লবমুখী হইয়া উঠিয়াছিল।

(৩) অর্থনৈতিক: সুবিধাভোগী শ্রেণীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কর্তৃক সমগ্র করভার বহন, কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থা প্রভৃতি কারণে বিপ্লব অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

(৪) দার্শনিকদের প্রভাব: প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি দার্শনিকদের তীব্র আক্রমণ এবং জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কে তাঁহাদের প্রচারকার্য জনসাধারণের মনে এক নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিল এবং তাহারা প্রচলিত শাসনব্যবস্থার স্থলে এক নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া হইয়াছিল।

(৫) বৈদেশিক প্রভাব: ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণের সাফল্য ফরাসী জনসাধারণের মন রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

(৬) স্টেট্‌স-জেনারেল সভার অধিবেশন: রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক কাঠামো যখন ভগ্নপ্রায় সেই সময় ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই জাতীয় সভা আহ্বান করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের সূচনা হইল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী জনসাধারণ অত্যাচারী শাসনের প্রতীক বাস্তিল দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হইল।

ফরাসী বিপ্লবের গতি: স্টেট্‌স-জেনারেল জাতীয়-পরিষদে পরিণত হইল। তৃতীয় শ্রেণীর জাতীয় পরিষদে সংখ্যার অনুপাতে ভোটগ্রহণের দাবী স্বীকৃত হইলে জনসাধারণের প্রথম সাফল্য ঘটিল। সাফল্যের প্রাবল্যে জনসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল এবং প্যারিস নগরীতে বিপ্লবাত্মক কার্যাদি শুরু হইল। সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিপ্লবের প্রভাব বিস্তার হইল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে উন্মত্ত জনতা বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করিল। বিপ্লবীগণ সর্বত্র কমিউন গঠন করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিতে উদ্যোগী হইল। বিপ্লবীদের শক্তি বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হইয়া বহু অভিজাত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজেদের অধিকার পরিত্যাগ করিল এবং অনেকে দেশত্যাগ করিল। প্যারিস নগরীতে খাদ্যাভাব দেখা দিলে অগণিত নরনারী ভার্সাই-এ গমন করিয়া রাজা ষোড়শ-লুই ও তাঁহার রাণীকে প্যারিসে বলপূর্বক লইয়া আসিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিল। ইহার দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে রাজা ষোড়শ-লুই দেশ হইতে পলায়ণ করার চেষ্টা করিয়া ধৃত হইলেন এবং তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইল। ইহার পর চলিল সন্ত্রাস শাসন (১৭৯৩-৯৪)। হাজার হাজার দেশদ্রোহীকে হত্যা করা হইল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ডাইরেক্টরী নামে এক নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইল। ডাইরেক্টরী শাসনের অক্ষমতার সুযোগ লইয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দেশের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট: ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। ইহার পর শুরু হইল তাঁহার অভিযান। প্রায় সমগ্র ইউরোপ নেপোলিয়নের পদানত

হইল। প্রথম দিকে তিনি ইওরোপের মুক্তিদাতা হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করিলেও তাঁহার স্বৈরাচারী কার্যকলাপে পর্তুগাল, স্পেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া আক্রমণের সময় হইতে তাঁহার পতন শুরু হইল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে এলবা দ্বীপে নির্বাসিত করা হইল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ফ্রান্সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন। সেই বৎসর ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে পুনরায় নির্বাসিত হইলেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল : (১) ফ্রান্সে :—পূর্বতন শাসনপদ্ধতির অবসান এবং স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী-আদর্শের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি স্বীকৃত হইল। ধর্মীয় ব্যাপারে সকলের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। (২) ইওরোপে :—ইওরোপের কয়েকটি দেশে শ্রেণীগত বৈষম্যের অবসান হইল এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। ইওরোপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব হইল।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ : আমেরিকা মহাদেশে ইংল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত উপনিবেশগুলির সংখ্যা ছিল ১৩। বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন উপায়ে এই উপনিবেশগুলি স্থাপিত হইয়াছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ : (১) ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতি ঔপনিবেশিকগণকে মাতৃভূমির বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। (২) ইংল্যাণ্ড হইতে দূরত্ব, ঔপনিবেশিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর ইংল্যাণ্ডের কর্তৃত্ব এবং রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক বৈষম্য ঔপনিবেশিকগণকে স্বাধীনতাকামী করিয়া তুলিতেছিল। (৩) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ফরাসী আক্রমণের ভীতি দূর হইলে ঔপনিবেশিকগণ ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। (৪) ঔপনিবেশিকদের উপর ইংল্যাণ্ড স্ট্যাম্প-কর ধার্য করিলে ঔপনিবেশিকগণ উহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। (৫) ঔপনিবেশিকদের উপর ইংল্যাণ্ডের কর্তৃত্বের কথা ঘোষিত হইলে ঔপনিবেশিকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল এবং তাহারা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ফলে ইংল্যাণ্ডের সহিত ঔপনিবেশিকদের যুদ্ধ সুরু হইল।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ভার্সাই-এর সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হইল এবং আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল।

প্রশ্নমালা

১। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি সংক্ষেপে লিখ।
Describe in short the causes of the French Revolution. উঃ ৫০-৫৮ পৃঃ দেখ

২। ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা কর।
Describe in short the results of the French Revolution. উঃ ৭৫-৭৬ পৃঃ দেখ

৩। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন ইতিহাস সংক্ষেপে লিখ।
Review in short the life history of Napoleon Bonapart. উঃ ৬৫-৭৩ পৃঃ দেখ

৪। নেপোলিয়নের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
Give an estimate of Napoleon's achievements. উঃ ৭৪-৭৫ পৃঃ দেখ

৫। কি কি কারণে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ?
What were the causes of the American War of Independence ? উঃ ৭৯-৮১ পৃঃ দেখ

৬। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল সংক্ষেপে লিখ।
Describe in short the results of the American War of Independence.
উঃ ৮১-৮৩ পৃঃ দেখ

৭। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপে মানসিক উৎকর্ষের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।
Give an account of the intellectual movement in Europe during the 18th century. উঃ ৩৩-৩৬ পৃঃ দেখ

৮। নেপোলিয়নের পতনের কারণ কি ?
What led to the downfall of Napoleon ? উঃ ৭৩ পৃঃ দেখ

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্প বিপ্লব

(Industrial Revolution)

শিল্প-বিপ্লবের অর্থ

শিল্প-বিপ্লবঃ মানুষের শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন প্রণালীর ক্ষেত্রে যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা শিল্প-বিপ্লব নামে পরিচিত।*

বিপ্লবের কারণ

শিল্প-বিপ্লব আকস্মিক ঘটনা নহে। বহু পূর্ব হইতেই ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। আমেরিকার আবিষ্কার এবং চীন ও ভারতের বাণিজ্য ইওরোপীয়দের নিকট উন্মুক্ত হইলে প্রচুর পরিমাণ কাঁচামালের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু তখনকার উৎপাদন প্রণালীর দ্বারা সদ্য আবিষ্কৃত কাঁচা মালগুলিকে অধিক পরিমাণে তৈয়ারী সামগ্রীতে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে তৈয়ারী সামগ্রী প্রস্তুতের চেষ্টা শুরু হইল।

আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে সোণা ও রূপা ইওরোপে আমদানি হইতে থাকিলে লেনদেনের ব্যাপারে মুদ্রার প্রচলন সহজ হইল। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার সম্ভব হইল।

ধাতুমুদ্রার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য মূলধনের অভাব দূর হইল। মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে ধনপতি বা পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব হইল।

সুতরাং ষোড়শ শতাব্দী হইতে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কৃত হইলে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে মূলধনের অভাব দূর হইলে নূতন ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ তৈয়ারী-সামগ্রী প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতে থাকে।

বয়নশিল্প

বস্ত্রশিল্পেই সর্বপ্রথম নূতন ধরনের যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জন কে 'ফ্লাই-শাটল'---অর্থাৎ দ্রুতগতিতে চালান যায়—এইরূপ এক ধরনের 'মাকু'—আবিষ্কার করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে হারগ্রীভ্‌ 'স্পীনিং-জেনি' আবিষ্কার করেন। ইহার দ্বারা বস্ত্রনির্মাণের পদ্ধতি অধিক দ্রুত হইল। আর্করাইট 'ওয়াটার-ফ্রেম' (১৭৬৯ খৃঃ) নামক একরূপ জল-চালিত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া হস্ত-চালনার পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্র-প্রস্তুত অধিকতর দ্রুত করিলেন। 'ওয়াটার-ফ্রেম' কারখানার ভিত্তি রচনা করিল বলা যাইতে পারে। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে কার্টরাইট 'পাওয়ার-লুম' নামক শক্তি-চালিত তাঁত আবিষ্কার করেন।

---

* "শিল্প-বিপ্লব—কথাটি কয়েকটি যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের সময়কে না বলিয়া কৃষি ও বাণিজ্যের পরিবর্তে কলকারখানা ও যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রচলনের সময়কেই বলা সমীচীন"—হেস্‌।

এইসকল আবিষ্কারের ফলে বয়নশিল্পে এক যুগান্তর ঘটিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব হইল।

বাষ্পশক্তি

বাষ্পশক্তির আবিষ্কার না হইলে হয়ত শিল্প-বিপ্লব অধিক দূর অগ্রসর হইতে পরিত না। বাষ্পশক্তি সম্পর্কে ধারণা পূর্বেই ছিল। কিন্তু ইহাকে কার্যকরী করার পদ্ধতি জানা ছিল না। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ডেনিস পেপিন নামক জনৈক ফরাসী সর্বপ্রথম বাষ্পচালিত এঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ইহার কতক উন্নতি করেন থোমাস-নিউকমেন (১৭০৪ খৃঃ)। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে জেমস্ ওয়াট বাষ্পচালিত এঞ্জিনের আরও উন্নতি সাধন করেন। ওয়াটের অন্যতম কৃতিত্ব হইল বাষ্পের সাহায্যে যন্ত্রপাতি চালাইবার কৌশলের আবিষ্কার। ইহার পর হইতে রেলগাড়ী, বাষ্পীয় পোত প্রভৃতিতে বাষ্পীয় শক্তির বহুল প্রচলন শুরু হইল।

ইস্পাতের প্রচলন

নূতন নূতন কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য প্রচুর পারিমাণে ইস্পাতের প্রয়োজন দেখা দিল। পূর্বে লৌহপিণ্ড গলাইবার জন্য প্রচুর কাঠের ব্যবহার হইত এবং ইহা ছিল শ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ। এই কারণে সাধারণতঃ ইস্পাতের দ্বারা কেবলমাত্র যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ার করা হইত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে জন্ স্মীটন লৌহ গলাইবার চুল্লী (Blast Furnace) অষ্কিকার করিলে লৌহ ও ইস্পাতের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আসিল। অতঃপর কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নির্মাণে ইস্পাতের চলন ব্যাপক হইল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে হামফ্রে ডেভি 'সেফ্‌টি-ল্যাম্প' (Safety Lamp) আবিষ্কার করিলে কয়লা খনির কাজ সহজ হইল। ইহার পর বৈদ্যুতিক শক্তি

বৈদ্যুতিক শক্তি

আবিষ্কৃত হইল। বৈদ্যুতিক শক্তি, উৎপাদন প্রণালীকে অধিকতর দ্রুত করিল।

ইংল্যাণ্ডে দ্রুত শিল্পোন্নতির কারণঃ শিল্প-বিপ্লবের সহিত ইংল্যাণ্ডের নাম বিশেষভাবে জড়িত। ১৭৪০ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বয়ন ও ধাতু শিল্প এবং ওয়াট নির্মিত বাষ্পীয় এঞ্জিন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্ত্র ও লৌহ নির্মিত যন্ত্রপাতির উন্নতি হইলেও প্রকৃতপক্ষে কলকারখানার উন্নতি এবং প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন উনবিংশ শতাব্দীতেই হইয়াছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডবাসী মেষচারণ ও বাণিজ্যের সহিত অধিক জড়িত ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই ইংল্যাণ্ডবাসী কোন না কোন শিল্প-কারখানার সহিত জড়িত হইয়া পড়ে। 'শিল্প-বিপ্লব'—সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে সংঘটিত হইয়াছিল বলিলে ইহাই বুঝায় যে শিল্পের প্রসারের জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তাহা সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডেই পাওয়া গিয়াছিল—যেমন মূলধন, শ্রমিক, শিল্প-কৌশল, বিভিন্ন উপকরণ, শিল্পজাত সামগ্রীর বিক্রয়ের জন্য বাজার ইত্যাদি।

কারখানা ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ, শ্রমিক নিয়োগ এবং কাঁচামল খরিদ—প্রভৃতি

ব্যাপারে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডে প্রচুর অর্থাগম হইতে থাকে। ইহা ছাড়া মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যাঙ্ক-অফ-ইংল্যাণ্ড যথেষ্ট সাহায্য করিত। ফলে অতি সহজেই ইংল্যাণ্ডে শিল্প-প্রসার সম্ভব হইয়াছিল।

মূলধন

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপ হইতে বহু শ্রমিক রোজগারের সন্ধানে ইংল্যাণ্ডে আগমন করে। ইহা ছাড়া কৃষির পরিবর্তে মেষচারণ শুরু হইলে বহু কৃষক বেকারে পরিণত হয়। ইহারা দলে দলে সহরে আসিয়া কারখানার শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হয়। সুতরাং শিল্প-কারখানার প্রসারের জন্য শ্রমিকের কোন অভাব ছিল না।

শ্রমিক

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যাণ্ডে শিল্প ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের পদ্ধতি উন্নত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প-কৌশল (Techniques) ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড সকলের অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছিল। শিল্পের প্রসার ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন লৌহ কয়লা ইত্যাদি—ইংল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণেই ছিল।

শিল্প-কৌশল ও শিল্প-উপকরণ

১৭০৭ ও ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সহিত যথাক্রমে স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের সংযুক্তি হইলে ইংল্যাণ্ডের বাজার প্রসারিত হইল। ইহা ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের বণিকগণ উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা ও পূর্বাঞ্চলের বহু অঞ্চলে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। উত্তর-আমেরিক ছিল ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত সামগ্রীর বৃহৎ বিক্রয় কেন্দ্র। ভারতেও ইংল্যাণ্ডের নির্মিত যন্ত্রপাতি ও কার্পাসজাত সামগ্রীর প্রচুর চাহিদা ছিল। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত সামগ্রীর জন্য উপযুক্ত বাজারের অভাব ছিল না।

বাজার বা বিক্রয় কেন্দ্র

ইংল্যাণ্ডে শিল্পের অগ্রগতি : ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ইংল্যাণ্ডে শিল্পের অগ্রগতি ব্যাপক হইয়া উঠিতে থাকে। বয়ন ও ইস্পাত উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কুটির-শিল্পের স্থলে বৃহদাকার কারখানা স্থাপিত হইতে থাকে। এমন কি জুতা ও আসবাবপত্র নির্মাণের ব্যাপারেও যন্ত্রের ব্যবহার চলিতে থাকে। যন্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধাস্ত্র প্রচুর পরিমাণে নির্মিত হইতে থাকে। নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে থাকে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে গ্যাসের উৎপাদন ও গ্যাসের ব্যবহার ব্যাপক হইয়া উঠিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রবার ও ফটোগ্রাফী শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে জাহাজ নির্মাণের ব্যাপারে কাঠের পরিবর্তে ইস্পাতের ব্যবহার শুরু হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেষ্ট গবেষণা চলিতে থাকে এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো ও কলকারখানার বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার শুরু হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ইংল্যাণ্ডে বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনের প্রচলন শুরু হয়। এই সময়ের মধ্যে জলযানের

বিশেষ উন্নতি না হইলেও ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে দুইটি বাষ্প-চালিত জাহাজ আতলান্তিক অতিক্রম করে।

প্রথমদিকে ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতিগণ ছিলেন দরিদ্র যেমন কার্টরাইট ও ওয়াট। তাঁহারা নিজেদের সামান্য অর্থ ও অধ্যবসায়ের দ্বারা ক্ষুদ্রাকার কারখানা নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া বহু ধনী ব্যবসায়ীগণ এই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থের যোগান দিয়া এইগুলিকে বৃহদাকার করিয়া তোলেন। এইভাবে ইংল্যাণ্ডে যৌথ কারবারের উৎপত্তি হয়। পুঁজিপতিগণ শিল্প-বিশেষজ্ঞ ও শ্রমিকগণকে নিযুক্ত করিয়া বড় বড় কারখানা গড়িয়া তোলে। এইভাবে ইংল্যাণ্ডে ধনতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়। শিল্পের উন্নতি ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমৃদ্ধিও অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ইংল্যাণ্ডে যৌথ কারবারের উৎপত্তি

ইওরোপে শিল্প-বিপ্লবের প্রসার: ইওরোপের সহিত ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য সম্পর্ক থাকায় ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লব ইওরোপেও প্রসারলাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আর্ক-রাইট নির্মিত যন্ত্র ফ্রান্স ও নেদারল্যাণ্ডে প্রবর্তিত হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-শিল্পী উইলিয়াম ককরিল বেলজিয়ামে সূতার কল স্থাপন করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ইওরোপে যন্ত্র নির্মাণের কাজ দ্রুত হইতে থাকে। ইংরাজ পুঁজিপতি ও ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে বেলজিয়ামে বড় বড় কারখানা স্থাপিত হয়। সেই সময় বেলজিয়াম ছিল ইওরোপের সর্বাধিক জনবহুল দেশ। ইহার অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল নগরবাসী এবং ইহারা কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। ইংরাজ পুঁজিপতিদের সাহায্যে বেলজিয়ামে রেলপথ নির্মিত হয়।

শিল্প প্রসারের দিক দিয়া ফ্রান্স ছিল অনগ্রসর। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত কুটির শিল্পগুলিই ফরাসীদের চাহিদা মিটাইত। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়, কারণ দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের অধিকাংশ উপনিবেশ উহার হস্তচ্যুত হয়। বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা ফ্রান্সের তখন ছিল না। তথাপি কিন্তু শিল্প-বিপ্লব ধীরে ধীরে ফ্রান্সে প্রসারলাভ করিতে থাকে। প্রথম দিকে খনি-শিল্পের উন্নতি হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পর ফ্রান্সে নানাপ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং শিল্পোন্নতদেশগুলির প্রতিযোগিতা হইতে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করার জন্য শুল্ক-প্রাচীরের সৃষ্টি করা হয়। বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে শিল্পের প্রসার হইতে থাকে এবং বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ইংরাজ কোম্পানীর সাহায্যে এবং ইংরাজ পুঁজিপতিদের অর্থে ফ্রান্সে রেলপথ স্থাপিত হয়।

কয়লা ও লৌহের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও জার্মানী ফ্রান্সের তুলনায় অধিক অনগ্রসর ছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যদিও ইংল্যাণ্ড হইতে কিছু যন্ত্রপাতি জার্মানীতে আনা হইয়াছিল এবং কতকগুলি কারখানাও স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি তথায় শিল্পের বিশেষ প্রসার হয় নাই। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের অর্থসাহায্যে জার্মানীতে প্রথম

রেলপথ স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যেই জার্মানীর কয়লা উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানী ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু তাহার পর হইতে জার্মানী ইওরোপের এক অন্যতম শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই সুইডেন, হল্যাণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশগুলিতেও শিল্পের প্রসার হইতে থাকে। রুশ অধিকৃত পোল্যাণ্ড ভিয়েনা প্রভৃতি অঞ্চলেও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইটালীতে সর্বপ্রথম বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন আমদানি করা হয়।

শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল (Results of Industrial Revolution) : শিল্প-বিপ্লব বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। ইহা আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি রচনা করিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক এবং শিল্পোৎপাদনই সেই ভিত্তি রচনা করিয়াছে। শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা করিলেই বিশ্বের আধুনিক সভ্যতার উপর উহার প্রভাব বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) **অর্থনৈতিক :** শিল্প-বিপ্লবের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ সামগ্রী প্রস্তুত হইতে থাকিলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় শিল্পজাত সামগ্রী সহজেই এবং অল্প সময়ে দেশ-দেশান্তরে প্রেরণ করা সম্ভব হইল। সকল দেশে শিল্পের প্রসার ঘটিতে থাকিলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ও নূতন নূতন বাজার সন্ধানের চেষ্টা শুরু হইল। আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইতে থাকিলে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা দেখা দিল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

(২) **সামাজিক :** শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমাজে দুইটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হইল— মূলধনী-শ্রেণী ও শ্রমিক-শ্রেণী। শিল্পোৎপাদনে অর্থনিয়োগ করিয়া যাহারা উহা হইতে লাভ করিতে লাগিল তাহারাই মূলধনী বা পুঁজিপতি নামে পরিচিত হইল। ইহাদের সহিত পূর্বেকার বণিকদের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কারখানা স্থাপন, শ্রমিক নিয়োগ এবং শিল্পোৎপাদনের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া শিল্পপতিগণ প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। কারখানা ও শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক নিয়োগ ব্যাপক হইয়া উঠিল। গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়া সামান্য মজুরীর প্রত্যাশায় দলে দলে কৃষক ও চাষীগণ শিল্প-শহরগুলিতে ভীড় করিতে লাগিল। ফলে একদিকে গ্রামাঞ্চলগুলি জনবিরল এবং অপরদিকে শহরগুলি জনবহুল হইয়া উঠিতে লাগিল। গ্রামীণ সভ্যতার বিনাশ হইল এবং তৎস্থলে শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতার বিকাশ হইতে লাগিল। কারখানার শ্রমিকদের উপর শিল্পপতিদের অত্যাচার শুরু হইল। সামান্য মজুরীতে পুরুষ, নারী ও শিশুদেরকে খাটানো হইতে লাগিল। ইহাদের শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের উপর কোনরূপ নজর দেওয়া হইত না।

মূলধনী ও শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব

শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতার বিকাশ

শিক্ষার অভাবে এবং অস্বাস্থ্যকর বস্তি এলাকায় বসবাস করার ফলে শ্রমিকদের নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট হইতে লাগিল এবং উহারা অর্ধপশুর ন্যায় জীবনধারণ করিতে লাগিল।

কারখানায় একই ধরনের কাজ ও একই স্থানে বসবাসের ফলে শ্রমিকদের মনে ক্রমশঃ একাত্মবোধের উদ্ভব হইতে থাকে। ফলে উহাদের মধ্যে 'শ্রমিক-সংঘ' গড়িয়া উঠিতে থাকে। উহারা ক্রমশঃ সংঘবদ্ধ হইয়া মালিকদের নিকট নানাপ্রকারের দাবি উত্থাপন করিতে থাকে। প্রায় প্রত্যেক শিল্প-প্রধান দেশগুলিতেই শ্রমিক-সংঘ গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং উহারা ধর্মঘটের সাহায্যে নিজেদের দাবি আদায় করার চেষ্টা করিতে থাকে। প্রথম দিকে সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট শ্রমিক-সংঘ ও শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া দমন করার চেষ্টা করিয়া অবশেষে শ্রমিক-উন্নয়নমূলক আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর শ্রমিক-উন্নয়নমূলক আইনগুলি উল্লেখযোগ্য।

শ্রমিক সংঘের উৎপত্তি

(৩) **রাজনৈতিক:** রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল দেখা গেল। (১) এ যাবৎ ভূস্বামী ও অভিজাতগণই রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে মূলধনী ও শ্রমিক-শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি অর্জনে উদ্যোগী হইল। এ যাবৎ গণতন্ত্রের আদর্শ কেবলমাত্র দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের পর মূলধনী ও শ্রমিক-শ্রেণী গণতন্ত্রের অধিকার দাবি করিতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান বৈশিষ্ট হইল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের সংগ্রাম। এই সংগ্রামের ফলে অবশেষে বিশ্বের বহু রাষ্ট্রে গণতন্ত্রবাদের সাফল্য অর্জন করে।

গণতন্ত্রবাদের অগ্রগতি

(২) শিল্প-বিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদের দাবিও জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ন্যায় প্রাচীন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক শুল্ক ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক আচার-ব্যবহারে বিভিন্নতার অবসান এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংহতি আসার ফলে জাতীয়তাবোধের আদর্শ শক্তিশালী হইয়া উঠে। শুল্ক-সংঘের মাধ্যমে জার্মানীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একতা আসার পর বহুরাষ্ট্রে বিভক্ত জার্মানীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে।

জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি

(৩) জাতীয়তাবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ভাব ও আদর্শের পরস্পর বিনিময় সহজ হইয়া উঠে। ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাবাদের উন্মেষ হইতে থাকে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের উন্মেষ

(৪) শিল্প-বিপ্লবের অপর গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীগত বৈষম্য দূর করিয়া সমতা স্থাপন করাই সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রীয়-কর্তব্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব

ভারতের উপর শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল
(Effects of Industrial Revolution in India)

ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল ভারতেও দেখা দিয়াছিল। যে সময় ইংল্যাণ্ডে শিল্পের প্রসার ঘটিতেছিল সেই সময় ভারতে ইংরাজ প্রভুত্ব প্রসারিত হইয়াছিল। পূর্বে ভারতের মসলিন, কার্পাস ও সিল্কজাত সামগ্রী ইংল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। ইহার ফলে ভারতে প্রচুর অর্থাগমও হইত। ইংরাজ ও অপরাপর ইওরোপীয় কোম্পানীগুলি এই সকল সামগ্রী ক্রয় করিয়া ইওরোপে চালান দিত এবং তাহা সমাদৃত হইত। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে বড় বড় সূতার কারখানা স্থাপিত হয়। অতঃপর ভারত হইতে কাঁচা তুলা ইংল্যাণ্ডে চালান যাইতে লাগিল এবং সেই তুলার দ্বারা প্রস্তুত তুলাজাত সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে ভারতে আমদানি হইতে লাগিল। যন্ত্রচালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের সহিত ভারতীয় কুটির শিল্পগুলি প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিল না। ফলে ভারতের শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। বস্ত্র ছাড়া দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক সামগ্রীও প্রচুর পরিমাণে ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিল। অবৈধ প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় কুটির-শিল্পগুলিকে সরকার রক্ষা করার কোন চেষ্টা না করায় ভারতের প্রাচীন কুটির-শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। ভারতীয় কুটির-শিল্পগুলি বহু পরিবারের অন্নসংস্থান করিত। সুতরাং সেইগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অগণিত শিল্পী বেকারে পরিণত হইল। ইংরাজ বণিক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া বহু শিল্পী ও বণিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষিজীবীতে পরিণত হইল। ফলে কৃষিজমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভারত সমৃদ্ধ বাণিজ্য হারাইয়া কৃষি-প্রধান দেশে পরিণত হইল। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক দারুণ বিপর্যয় দেখা দিল।

সংক্ষিপ্তসার

মানুষের শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন প্রণালীর ক্ষেত্রে যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা শিল্প-বিপ্লব নামে পরিচিত। নূতন নূতন দেশের আবিষ্কার, প্রচুর পরিমাণ কাঁচা মালের সন্ধান, ধাতু মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন, মূলধনের যোগান এবং বহুবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার প্রভৃতি কারণে শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হইয়াছিল। শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ ইংল্যাণ্ডে থাকায় ইংল্যাণ্ড এবিষয়ে ছিল অগ্রণী। ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লব ধীরে ধীরে ইওরোপের অপরাপর দেশেও প্রসারলাভ করিতে থাকে। ইওরোপের শিল্পোন্নতিতে ইংল্যাণ্ডের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্প-বিপ্লব এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছিল। আধুনিক অর্থনৈতিক সভ্যতার মূল ভিত্তি হইল শিল্প-বিপ্লব। ইহার ফলে জাতীয় বাণিজ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে

পরিণতি লাভ করে; সর্বত্র মূলধনী ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব হয়, গ্রাম্য জীবনের অবসান হইয়া শহরজীবনের সূত্রপাত হয়, কলকারখানায় শ্রমিক সংঘের উৎপত্তি হয়। ইহা ছাড়া গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি, আন্তর্জাতিকতাবাদের উন্মেষ ও সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি—শিল্প-বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল।

প্রশ্নমালা

১। শিল্প-বিপ্লবের অর্থ কি ! কি কি কারণে শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে লিখ। উঃ—৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা দেখ

What do you understand by the term Industrial Revolution? What were its causes?

২। ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটিবার কারণগুলি সংক্ষেপে লিখ। উঃ—৮৭-৯০ পৃষ্ঠা দেখ

What factors contributed to the Industrial Revolution in England?

৩। শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা কর। উঃ—৯০-৯২ পৃষ্ঠা দেখ

Describe the results of the Industrial Revolution.

৪। ভারতে শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল? উঃ—৯২ পৃষ্ঠা দেখ

What were the effects of Industrial Revolution in India?

চতুর্থ অধ্যায়

ইওরোপের পুনর্গঠন—১৮১৫-১৮৪৮

ভিয়েনা বৈঠক (Vienna Congress):

সম্রাট নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত হইলে পর বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের নেতৃবৃন্দ অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে এক সম্মেলনে সমবেত হইলেন। ইওরোপের ইতিহাসে এইরূপ সম্মেলন ইহার পূর্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই বৈঠকে সমসাময়িক তিনজন শক্তিশালী রাজা—যেমন অষ্ট্রিয়ার রাজা প্রথম ফ্রান্সিস, প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম এবং রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার উপস্থিত ছিলেন। রাজনীতিবিদগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইংল্যাণ্ডের ক্যাসল্‌রীগ ও ওয়েলিংটন, প্রাশিয়ার প্রিন্স হার্ডেনবার্গ, অষ্ট্রিয়ার প্রিন্স মেটারনিক এবং রাশিয়ার কাউণ্ট নেসেলরোড এবং পরাজিত ফ্রান্সের প্রতিনিধি ট্যালিরাণ্ড। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গের হস্তেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত লইবার দায়িত্ব অর্পিত

আন্তর্জাতিক সম্মেলন

সম্মেলনে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য

হইল। কারণ ইহারাই নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কূটনীতিকুশলতাহেতু সম্মেলনে মেটারনিকই* ছিলেন প্রধান কর্মকর্তা। সম্মেলনে মেটারনিকের পদ রুশ-সম্রাট জার্ প্রথম আলেকজাণ্ডার* গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার অব্যবস্থিত চিত্ততার সুযোগ লইয়া মেটারনিক অতি সহজেই তাঁহাকে স্বমতানুবর্তী করিয়া লইতে সক্ষম হন। প্রাশিয়ারাজ ফ্রেডারিক উইলিয়াম রুশ-সম্রাটের অনুগত থাকায় ভিয়েনা বৈঠকে তিনি এক প্রকার নিষ্ক্রিয় ছিলেন বলিলেই চলে। ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদ্বয় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের উপযুক্ত সমর্থন না পাওয়ায় এই বৈঠকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর বৈঠকে যোগদানকারী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে এক শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হইল।

ভিয়েনা বৈঠকের শান্তি-চুক্তি

---

*মেটারনিক :—১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে মেটারনিক জন্মগ্রহণ করেন। ষ্ট্রাসবুর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অস্ট্রিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কৌনিজ-এর পৌত্রীকে বিবাহ করেন। অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র বিভাগে প্রবেশ করিয়া তিনি ইওরোপের রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ পান। অস্ট্রিয়া সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে তিনি ড্রেসডন, বার্লিন, সেণ্ট পিটার্সবার্গ ও প্যারিসে বসবাস করিয়া ইওরোপীয় রাজনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করেন। তিনি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্তপদে আসীন থাকিয়া ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব করেন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তাঁহার কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ অর্ধশতাব্দীকাল তাঁহাকে ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ছিলেন মার্জিতরুচিসম্পন্ন সুচতুর রাজনীতিবিদ। লোক চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল এবং আত্মশক্তির উপর তাঁহার গভীর আস্থা ছিল। তিনি ছিলেন দাম্ভিক, চাতুরীপ্রিয় ও চক্রান্তকারী। জার প্রথম আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে স্পষ্টভাষায় 'মিথ্যাবাদী' বলিয়াছিলেন।

প্রথম জীবন ও চরিত্র

রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান দুইটি উদ্দেশ্য ছিল :—(১) ফরাসী বিপ্লব প্রসূত উদারনৈতিক ভাবধারার গতিরোধ করিয়া ইওরোপে বিপ্লব-পূর্ব রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করা এবং (২) অস্ট্রিয়ার স্বার্থ রক্ষা ও বিস্তার করা। মেটারনিক ছিলেন প্রগতিবিরোধী রক্ষণশীল। ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নবাগত বিপ্লবী প্রভাব ও বিপ্লবী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করিবার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার নীতির সমর্থনে ইহাই বলা যাইতে পারে যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর ইউরোপে শান্তির একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারাকে গতিরোধ করিতে না পারিলে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠি সমন্বয়ে গঠিত অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও সংহতি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। এই কারণেই তিনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইওরোপের সর্বত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করিয়াছিলেন এবং বিপ্লব-পূর্ব রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কায়েম রাখিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে জনসাধারণের বিদ্রোহ প্রবল হইয়া উঠিলে মেটারনিক ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

রাজনৈতিক নীতি

অস্ট্রিয়ার স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়াই মেটারনিকের পররাষ্ট্রনীতি গড়িয়া উঠে। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জার্মান, পোল, চেক্, শ্লোভাক, ইটালীয় প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যে জাতীয়তাবোধের অভাব ছিল না। সুতরাং অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তার জন্য মেটারনিক সর্বত্র ফরাসী বিপ্লবপ্রসূত জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শ কঠোরহস্তে দমন করার নীতি গ্রহণ করেন। জার্মানী ও ইটালীকে দুর্বল ও শতধা বিভক্ত রাখিয়া অস্ট্রিয়ার প্রভুত্ব বজায়

পররাষ্ট্রনীতি

ভিয়েনার বন্দোবস্ত (Settlement of Vienna) :

নেপোলিয়নের উত্থান ও পতন ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছিল। একদিকে তাঁহার বহু সাফল্যমণ্ডিত অভিযানের ফলে ইওরোপের মানচিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন এবং অপরদিকে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ (জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র) রাজনীতি-ক্ষেত্রে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সমস্যা দেখা দিল তাহা হইল (১) ইওরোপের পুনর্গঠন, (২) ভবিষ্যতে ফ্রান্সের সর্বগ্রাসী ক্ষমতানাশ, (৩) বিপ্লব-পূর্ব রাজন্যবর্গের পুনঃস্থাপন, (৪) নেপোলিয়নীয় যুদ্ধকালে মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির শর্তাদি কার্যকরীকরণ ইত্যাদি।

ভিয়েনা বৈঠকের সম্মুখীন সমস্যা

ইওরোপের পুনর্গঠন ব্যাপারে ভিয়েনার নেতৃবৃন্দ প্রধানতঃ তিনটি মূল নীতি* গ্রহণ করিয়াছিলেন—(২) ইওরোপের পুনর্বণ্টন ও ক্ষতিপূরণ, (২) বৈধাধিকার স্বত্ব এবং (৩) ইওরোপে শক্তি-সাম্য।

বৈঠকের তিনটি মূলনীতি

(১) পুনর্বণ্টন ও ক্ষতিপূরণ : নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও সুইডেন অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সুতরাং পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইহারা কিছু ভূখণ্ড ভাগাভাগি করিয়া লইল।

রাখিতে তিনি যত্নবান হন। বলকান অঞ্চলেও তিনি একই নীতি অনুসরণ করেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে মেটারনিক যতদিন অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন ততদিন পর্যন্ত অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা পাইয়াছিল এবং ইহাই তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির চরম সাফল্য।

*জার প্রথম আলেকজাণ্ডার :—নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করায় ভিয়েনা বৈঠকে তথা সমসাময়িক যুগে প্রথম আলেকজাণ্ডার ও রাশিয়ার প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় প্রতিপত্তি ও সম্মান ইহার পূর্বে কোন সম্রাটের ভাগ্যে ঘটে নাই। রুশ দেশের ন্যায় স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের অধীশ্বর হইয়াও তিনি ছিলেন রাজনৈতিক মতবাদে উদারপন্থী। লা-হারপ নামক জনৈক সুইস্ দেশীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষারত থাকাকালীন জার আলেকজাণ্ডার ফরাসী দার্শনিক রুশো-র উদার মতবাদ ও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রণকুশলতায়ও তিনি সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার চরিত্রে পরস্পর-বিরোধী গুণের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রন ঘটিয়াছিল। উদারনীতির বশবর্তী হইয়া তিনি রুশ-সাম্রাজ্যভুক্ত ফিনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডের জন্য উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আবার এক সময় নেপোলিয়নের সহযোগিতায় সমগ্র এশিয়া রুশ-সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন স্বপ্নবিলাসী ও নিছক আদর্শবাদী। তাঁহার মতে রাজনীতির সহিত ধর্মের এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহকে ধর্মের ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি ইওরোপীয় মৈত্রী-সঙ্ঘ গঠন করাই তাঁহার পরিকল্পনা ছিল এবং ভিয়েনা বৈঠকের পর পবিত্র সন্ধি (Holy Alliance) স্থাপন তাঁহার পরিকল্পনারই ফল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* "Three principles moulded the Vienna Settlement—Principles of Compensation, Legitimacy and Balance of Power."—Ketelbey.

রাশিয়া—ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ডের কিছু অংশ ও তুর্কী-সাম্রাজ্যভূক্ত বেসারাভিয়া লাভ করিল। ইওরোপের রাজনীতিতে রাশিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। প্রাশিয়ার ভাগ্যে জুটিল সুইডেন-মুক্ত পশ্চিম পমারানিয়া, স্যাক্সনীর উত্তরাংশ ও ডানজিগ। হল্যাণ্ডকে বেলজিয়াম সমর্পণ করার ক্ষতিপূরণস্বরূপ অষ্ট্রিয়া ইটালীতে ভেনেশিয়া ও লোম্বার্ডি লাভ করিল। ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল।

রাশিয়ার লাভ
প্রাশিয়ার লাভ
অষ্ট্রিয়ার লাভ

ইংল্যাণ্ড—হোলিগোল্যাণ্ড, মাল্টা ও আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জের উপর অধিকার লাভ করিল। ইহা ভিন্ন স্পেন অধিকারভুক্ত ট্রিনিডাড, ফ্রান্স অধিকারভুক্ত টবাগো দ্বীপপুঞ্জ এবং হল্যাণ্ড অধিকারভুক্ত সিংহল ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের পথ সহজ হইল।

ইংল্যাণ্ডের লাভ

সুইডেন ডেনমার্ক-মুক্ত নরওয়ে লাভ করিল। নেপোলিয়নের পক্ষাবলম্বন করার অপরাধে ডেনমার্ককে শাস্তি দেওয়া হইল এবং মিত্রপক্ষে থাকার জন্য সুইডেনকে পুরস্কৃত করা হইল।

সুইডেনের লাভ

ইটালীতে নেপোলিয়ন যে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা বিনষ্ট করা হইল। উত্তর ইটালী অষ্ট্রিয়াকে প্রদান করা হইল। সার্ভিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল পীয়েডমণ্ট ও জেনোয়া প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে ইটালী পুনরায় শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িল।

ইটালী শতধা বিভক্ত

ইটালীর ন্যায় জার্মানীতেও নেপোলিয়ন যে জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা বিনষ্ট করা হইল। তথায় ৩৯টি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লইয়া একটি দুর্বল রাষ্ট্র সমবায় গঠন করা হইল। ইহা 'কনফিডারেশন অফ-দি-রাইন' নামে পরিচিত। অষ্ট্রিয়াকে এই রাষ্ট্রসংঘের সভাপতি করা হইল। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডকে একত্রিত করিয়া অরেঞ্জ রাজপরিবারের অধীনে স্থাপন করা হইল।

জার্মানী বিভক্ত
হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়ামের সংযুক্তি

(২) **বৈধাধিকার স্বত্ব নীতি :** এই নীতির অর্থ, দীর্ঘকাল ধরিয়া যে রাজবংশ যে সকল অঞ্চলে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহারাই সে সকল অঞ্চলে শাসন করিবার একমাত্র অধিকারী। নেপোলিয়নকৃত ইওরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল; সার্ভিনিয়া-পীয়েডমণ্ট ও হল্যাণ্ডে যথাক্রমে স্যাভয় পরিবার এবং অরেঞ্জ পরিবারকে পুনঃস্থাপন করা হইল; মধ্য ইটালীস্থ রাজ্য পোপকে প্রত্যর্পণ করা হইল এবং কুখ্যাত ফার্ডিনাণ্ডকে তাঁহার সিসিলি ও নেপলস্-এর সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করা হইল।

১৮১৫ সালে ইউরোপ
মাইল স্কেল
০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৫০০
উত্তর সাগর
গ্রেট ব্রিটেন
ফিনল্যাণ্ড
বার্লিন
প্রাশিয়া
পোল্যাণ্ড
জার্মান রাজ্য
লাক্সেমবার্গ
প্যারিস
বিস্কে উপসাগর
ফ্রান্স
সুইজারল্যাণ্ড
অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য
সার্ডিনিয়া
স্পেন
অটোম্যান সাম্রাজ্য
ভূমধ্য সাগর
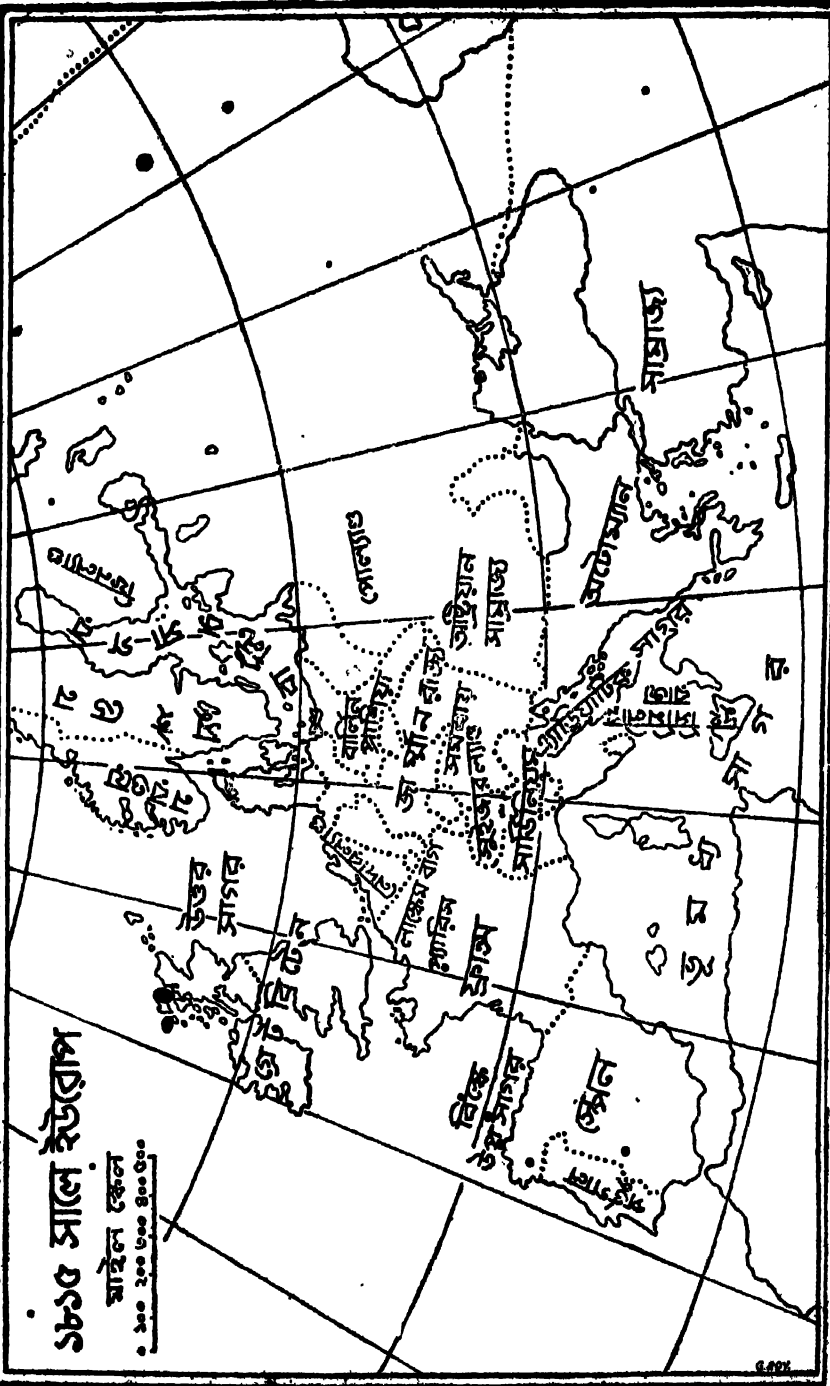
(৩) ইওরোপে শক্তি-সাম্য : ভিয়েনার নেতৃবৃন্দের পরস্পর বিদ্বেষ, ও পরস্পর বিরোধী স্বার্থবোধ এবং ভবিষ্যতে ফ্রান্সের আক্রমণ হইতে ইওরোপকে রক্ষা করার জন্য শক্তি-সাম্য (Balance of Power) নীতির প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। এই নীতি অনুসারে ফ্রান্সের শক্তি যথাসম্ভব খর্ব করা হইল। অধিকন্তু অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডকে ইওরোপের এমন সব অঞ্চলের অধিকার প্রদান করা হইল যাহাতে উহাদের মধ্যে শক্তি-সাম্য বজায় থাকে।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিধিব্যবস্থা

ভিয়েনা কংগ্রেস-কৃত ব্যবস্থাদির অস্থায়িত্বতা : ভিয়েনা কংগ্রেসের ব্যবস্থাদি প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তাবাদ নীতির বিরোধী হওয়ায় উহা অধিক দিন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ভিয়েনার নেতৃবৃন্দ স্বার্থান্বেষী ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি লইয়াই ইওরোপের পুনর্গঠন কার্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্রবাদ ও নূতন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইওরোপের পুনর্বণ্টনের নামে তাঁহারা অদূরদর্শিতা, স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বিপ্লব-পূর্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করিয়া তাঁহারা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্রবাদ প্রভৃতি প্রগতিমূলক আদর্শকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ভিয়েনার প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্তগুলি একে একে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইতে থাকে এবং অবশেষে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের দাবি জয়যুক্ত হয়। যেমন :—

কারণ

(১) বেলজিয়াম সর্বপ্রথম ভিয়েনার বন্দোবস্ত অমান্য করে এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়াম হল্যাণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে, (২) জার্মানী ও ইটালীতে যথাক্রমে প্রাশিয়া ও সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধতার আন্দোলন শুরু হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে উহাদের জাতীয় ঐক্য সম্পন্ন হয়, (৩) ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সার্বিয়া ও গ্রীস তুরস্কের শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে।

ভিয়েনা বন্দোবস্তের স্খলন

এই সকল কারণেই এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস প্রধানতঃ ভিয়েনার কার্যাদির বিনাশের ইতিহাস" ("The history of the 19th century is mainly concerned with the undoing of the work of the Vienna Congress")।*

---

*ভিয়েনা বন্দোবস্ত রক্ষা করার প্রচেষ্টা :—ভিয়েনা কংগ্রেসের সমকালেই নেতৃবৃন্দ ফ্রান্সের সামরিক শক্তি ও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শবাদ হইতে ইওরোপকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র-সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। এই অনুভূতি হইতেই দুইটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল ; একটিকে বলা হয় 'পবিত্র সন্ধি' (Holy Alliance) এবং অপরটিকে বলা হয় 'ইওরোপীয় সঙ্ঘ' (Concert of Europe)।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব (The French Revolution of 1830) :

কারণ : ভিয়েনা কংগ্রেসের বিধি অনুসারে ফ্রান্সে বিতাড়িত প্রাচীন বুরবোঁ রাজবংশকে পুনঃস্থাপিত করা হইয়াছিল। অষ্টাদশ লুই (১৮১৫-২৪ খৃঃ) ছিলেন সংস্কারকামী ও প্রজাহিতৈষী। প্রজাবর্গের সহযোগিতায় রাজ্যশাসন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও তাঁহার রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর ফ্রান্সে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের পরবর্তী রাজা দশম চার্লস (অষ্টাদশ লুই-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ছিলেন উগ্র রাজতন্ত্রী ও স্বেচ্ছাতন্ত্রে বিশ্বাসী। রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দশম চার্লস পুরাতন শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন এবং অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের লুপ্ত গৌরব পুনঃস্থাপন করিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি পলিগনাগ নামক একজন প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীর হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করিলেন। পলিগনাকের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যাদির প্রতিবাদে ফ্রান্সের প্রতিনিধি-সভা (Chamber of Deputies) পলিগনাকের অপসারণের দাবি করিলেন। চার্লস এই দাবির উত্তরে প্রতিনিধি সভাকে জানাইলেন "অশান্ত গণতন্ত্র রাষ্ট্রের বিধিসঙ্গত অধিকারকে স্থানচ্যুত করিতে চাহিতেছে"। জনসাধারণের স্বার্থ ও ক্ষমতা সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে চারটি অর্ডিনান্স জারি করা হইল। ইহার দ্বারা প্রতিনিধি-সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল; ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ করা হইল, এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হইল।

দশম চার্লস্ ও মন্ত্রী পলিগনাকের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যাদি

জনস্বার্থবিরোধী বিধি

পবিত্র সন্ধির নামে মৈত্রী সঙ্ঘের উদ্যোক্তা ছিলেন জার প্রথম আলেকজাণ্ডার। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল ন্যায়, উদারতা ও শান্তি—যুগধর্মের এই তিনটি নীতির ভিত্তিতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ উহাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পরিচালিত করিবে। ইংল্যাণ্ডের রাজা, পোপ ও তুর্কীর সুলতান ছাড়া ইওরোপের প্রায় সকল রাজা জার আলেকজাণ্ডারের প্রস্তাবিত পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই মৈত্রী সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ব্যর্থতার কারণ হইল আলেকজাণ্ডারের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অষ্ট্রিয়া, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের সন্দেহ এবং রাষ্ট্রীয় যন্ত্র হিসাবে ইহার অসারতা।

পবিত্র সন্ধি

ভিয়েনার ব্যবস্থাদি রক্ষা করার অপর প্রচেষ্টা হইল—ইওরোপীয় সঙ্ঘ (Concert of Europe)। এই সঙ্ঘের প্রধান সদস্য ছিল অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড। ভিয়েনা কংগ্রেসের পরবর্তী সাত বৎসরের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনা করার জন্য এবং সর্বত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে এই সঙ্ঘের ৪টি বৈঠক আহূত হইয়াছিল। অবশেষে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনের বিদ্রোহ দমন করার ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের সহিত অপরাপর সদস্যদের মতান্তর ঘটে এবং ইংল্যাণ্ড সঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ করিলে ইহার অবসান ঘটে। ইহার অবসানের অন্যান্য কারণ হইল, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পর অবিশ্বাস, জাতীয়তাবিরোধী নীতি এবং আমেরিকার বিরুদ্ধ মনোভাব।

ইওরোপীয় সঙ্ঘ

এই অর্ডিনান্স বা বিধিগুলি ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ২৭শে জুলাই চার্লস প্যারিসের বিদ্রোহী জনতাকে দমন করার উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণ করিতেই জনসাধারণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইল। জুলাই মাসে এই বিদ্রোহ বা বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব নামে খ্যাত। ২৮শে জুলাই প্যারিসের জনতা রাজধানীর কর্তৃত্ব নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিল। ৩০শে জুলাই বিদ্রোহীগণ অর্লিয়ান্স বংশীয় লুই-ফিলিপকে ফ্রান্সের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। লুই-ফিলিপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে দশম চার্লস সপরিবারে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

প্যারিস জনতার বিক্ষোভ

দশম চার্লসের সিংহাসন ত্যাগ

জুলাই বিপ্লবের গুরুত্ব ও ফলাফল (Importance and Results of July Revolution): এই বিপ্লব ইওরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভিয়েনা কংগ্রেসে (১৮১৫-২৫ খৃঃ) ও পরবর্তীকালে যে সকল জাতীয়তা-বিরোধী ও গণতন্ত্রবিরোধী নীতি গৃহীত হইয়াছিল—জুলাই বিপ্লব ইহার বিরুদ্ধে সবপ্রথম সার্থক প্রতিবাদ।

গুরুত্ব

এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হইল, বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল এবং ইংল্যাণ্ডে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পথ সহজ হইল। এক কথায় উদারনীতিবাদ (Liberalism) ও জাতীয়তাবাদ আংশিকভাবে জয়যুক্ত হইল।

ফ্রান্সে ফলাফল: ফ্রান্সের প্রতিনিধিসভাকে অধিকতর দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিমূলক করা হইল, যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইল, যাজক ও উগ্র রাজতন্ত্রীগণের স্থলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করিল।

ইওরোপে ফলাফল: জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ইওরোপের অপরাপর দেশ-গুলিতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই বিপ্লবের সার্থকতায় উৎসাহিত হইয়া বেলজিয়াম পোল্যাণ্ড, জার্মানী ও ইটালীর জনসাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল।

ভিয়েনা কংগ্রেসের বিধান অনুসারে বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ভাষা, কৃষ্টি ও ধর্মের দিক দিয়া বেলজিয়াম ও ওলন্দাজদের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য ছিল। এই কারণে বেলজিয়ানগণ স্বাধীনতার দাবি করিয়া প্যারিস-জনতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিদ্রোহী হইল। হল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের নিকট পরাজিত হইল। বেলজিয়াম স্বাধীনতা ঘোষণা করিল এবং লিওপোল্ড তথায় রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বেলজিয়ামে বিদ্রোহ

জুলাই বিপ্লবের ফলে পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা হারাইল। ভিয়েনার বিধি অনুসারে পোল্যাণ্ডের উপর রাশিয়ার কর্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছিল। জার প্রথম আলেকজাণ্ডার তথায় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জার প্রথম নিকোলাস পোল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রত্যাহার করিলে পোলেরা ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহী হইল। জার নিকোলাস কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিয়া পোল্যাণ্ডকে রুশ-সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করিলেন।

পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ

ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের ঢেউ জার্মানীতেও আসিয়া পৌছিয়াছিল। উত্তর-জার্মানীর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যেমন ব্রাণসউইক, হ্যানোভার, স্যাক্সনী ও হেস্—উহাদের শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বলপূর্বক উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র আদায় করিল। অপরদিকে দক্ষিণ জার্মানীতে গণ-আন্দোলন সংঘটিত হইল। কিন্তু অষ্ট্রিয়া কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিয়া জার্মানীর সর্বত্র স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা বহাল রাখিল।

জার্মানীতে গণ-আন্দোলন

জুলাই বিপ্লবের সাফল্যের উৎসাহিত হইয়া ইটালীর গুপ্ত সমিতিগুলি সক্রিয় হইয়া উঠিল। পার্মা, মোডেনা ও পোপ-শাসিত অঞ্চলে জন-সাধারণ প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়া এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করিল।

ইটালীতে গণ-আন্দোলন

এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে জুলাই বিপ্লব ইওরোপে বিপ্লবী ভাবধারাকে জাগরিত করিয়াছিল মাত্র কিন্তু জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারে নাই।* একমাত্র বেলজিয়াম ছাড়া অন্যত্র কোথাও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সফল হয় নাই। জার্মানী, ইটালী ও পোল্যাণ্ডে, গণ-আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থ হইলেও উক্ত দেশগুলি ভবিষ্যতে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই দিক দিয়া বিচার করিলে জুলাই বিপ্লব একেবারে নিষ্ফল হয় নাই বলা যায়।

উপসংহার

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব (The French Revolution of 1848):

কারণ (Causes): একাধিক কারণে এই বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্সে যে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা অনেকেরই সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারে নাই। লুই ফিলিপের শান্তি-নীতি জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। এই কারণে তিনি দেশের প্রভাবশালী দলগুলির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

লুই ফিলিপের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা

---

* "The July Revolution awakened the revolutionary tradition without satisfying the national aspirations."

জুলাই রাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রথম হইতেই দুর্বল ছিল। দশম চার্লসের সিংহাসন ত্যাগের পর সাধারণতন্ত্রী দল রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপনের বিরোধী ছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল যে লুই ফিলিপ গণতান্ত্রিক অগ্রগতির দিকে দেশকে পরিচালিত করিবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় তাহারা রাজতন্ত্র-বিরোধী হইয়া উঠিল। বুরবোঁ বংশের সমর্থকগণ অর্লিয়েন্স বংশের প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া লুই ফিলিপের বিরুদ্ধাচরণ করিল। বোনাপার্টিষ্ট দল ফ্রান্সের বিলুপ্ত সামরিক গৌরব পুনরুদ্ধার করার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু লুই ফিলিপের দুর্বল ও অমর্যাদাকর পররাষ্ট্রনীতি বোনাপার্টিষ্ট দলকে জুলাই রাজতন্ত্রের বিরোধী করিয়া তুলিল।

রাজনৈতিক দলগুলির অসন্তোষ

অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির ন্যায় ফ্রান্সের শক্তিশালী সমাজতন্ত্রীদলও লুই ব্ল্যাঙ্কের নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের বিরোধীতা করিতে লাগিল। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন আসিয়াছিল। শিল্প-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রচুর অর্থাগম হইয়াছিল বটে কিন্তু ধন বণ্টনের অসমতাহেতু শ্রমিকদের আর্থিক দুরবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। শ্রমিকসংঘ স্থাপন করা বে-আইন ছিল। শ্রমিকদের মজুরী, চাকুরীর স্থায়িত্ব মালিকদের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করিত। ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। লুই ব্ল্যাঙ্ক ও সেন্ট সাইমনের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হইল। তাঁহাদের দাবি হইল শ্রমিকদের মুক্তিলাভের জন্য প্রথমেই বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের অবসান।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব

পরিশেষে ভোটাধিকারের প্রশ্নই বিপ্লবকে অনিবার্য করিয়া তুলিল। সেই সময় ফ্রান্সে ভোটদানের অধিকার বা প্রতিনিধি পরিষদে সদস্য হওয়ার জন্য অর্থ বা সম্পত্তি-মূলক যোগ্যতা দেখাইতে হইত। ইহার ফলে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন শ্রেণীর পক্ষে ভোটদান করা বা পরিষদের সদস্য-প্রার্থী হওয়া অসম্ভব ছিল। এতদ্ভিন্ন পরিষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। নির্বাচনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি পরিষদে এক সংস্কারকামী দলের উদ্ভব হইল। এই দলের নেতা থিয়ার্সের নেতৃত্বে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবি জানাইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। কিন্তু ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গিজো এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলে জনসাধারণ গিজো-মন্ত্রিসভার পদত্যাগের দাবি জানাইল। সংস্কারপন্থীদল গিজোর বাসভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে গিজোর রক্ষীদল জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিল। এই সংবাদ রাজধানীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে প্যারিসবাসীগণ লুই ফিলিপের পদচ্যুতি দাবি করিল এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ করিল। এই বিদ্রোহ ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লব নামে খ্যাত।*

ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবি

বিদ্রোহ (১৮৪৮)

***সংক্ষেপে ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের কারণ :** (১) জুলাই রাজতন্ত্রের প্রতি জন-সাধারণের তথা রাজনৈতিক দলগুলির অসহানুভূতি। লুই ফিলিপের দুর্বল আভ্যন্তরীণ নীতি জন-

ফ্রান্সের বিপ্লবের ফলাফল (Results): এই অবস্থায় লুই ফিলিপ স্বীয় পৌত্রের অনুকূলে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহার পর সমাজতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রী দল সম্মিলিত হইয়া রাজতন্ত্রের অবসান করিয়া সাধারণতন্ত্রী দলের নেতা লা-মার্টিন-এর নেতৃত্বে ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিল। ইহাই ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র নামে পরিচিত।

ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে দশজনকে লইয়া অস্থায়ী সরকারের একটি কার্য-নির্বাহক সমিতি (Executive) গঠন করা হইল। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইল। সাধারণতন্ত্রের জন্য একজন প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা হইল।

নূতন শাসনতন্ত্র

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়াছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব তথায় যাজক ও উগ্ররাজতন্ত্রীগণের প্রতিপত্তি খর্ব করিয়াছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিপত্তি খর্ব করিয়া জনসাধারণের প্রাধান্য স্থাপন করিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য নাশ ও জনসাধারণের প্রাধান্য স্থাপন

ইওরোপে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ফলাফল: ইওরোপের একাধিক রাষ্ট্রে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব এক ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। মেটারনিকের উক্তি "When France catches cold, Europe sneezes"—যথার্থ প্রমাণিত হইল। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ও মেটারনিকের পতনের ফলে সর্বত্র গণ-আন্দোলন শুরু হইল।

অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিক ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব হইতে অষ্ট্রিয়াকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া তীব্র হইয়া দেখা দিল। ভেনিস, বোহেমিয়া হাঙ্গেরী ও ভিয়েনায় গণ-আন্দোলন শুরু হইল। এই আন্দোলন দমন করিতে অসমর্থ হইলে মেটারনিক চ্যান্সেলার পদ পরিত্যাগ করিয়া ইংল্যাণ্ডে পলায়ন করিলেন। তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক পুনঃস্থাপিত প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্রের অবসান ঘটিল। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট বিপ্লবীদের চাপে বাধ্য হইয়া উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিলেন।

অষ্ট্রিয়া

সাধারণের মনে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। (২) রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতা বিপ্লবের অন্যতম কারণ। সমাজতন্ত্রীদলের রাজতন্ত্রবিরোধী আদর্শ, বুরবোঁ বংশের সমর্থকগণের অর্লিয়েন্স বংশবিরোধী মনোভাব এবং বোনাপার্টিষ্ট দলের গৌরবোজ্জ্বল পররাষ্ট্র নীতির আকাঙ্ক্ষা—জুলাই রাজতন্ত্রকে প্রথম হইতেই দুর্বল করিয়াছিল। (৩) সমাজে অসম বণ্টনের ব্যবস্থা এবং শ্রমিকদের চরম দুরবস্থা প্রভৃতি কারণে সমাজতন্ত্রবাদের দ্রুত প্রসার জনসাধারণকে বিপ্লবী করিয়া তুলিয়াছিল। (৪) পরিশেষে ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ ও নির্বাচনের সংস্কারের দাবি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল।

অষ্ট্রিয়া-অধিকৃত মিলান ও ভেনিস হইতে অষ্ট্রিয়াবাহিনী বিতাড়িত হইল। বোহেমিয়ার রাজধানী প্রাগে জার্মান-বিরোধী চেকগণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি করিল। অষ্ট্রিয়া-সম্রাট চেক্ রাষ্ট্র স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

মিলান ও ভেনিস

হাঙ্গেরীতেও গণ-আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিল। তথায় কসুথ (Kossuth)-এর নেতৃত্বে (যাহাকে হাঙ্গেরীর 'ম্যাজিনী' বলা হইয়া থাকে) ম্যাগিয়ার জাতিগোষ্ঠি স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানাইল। পবিস্থিতিব চাপে পডিয়া অষ্ট্রিয়া-সম্রাট হাঙ্গেরীয়ানদের দাবি স্বীকার করিয়া লইলেন।

হাঙ্গেরী

জার্মানীতেও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব সংক্রামিত হইয়াছিল। দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাডেন-এ গণ-আন্দোলন শুরু হইয়া ক্রমশঃ স্যাক্সনী, ব্যাভেরিয়া, হ্যানোভাব ও প্রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে বিস্তারলাভ করিল। প্রতিটি রাষ্ট্রেই বিপ্লবীগণ নাগবিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও নিয়ম-তান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের দাবি করিল। একমাত্র স্যাক্সনী, ব্যাভেরিয়া ও প্রাশিয়া ভিন্ন অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসকবর্গ এই সকল দাবি স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু মেটারনিকের পতনের সংবাদে আতঙ্কিত হইয়া প্রাশিয়া, স্যাক্সনী, ব্যাভেরিয়া ও হ্যানোভারের শাসকবর্গও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সাময়িকভাবে জার্মানীতে গণ-আন্দোলন সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত তাহা ব্যর্থ হয়।

জার্মানী

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ

(Causes of the Failure of the Revolution of 1848)

সাময়িকভাবে ফ্রান্সের ন্যায় ইওরোপে গণবিপ্লব সাফল্যলাভ করিয়াও একাধিক কারণে তাহা ব্যর্থ হয়:—

(১) নীতিগত বিরোধ: আন্দোলনের নেতৃবর্গের মধ্যে বিপ্লবের উদ্দেশ্য লইয়া মতবিরোধের উদ্ভব হইয়াছিল। ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রশ্ন লইয়া সমাজতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। ইহার সুযোগে বোনাপার্টিষ্ট দল লুই নেপোলিয়ন (প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র)-এর নেতৃত্বে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।

ইটালী ও জার্মানীতেও আন্দোলনের নেতৃবর্গের মধ্যে নীতিগত মতান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর শাসনপদ্ধতি গণতন্ত্র সম্মত না রাজতন্ত্র সম্মত হইবে—এই সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। ইটালীর ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কেও মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল।

(২) স্বার্থ ও জাতিগত বিরোধ: জাতিগত স্বার্থও বিপ্লবের ব্যর্থতার অপর কারণ। হাঙ্গেরীর ম্যাগিয়ারগণ কেবলমাত্র নিজেদের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম

করিয়াছিল এবং অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত অপরাপর জাতিগোষ্ঠির (যেমন শ্লোভেন ও ক্রোটগণ) অনুরূপ দাবির বিরোধিতা করিয়াছিল। জাতিগত স্বার্থসংঘাতের ফলে গণ-আন্দোলন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

(৩) সামরিক শক্তির অভাব: বিপ্লবীগণের সামরিক শক্তির অভাব বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ। সর্বত্র সৈন্যবাহিনী শাসকবর্গের প্রতি অনুগত থাকায় বিপ্লব দমন করা সহজ হইয়াছিল।

উপসংহার

মোট কথায় সর্বত্র গণ-আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাফল্য ঘটে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব ব্যর্থ হয় নাই। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান হইলে তথায় সমাজতান্ত্রিক মতবাদ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইওরোপের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক ও জাতীয় আন্দোলনকে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই দিক দিয়া বিপ্লবের সুদূর প্রসারী ফল অস্বীকার করা যায় না।

তৃতীয় নেপোলিয়ন ও দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য

(Napoleon III and the Second French Empire

প্রথম জীবন

তৃতীয় নেপোলিয়ন (১৮৫২-১৮৭০): সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লুই-বোনাপার্টের পুত্র লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লুই-বোনাপার্ট সেই সময় হল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন। ওয়াটারলু-র যুদ্ধের পর বোনাপার্ট পরিবারের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিলে মাতার সহিত লুই নেপোলিয়ন (পরে তৃতীয় নেপোলিয়ন) সুইটজারল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পোপের বিরুদ্ধে ইটালীর জনসাধারণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি থাকার অপরাধে তাঁহাকে রোম হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'রোমের নরপতি' বলিয়া পরিচিত দ্বিতীয় নেপোলিয়নের মৃত্যু হইলে লুই-নেপোলিয়ন বোনাপার্ট পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন। ইংল্যাণ্ডে নির্বাসিত থাকাকালীন লুই-নেপোলিয়ন প্রথম নেপোলিয়নের আদর্শ ও নীতির প্রতি ফরাসী জনসাধারণের গভীর শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করেন। সুতরাং তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিয়া ফরাসী সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিতে যত্নবান হন।

প্রথম নেপোলিয়নের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা

ফ্রান্সের সিংহাসন লাভের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লুই-নেপোলিয়ন ষ্ট্রসবুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার প্ররোচনায় ফরাসী সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী হইল। কিন্তু লুই-নেপোলিয়নের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং তিনি আমেরিকায় নির্বাসিত হইলেন এবং তথা হইতে তিনি পুনরায় ইংল্যাণ্ডে গমন করিলেন। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তিনি 'ডে আইডিয়াস নেপোলিয়নিয়েনিস (Des Ideas Napoleonienis) নামে একখানি পুস্তিকা

প্রকাশিত করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে লুই-নেপোলিয়ন স্বদেশে ফিরিয়া পুনরায় সিংহাসন দখলের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পুনরায় তিনি ব্যর্থ হইয়া বন্দী হইলেন ও নির্বাসিত হইলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের অরলিয়েন্স রাজবংশের অবসান ঘটিলে লুই-নেপোলিয়ন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং ন্যাশনাল এসেম্ব্লি বা জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে একাধিক কেন্দ্র হইতে পরিষদের সভ্যপদে নির্বাচিত হইলেন। ইহার পর তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

লুই-নেপোলিয়ন কর্তৃক দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৮৫২)

সাধারণতন্ত্রের সভাপতি পদে নির্বাচিত হইবার পর লুই-নেপোলিয়ন সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হইলেন। ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও লুই-নেপোলিয়নের নির্বাচন ইহাই প্রমাণ করিল যে ফরাসী জনগণের অধিকাংশই রাজতন্ত্রের সমর্থক। লুই-নেপোলিয়ন সতর্কতার সহিত জাতির মনোভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং সম্রাটপদে উন্নীত হইবার জন্য অতি সন্তর্পণে তাঁহার কর্মসূচী রচনা করিতে লাগিলেন। তিনি ফরাসী সৈন্যবাহিনীকে নিজ প্রভাবাধীনে আনিলেন, দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া জনসাধারণের সমর্থন লাভে সচেষ্ট হইলেন এবং রোম নগরীতে পোপকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ফ্রান্সের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও সমর্থন লাভ করিলেন। ইহার পর তিনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বলপূর্বক জাতীয় পরিষদের বিভিন্ন দলগুলির নেতৃবৃন্দকে বন্দী করিয়া আইন-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিলেন। ফ্রান্সের জনগণ সভাপতির এইরূপ আচরণ সমর্থন করিল, প্যারিস সন্তুটি প্রকাশ করিল এবং ফরাসী নেতা থিয়ার্স—"সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লুই নেপোলিয়ন ঘোষণা করিলেন "ফ্রান্স সাম্রাজ্যের পথে ফিরিয়া যাইতে চাহে কারণ সাম্রাজ্যের অর্থই হইল শান্তি"।* নূতন করিয়া গণভোট গৃহীত হইল এবং নেপোলিয়ন "ফরাসীদের সম্রাট" (Emperor of the French) বলিয়া ঘোষিত হইলেন। লুই-নেপোলিয়ন তৃতীয় নেপোলিয়ন নাম ধারণ করিয়া দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

আভ্যন্তরীণ নীতি

ফরাসী বিপ্লবের ও গণতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ১৮৫২ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ষোলটি শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সংশোধিত শাসনতন্ত্র সম্রাটের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজের হস্তে কেন্দ্রীভূত করিলেন। সৈন্যবাহিনীকে সম্রাটের অধীন করা হইল; যুদ্ধ ঘোষণা ও

---

*"It seems that France is inclined to return to the Empire, well, the Empire means peace."

শান্তি স্থাপন, বাণিজ্যিক সন্ধি স্থাপন, আইন রচনা ও তাহা কার্যে পরিণত করা—প্রভৃতি ক্ষমতার অধিকার একমাত্র সম্রাটকেই দেওয়া হইল। সেনেট ও আইন-পরিষদের কার্যাবলী নিরূপণ করা এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করা প্রভৃতি ক্ষমতাও সম্রাটকে দেওয়া হইল।

শাসনযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ

শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়াই তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্ষান্ত রহিলেন না। কঠোর হস্তে বিরোধী সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার সকল ব্যবস্থাও তিনি করিলেন। সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হইল; সমালোচকদের কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করা হইল এবং বিনা বিচারে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল।

সংবাদপত্র ও সভাসমিতি নিয়ন্ত্রণ

স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াও তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন প্রজাকল্যাণকামী নরপতি (benevolent despot)। তিনি স্বদেশে বহুবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি এক সময় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া বলিতে পারে যে সাম্রাজ্যের অর্থ হইল যুদ্ধ; কিন্তু আমি বলিব, সাম্রাজ্যের অর্থ হইল শান্তি"।* তিনি ব্যাঙ্ক-অফ-ফ্রান্সের পুনর্গঠন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করেন। দেশের নানাস্থানে রেলপথ নির্মাণ করিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করেন। কৃষির উন্নতিকল্পে তিনি খাল খনন, কৃষি ঋণের ব্যবস্থা ও সমবায় সমিতি স্থাপন করেন। শিল্পের উন্নয়নের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলাচলের ব্যবস্থা করেন। দরিদ্র নাগরিকদের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। নেপোলিয়নের সৌন্দর্যবোধ ছিল প্রশংসনীয়। প্রমোদ উদ্যান ও নাট্য-মঞ্চ এবং সুরম্য অট্টালিকার দ্বারা তিনি প্যারিস নগরী সুশোভিত করেন। জাঁকজমক ও বিলাসের কেন্দ্র হিসাবে প্যারিস বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন চার্চ ও রাজশক্তির মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষাকেন্দ্রগুলির উপর চার্চের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ক্যাথলিক ধর্ম-যাজকগণকে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং চার্চকে অর্থ সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন।

প্রজাকল্যাণকামী নরপতি

ধর্মনীতি

তৃতীয় নেপোলিয়নের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল (১) নিজেকে ইওরোপের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করা এবং (২) চমকপ্রদ পররাষ্ট্রনীতির দ্বারা ফরাসী জনগণের বিরোধিতা প্রতিরোধ করা। সিংহাসনারোহনের প্রথম আট বৎসর তিনি পররাষ্ট্রনীতির

পররাষ্ট্র-নীতি

***In a spirit of suspicion, some people may say, the Empire is war; I say, the Empire is peace"।**

ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিয়া ফ্রান্সের মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করেন সন্দেহ নাই কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তাঁহার নীতি চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

প্রথমেই তৃতীয় নেপোলিয়ন ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে রোমে পোপের অনুকূলে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইতিপূর্বে রোমে পোপের শাসন নির্মূল করিয়া ম্যাৎসিনী তথায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন পোপকে সমর্থন করিয়া ফ্রান্সের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি অর্জন করিলেন। তাঁহার সাহায্যে পোপ রোমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রথম নেপোলিয়নের মস্কো-অভিযানের ব্যর্থতার প্রতিশোধ গ্রহণ করার এবং নিকট-প্রাচ্যে ফ্রান্সের প্রভাববৃদ্ধি করার অভিপ্রায়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬ খৃঃ) রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সহিত যোগদান করিলেন। এই যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ঘটিল এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের মনস্কামনাও পূর্ণ হইল। তৃতীয় নেপোলিয়নের পরিচালনাধীনে প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬ খৃঃ) স্বাক্ষরিত হইল। সর্বত্র তৃতীয় নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও ফ্রান্সের সুনাম ঘোষিত হইল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজেকে জাতীয়তাবাদের সমর্থক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্যারিসের সন্ধি অনুযায়ী মোলডেভিয়া ও ওয়ালাকিয়া প্রদেশদ্বয় তুরস্কের হস্তে প্রত্যর্পিত হইলে তিনি উহার বিরোধিতা করিয়া প্রদেশ দুইটিকে সংযুক্ত করিয়া রুমানিয়া নামে এক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করিলেন। অবশেষে তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং উক্ত প্রদেশ দুইটি স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাইল।

জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্থন

ইহার পর তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করিয়া ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সার্ডিনিয়াকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইলে ফ্রান্স স্যাভয় ও নীস লাভ করিল। অষ্ট্রিয়া ছিল ফ্রান্সের প্রাচীন শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বি। সুতরাং অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইলে ফরাসী জনগণ তৃতীয় নেপোলিয়নকে অভিনন্দন জানাইল।

অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইটালীকে সাহায্যদান

কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দেব পর হইতে নেপোলিয়নের পররাষ্ট্রনীতি উত্তরোত্তর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে লাগিল। ইটালীর ব্যাপারে তৃতীয় নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার সহিত ভিলাফ্রাঙ্কার গোপন চুক্তি সম্পাদন করিয়া মারাত্মক ভুল করিলেন। ফ্রান্সের পার্শ্বেই শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ইটালী গঠিত হইলে ফ্রান্সের স্বার্থের প্রতিকূল হইতে পারে এই আশঙ্কায় তৃতীয় নেপোলিয়ন জয়ের মুহূর্তকাল পরে অষ্ট্রিয়ার সহিত গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে ইটালী রুষ্ট হইল এবং ইংল্যাণ্ড নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

নেপোলিয়নের পররাষ্ট্র নীতির ব্যর্থতার যুগ (১৮৬০-৭০)

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড রুশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে পোলদের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন না। ফলে পোলগণ নেপোলিয়নের প্রতি রুষ্ট হইল।

পোলিশ নীতির ব্যর্থতা

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের পর হইতে মধ্য-আমেরিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মেক্সিকোতে তীব্র অন্তর্বিপ্লব চলিতেছিল। ফ্রান্সের তাঁবেদারীতে অষ্ট্রিয়া-সম্রাটের ভ্রাতা ম্যাক্সমিলিয়ানকে মেক্সিকোতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অষ্ট্রিয়ার মিত্রতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তথায় ফরাসী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ম্যাক্সমিলিয়ান তথায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের এই সাফল্য স্থায়ী হইল না। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের শেষে যুক্তরাষ্ট্র মনরো নীতি অনুসরণ করিয়া ফরাসী সম্রাটকে মেক্সিকো হইতে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন মেক্সিকো হইতে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। মেক্সিকো অভিযানের ব্যর্থতা নেপোলিয়ন এবং ফ্রান্সের মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন করিল এবং নেপোলিয়নের পতনের পথ প্রশস্ত করিল।

মেক্সিকো নীতির ব্যর্থতা

ইতিমধ্যে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়াকে স্যাডোয়ার যুদ্ধে (১৮৬৬ খৃঃ) পরাজিত করিয়া জার্মানীর ঐক্যবন্ধন একরূপ সুনিশ্চিত করেন। কিন্তু জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের পথে ফ্রান্স ছিল এক অন্যতম অন্তরায়। এই কারণে কূটনীতির বলে বিসমার্ক তৃতীয় নেপোলিয়নকে জার্মানীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে নেপোলিয়ন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হইলেন। এই পরাজয়ের ফলে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন ও দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল। প্যারিসের জনতা তৃতীয় নেপোলিয়নকে বন্দী করিয়া ফ্রান্সে পুনরায় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল। ইহা তৃতীয় সাধারণতন্ত্র নামে পরিচিত।

প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ ও ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন (১৮৭০)

সংক্ষিপ্তসার

ইওরোপের পুনর্গঠন : ভিয়েনা বৈঠক : সম্রাট নেপোলিয়ন ফ্রান্স হইতে নির্বাসিত হইলে পর ভিয়েনা বৈঠকে ইওরোপের পুনর্গঠন সম্পর্কিত কার্যাদি শুরু হয়। এই বৈঠকে অষ্ট্রিয়ার রাজা প্রথম ফ্রান্সিস, প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক, রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার, ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধি ক্যাসলরীগ, অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিক প্রভৃতি নেতৃবর্গ যোগদান করেন। মেটারনিক ছিলেন বৈঠকের প্রধান কর্মকর্তা। নেপোলিয়নের অভিযানের ফলে ইওরোপে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল তাহাকে অস্বীকার করিয়া বিপ্লব-পূর্ব অবস্থার পুনঃস্থাপন করাই এই বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইওরোপের পুনর্বণ্টন ও ক্ষতিপূরণ, বৈধাধিকার স্বত্ব এবং ইওরোপের শক্তি-সাম্য এই তিনটি নীতি অবলম্বনে ইওরোপে যথাসম্ভব বিপ্লব-পূর্ব অবস্থার পুনঃস্থাপন করা হয়, বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ ক্ষতিপূরণবাবদ কিছু কিছু রাজ্যলাভ করে এবং ইওরোপে বিপ্লব-প্রসূত গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতিতে বাধাপ্রদান করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। কিন্তু ভিয়েনা বৈঠকের ব্যবস্থাদি প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তাবাদনীতির বিরোধী হওয়ায় উহা অধিক

দিন স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে নাই। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ভিয়েনার প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্তগুলি একে একে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইতে থাকে এবং অবশেষে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের দাবি জয়যুক্ত হয়।

ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক আন্দোলন: ভিয়েনা বন্দোবস্ত অনুসারে ফ্রান্সে বিতাড়িত বুরবোঁ রাজবংশকে পুনঃস্থাপন করা হয়। রাজা দশম চার্লস ও তাঁহার মন্ত্রী পলিগনাকের প্রতিক্রিয়াশীল ও গণতন্ত্র-বিরোধী কার্যাদির ফলে ফরাসীবাসী ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হয়। ভিয়েনা বৈঠকের জাতীয়তাবিরোধী ও গণতন্ত্র-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ইহাই হইল প্রথম সার্থক প্রতিবাদ। ইহার ফলে ফ্রান্সের প্রতিনিধিসভাকে অধিকতর দায়িত্বশীল করা হয় এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করে। ইওরোপেও এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বেলজিয়াম হল্যাণ্ড হইতে বিযুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে, গ্রীস তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে এবং পোল্যাণ্ড, জার্মানী ও ইটালীতে গণ-আন্দোলন সংঘটিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর ফ্রান্সে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। রাজনৈতিক দলগুলির অসন্তোষ, রাজা লুই ফিলিপের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি, সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব প্রভৃতি কারণে পুনরায় ফরাসী জনগণ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হয়। ইহার ফলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কৌশলে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পর ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ইওরোপের অন্যান্য দেশেও দেখা দেয়। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং কোথাও কোথাও উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র রচিত হয়।

প্রশ্নমালা

১। ভিয়েনা বৈঠকের কার্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

Give an account of the activities of the Vienna Congress. উঃ ৯৩-৯৪ পৃঃ দেখ

২। ভিয়েনা কংগ্রেসে কিরূপ রাষ্ট্রবিন্যাস হইয়াছিল। ভিয়েনা বন্দোবস্তের ব্যর্থতার কারণ কি? উঃ পৃষ্ঠা

[Discuss the settlement of Europe as made by the Congress of Vienna. How do you account for its failure ?] উঃ ৯৫-৯৮ পৃঃ দেখ

৩। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের কারণ কি? ফ্রান্স ও ইওরোপে উহার ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল?

[What were the causes of the French Revolutions of 1830 and 1848 ? What were their consequences in France and Europe ?] উঃ ৯৯-১০৫ পৃঃ দেখ

৪। তৃতীয় নেপোলিয়নের পরিচালনাধীনে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখ।

[Descibe briefly the circumstances which led to the establishment of the second Empire under Napoleon III.] উঃ ১০৫-১০৬ পৃঃ দেখ

৫। লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবনী বর্ণনা কর।

Review the career of Napoleon III. উঃ ১০৫-১০৯ পৃঃ দেখ

৬। লুই নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতি বর্ণনা কর।

Discuss the internal policy of Louis Napoleon. উঃ ১০৬-১০৭ পৃঃ দেখ

৭। মেটারনিকের জীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

Write a short account of the career of Metternich. উঃ ৯৪-৯৫ পৃঃ সংক্ষিপ্তসার দেখ

পঞ্চম অধ্যায়

(ইটালী ও জার্মানীর ঐক্যবদ্ধতার আন্দোলন)

(Italian and German Unification)

(ইটালী ও জার্মানীর জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপন)

১৮৫০ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ইটালী ও জার্মানীর জাতীয় ঐক্যসাধন ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠন এবং স্বাধীন রুমানিয়ার উৎপত্তি।

ইটালীর জাতীয় রাষ্ট্র (National State of Italy) : পঞ্চম শতাব্দীতে বর্বরদের হস্তে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইটালীর ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রীয় জীবন গঠনের সৌভাগ্য হয় নাই। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ইটালী একটি ভৌগলিক সংজ্ঞায় (Geographical Expression) পর্যবসিত হইয়াছিল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন যখন ইটালীতে প্রবেশ করেন সেই সময় ইটালী ১২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে একমাত্র সার্ডিনিয়া-পীয়েডমণ্টই ছিল স্বাধীন ইটালীয় রাষ্ট্র। বাকি সকল রাষ্ট্রই বিদেশী রাষ্ট্রের শাসনাধীন ছিল। যেমন উত্তর ইটালীতে হ্যাপস্‌বার্গ, মধ্য ইটালীতে পোপ এবং নেপলস্ ও সিসিলিতে স্পেনীয় বুরবোঁ-রাজবংশ্ যথাক্রমে রাজত্ব করিত।

ভূমিকা

ইটালীতে নেপোলিয়নের শাসন স্থাপিত হইলে ইটালীর নব-জীবনের সূচনা হইয়াছিল। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই নেপোলিয়ন ইটালীবাসীদের জাতীয় সংহতি ও ঐক্য বন্ধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি হ্যাপস্‌বার্গ ও বুরবোঁ নৃপতিগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন এবং পোপের রাজ্য নিজ শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। তিনি সর্বত্র একই আইনের প্রবর্তন করিয়া, একই ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া এবং একই ইটালীয় বাহিনী গঠন করিয়া ইটালীর আভ্যন্তরীণ বিভেদ দূর করিয়াছিলেন এবং জাতীয় ঐক্যের সূচনা করিয়াছিলেন। ম্যাৎসিনীর ন্যায় দেশপ্রেমিক পর্যন্ত নেপোলিয়নের প্রতি ইটালীবাসীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন "ইটালীর বুদ্ধিজীবীর জন্মলাভ হইল, জাতীয় সম্পদ ও ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ হইল; ফরাসী সাম্রাজভুক্ত হইয়াও আমাদের ভিতর জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হইল এবং আমাদের একমাত্র কাম্য আমাদের জাতীয় সংহতির ছবি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল।"

ইটালীতে নেপোলিয়নের অবদান

ম্যাৎসিনীর মন্তব্য

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ভিয়েনা-বন্দোবস্তের ফলে নেপোলিয়নকৃত সকল পরিবর্তন অস্বীকৃত হইল। 'বৈধাধিকার স্বত্ব'—নীতির প্রয়োগ করিয়া ইটালীর জাতীয় ঐক্যের দাবি অস্বীকার করা হইল। তথায় আটটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল

এবং উত্তর-পূর্ব ইটালীর লোম্বার্ডি ও ভেনিস অষ্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইল। মধ্য ইটালীতে পোপের কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপিত হইল। নেপলস্ ও সিসিলি বুরবোঁ-রাজবংশীয় প্রথম ফার্ডিনাণ্ড এবং পার্মা, মোডেনা ও টাস্কানী হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয় ডিউকের হস্তে প্রত্যর্পিত হইল। একমাত্র সার্ডিনিয়া-পীয়েডমণ্ট ইটালীর বংশোদ্ভূত শাসকের হস্তে ন্যস্ত রহিল। মোটকথা ইটালী বলিতে কোন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র রহিল না এবং মেটারনিকের কথায় "Politically speaking there was no Italy during the years 1815 and 1850"।*

ভিয়েনা বন্দোবস্ত ও ইটালী

ইটালীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধনের পথে বিঘ্নও ছিল প্রচুর। যেমন :—

(১) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে উগ্র প্রাদেশিকতা। সমগ্র দেশের স্বার্থের বিনিময়ে— প্রদেশগুলি স্ব স্ব ঐতিহ্য ও স্বার্থ বিসর্জন দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথে অন্তরায়

(২) ভিয়েনার বন্দোবস্ত অনুসারে ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনশক্তির প্রবর্তন জাতীয় রাষ্ট্রের পরিপন্থী ছিল।

(৩) ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য জাতীয় ঐক্যের পথে অন্যতম অন্তরায় ছিল।

ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব (১৮১৫-৫০): ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইটালীতে যে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ইটালীবাসীগণ তাহা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভিয়েনা কর্তৃক প্রবর্তিত প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য ইটালীর নানাস্থানে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হইল। এই সকল গুপ্তসমিতির মধ্যে 'কারবোনারী'† (Corbonari) বা 'জলন্ত অঙ্গারবাহী' ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ইটালীতে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটাইয়া গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা এবং জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জন করা। ইহার সদস্যবৃন্দ সর্বত্র প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার করিতে লাগিল। কিন্তু কারবোনারীর কর্ম পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না।

ইটালীর প্রথম পর্ব

১৮২০ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয় বিপ্লবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কারবোনারী সমিতি নেপলস্-এ প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিল। নেপলস্-এর রাজা প্রথম ফার্ডিনাণ্ড শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনে প্রতিশ্রুত হইলেন। পর বৎসর পীয়েডমণ্টেও গণ-অভ্যুত্থান হইল এবং জনসাধারণ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র দাবি করিল। রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল

*ম্যাৎসিনী তৎকালীন ইটালীর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "We have no flag, no Political name, no rank among European nations."

† 'কারবোনারী' সমিতির প্রকৃতি সম্বন্ধে ম্যারিয়ট বলেন "Semi religious in ritual, fantastic in its elaborate symbolism, the Carbonari was oligarchical almost autocratic in organisation, yet it stood for liberalism and progress."

বিপ্লবীদের দাবি পূরণে অসমর্থ হইয়া স্বীয় ভ্রাতা চার্লসের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী দলগুলির পরস্পর বিবাদের ফলে আন্দোলন ব্যর্থ হইল।

প্রথম বিদ্রোহ (১৮২০)

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উৎসাহিত হইয়া ইটালীর একাধিক রাষ্ট্রে পুনরায় গণ-বিপ্লব দেখা দিল। এই বিপ্লবের কেন্দ্র ছিল পোপ-শাসিত মধ্য-ইটালী। কিন্তু পুনরায় অষ্ট্রিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিল।

১৮৩০-৩২ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ

এইভাবে ১৮২০ হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত সকল বিপ্লবই ব্যর্থ হইল। এই ব্যর্থতার কয়েকটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমতঃ, বিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রধানতঃ কারবোনারীদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। সমগ্র জনসাধারণকে দলে টানিবার মত আদর্শ বা গঠনমূলক কোন পরিকল্পনা ইহাদের ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্রোহগুলি বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক হওয়ায় অষ্ট্রিয়ার ন্যায় শক্তিশালী শত্রুর নিকট সহজেই উহারা পরাভূত হইল। তৃতীয়তঃ, ঐক্যবদ্ধতার আদর্শ কেবলমাত্র কয়েকজন নেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্যর্থতার কারণ

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ম্যাৎসিনী ও তাঁহার সহকর্মীদের প্রচার-কার্যের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিপ্লবীগণ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলে ইটালীর সর্বত্র নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিল। অপর দিকে ভিয়েনা হইতে মেটারনিকের পলায়নের সংবাদে মিলানে অষ্ট্রিয়া বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান হইল এবং অষ্ট্রিয়াবাহিনী মিলান পরিত্যাগ করিল। ভেনিসে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল। প্রজাবর্গের আহ্বানে সার্ডিনিয়া-পীয়েডমণ্টের রাজা চার্লস এলবার্ট জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব

পীয়েডমণ্টের নেতৃত্বের ব্যর্থতাহেতু রাজতন্ত্রীদল জনসাধারণের আস্থা হারাইল এবং সাধারণতন্ত্রীদল জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। ম্যাৎসিনী* ও সাধারণতন্ত্রীদল অতঃপর গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। "রাজাদের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—এইবার জন-যুদ্ধের পালা"—এই বলিয়া ম্যাৎসিনী জনসাধারণকে মুক্তি সংগ্রামে আহ্বান জানাইলেন।

ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডি কর্তৃক পরিচালিত মুক্তি আন্দোলন

---

*ম্যাৎসিনী :—ম্যাৎসিনী ছিলেন জেনোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপকের পুত্র। অল্প বয়সেই ম্যাৎসিনী স্বদেশের দুর্দশার কথা ভাবিতে শেখেন। প্রথম জীবনে তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ইটালী যখন একটি ভৌগলিক সংজ্ঞা মাত্র তখন তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইটালীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কারবোনারী নামক বিপ্লবী সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পীয়েডমণ্টের বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও পরে নির্বাসিত হন। কারবোনারীর ধ্বংসমূলক কর্মপন্থায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। এই সঙ্ঘের পরিচালিত আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ উপলব্ধি করিয়া তিনি 'নব্য-ইটালী' নামে এক নূতন দল গঠন করেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সমগ্র ইটালীবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। 'নব্য-ইটালী' দলের আদর্শ ছিল শিক্ষা, প্রচার, আত্মত্যাগ ও কর্তব্যানুরাগ দ্বারা জাতীয়ভাবোধের সঞ্চার করা। ম্যাৎসিনী সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন।

এই সংগ্রামে ম্যাৎসিনীর প্রধানতম সহকর্মী ছিলেন গ্যারিবল্ডি।* ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডির প্রচেষ্টায় রোম ও টাস্কানীতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ম্যাৎসিনীর সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া পীয়েডমণ্ট-রাজ চার্লস এলবার্ট পুনরায় মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করিলেন। কিন্তু নোভারার যুদ্ধে তিনি অষ্ট্রিয়ার নিকট পরাজিত হইলেন। এলবার্টের এই পরাজয়ের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল হইয়া পড়িল এবং সর্বত্র স্বৈরাচারী শাসকবর্গ জয়যুক্ত হইলেন।

১৮৪৮ সালের আন্দোলনের গুরুত্ব

ব্যর্থ হইলেও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন একেবারেই নিষ্ফল হয় নাই। ইহার ফলে জনসাধারণের মনে গভীর আত্মবিশ্বাস জাগরিত হইল। এই সর্বপ্রথম ইটালীবাসী এক মহান উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। উহারা এই সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র প্রাদেশিক মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র ইটালীর জন্য চিন্তা করিতে শিখিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন চার্লস এলবার্ট ও তাঁহার পুত্র ভিক্টর ইমান্যুয়েল। ইহার ফলে রাজবংশের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলনে পীয়েডমণ্ট রাজবংশের নেতৃত্ব যে অপরিহার্য তাহা সর্বত্র স্বীকৃত হইল।

১৮৩০ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ইটালীর গণ-বিপ্লব ম্যাৎসিনা পরিচালিত যুবশক্তির সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার পরিচালিত আন্দোলন সফল হয় নাই সত্য কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে তাঁহার প্রেরণা ভবিষ্যৎ ইটালী গঠনের পথ সুগম করিয়াছিল।

*গ্যারিবল্ডি: ম্যাৎসিনী ছিলেন আদর্শবাদী কিন্তু গ্যারিবল্ডি ছিলেন যথার্থ কর্মী পুরুষ। কোনরূপ রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বা আপোষ-মীমাংসায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। একমাত্র অস্ত্রেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ম্যাৎসিনীর নিকট স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গ্যারিবল্ডি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইটালীর মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করেন। 'নব্য-ইটালী' দলের আন্দোলন ব্যর্থ হইলে তিনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় নির্বাসিত থাকেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নেপলস্ ও সিসিলিতে গণ-আন্দোলন হইলে তথাকার জনসাধারণের আমন্ত্রণে তিনি আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি নেপলস্ ও সিসিলিতে ডিক্টেটররূপে স্বীকৃত হন। ইহার পর তিনি সসৈন্যে রোম অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু অবশেষে কাভুরের কূটনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়া তিনি রোম অধিকারের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর যখন পুরস্কার প্রাপ্তির সময় আসে তখন তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া ক্যাপরেরা দ্বীপে নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রে চলিয়া যান।

কাউণ্ট কাভুর: ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কাভুর পীয়েডমণ্টের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তিনি সৈন্যদলে যোগদান করেন। উদার-নৈতিক মতবাদের প্রতি তাঁহার অনুরাগ থাকায় তিনি গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। এই কারণে তিনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সামরিক বিভাগ হইতে পদত্যাগ করেন এবং ১৭ বৎসর পারিবারিক ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকেন। প্রচুর অর্থের অধিকারী হইয়াও তিনি কখনও স্বদেশের বৃহত্তম সমস্যার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তিনি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে বহুবার গমনাগমন করিয়া তথাকার রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি নিষ্ঠার সহিত পর্যবেক্ষণ করেন। ইংল্যাণ্ডের শাসন পদ্ধতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল প্রবল এবং পরবর্তীকালে এই ধরনের শাসনব্যবস্থা তিনি ইটালীতে প্রবর্তন

ইতালির ঐক্য
সুইটজারল্যাণ্ড
অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য
লোম্বার্ডি ১৮৫৯
ভেনেশিয়া ১৮৬৬
ট্রিয়েস্ট
ভেনিস
পাইডমন্ট
পার্মা ১৮৬০
মোডেনা ১৮৬০
রোমনা ১৮৬০
তুর্কী সাম্রাজ্য
নিস
ফ্লোরেন্স
টাসকানি ১৮৬০
আড্রিয়াটিক সাগর
কর্সিকা (ফরাসী)
রোম ১৮৭০
সার্ডিনিয়া
ন্যাপলস ১৮৬০
ভূমধ্য সাগর
পালের্মো
মেসিনা
১৮৬০ সিসিলি
পাইডমন্ট-সার্ডিনিয়া (মূলরাজ্য)
নূতন অংশের সংযুক্তি :
১৮৫৯ খৃঃ
১৮৬০ খৃঃ
১৮৬৬ খৃঃ
১৮৭০ খৃঃ
ফ্রান্সকে প্রদত্ত (১৮৬০ খৃঃ)

ইটালীর ঐক্য-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব (১৮৫০-৬১): ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সার্ডিনিয়ার নূতন রাজা ভিক্টর ইমান্যুয়েল কাউন্ট কাভুর নামে এক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ্‌কে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিলেন। কাভুরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ইটালীর ঐক্যবন্ধন সম্পন্ন করা। কাভুরের ইটালীয় নীতি তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়া অনুসৃত হইয়াছিল—যথা, (১) পীয়েডমণ্টকে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃপদের উপযোগী করিয়া তোলা, (২) ইটালীর সমস্যাকে ইওরোপীয় সমস্যায় উন্নীত করা এবং (৩) বিদেশী শক্তির সাহায্যে ইটালী হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করা। প্রথমেই কাভুর আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে যত্নবান হইলেন। তিনি কৃষি, বাণিজ্য, রাজস্ব ও সমরবিভাগে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া পীয়েডমণ্টকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করিলেন।

কাভুরের ইটালীয় নীতি

ইহার পর কাভুর ইটালীর ঐক্যবন্ধন অর্জনে যত্নবান হইলেন। ইওরোপের সহানুভূতি লাভের জন্য তিনি প্রচারকার্য শুরু করিলেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ইটালীর সমস্যার প্রতি ইওরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বৈদেশিক শক্তির সাহায্য লাভের সুযোগ আসিল। কাভুর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করিলেন। এই যুদ্ধে সার্ডিনিয়া পীয়েডমণ্টের সৈন্যবাহিনী কৃতিত্ব অর্জন করিল। পুরস্কার স্বরূপ কাভুর প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইলেন। কাভুরের উদ্দেশ্য সফল হইল। ইটালীর সমস্যা ইওরোপের সমস্যারূপে স্বীকৃতি লাভ করিল।

কাভুরের পরবর্তী লক্ষ্য হইল ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহযোগিতা লাভ করা। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কাভুর ও তৃতীয় নেপোলিয়নের মধ্যে এক গোপন চুক্তি

করিয়াছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে সার্ডিনিয়ার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রিয়ার প্রভাব হইতে ইটালীকে মুক্ত করিয়া ইটালীর জাতীয় ঐক্য সম্পন্ন করা। তাঁহার কার্যপন্থা ছিল, (১) পীয়েডমণ্টকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করা, (২) পীয়েডমণ্টের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্য সম্পন্ন করা, (৩) বিদেশী শক্তির সাহায্যে ইটালী হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করা এবং (৪) ইটালীর সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় উন্নীত করা। সামরিক বিভাগের পুনর্গঠন, নৌবাহিনী গঠন, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধান প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া কাভুর জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ইওরোপের সহানুভূতি লাভের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিভিন্ন পত্রিকায় জোর প্রচার কার্য শুরু করেন। তিনি ইটালীর সমস্যার প্রতি ইওরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মিত্রতা লাভের জন্য তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬ খৃঃ) যোগদান করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হয় এবং ফ্রান্সের সাহায্যে তিনি লোম্বার্ডি ও ভেনিস হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করেন। অতঃপর অষ্ট্রো-সার্ডিনিয়ান যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া তিনি পীয়েডমণ্টের সহিত মধ্য ও উত্তর ইটালীর সংযুক্তি সম্পন্ন করেন। ফ্রান্সের সাহায্যে তিনি পোপের রাজ্য দখল এবং পীয়েডমণ্টের সহিত নেপলস্‌ ও সিসিলির সংযুক্তি সম্পন্ন করেন। এক কথায় কাভুরকে আধুনিক ইটালীর স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। "Cavour was the maker of Modern Italy."

(Treaty of Plombieres) স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হইল যে ফ্রান্স সার্ডিনিয়ার পক্ষে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিবে; সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি, ভেনিস ও পোপ-শাসিত রাজ্যের কতকাংশ লাভ করিবে। পুরস্কার স্বরূপ কাভুর ফ্রান্সকে নীস ও স্যাভয় প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালী হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করার জন্য সার্ডিনিয়াকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের মিত্রতা লাভ

পর বৎসর (১৮৫৯ খৃঃ) সার্ডিনিয়ার আমন্ত্রণে ফরাসীবাহিনী ইটালীতে আগমন করিয়া মেগান্টা ও সালফেরিনোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে পরাস্ত করিল। যুদ্ধ জয়ের মাঝখানে হঠাৎ তৃতীয় নেপোলিয়ন সার্ডিনিয়ার সহিত পরামর্শ না করিয়াই অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি ভিলাফ্রাঙ্কার সন্ধি নামে খ্যাত। ইহার শর্তানুসারে সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি লাভ করিল, ভেনিস অষ্ট্রিয়ার অধিকারে রহিল, মধ্য ইটালীতে পার্মা, মোডেনা, টাস্কানী ও পোপ-শাসিত রোমানা প্রভৃতি অঞ্চলে বিতাড়িত শাসকগণকে [illegible] তাঁহাদের স্ব স্ব পদে পুনঃস্থাপিত করা হইল। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন নাই বলিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন নীস ও স্যাভয়-এর উপর দাবি পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের ইটালী অভিযান (১৮৫৯)

ভিলাফ্রাঙ্কার সন্ধি (১৮৫৯)

অষ্ট্রিয়ার সহিত তৃতীয় নেপোলিয়নের সন্ধি ইটালী[illegible]দের মনঃপূত হইল না। পুনরায় গণ-বিপ্লব শুরু হইল। শীঘ্রই কাভুর উপলব্ধি করিলেন যে তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্মতি ব্যতীত মধ্য ইটালীকে সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত করা সম্ভব নহে। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়[illegible]র সম্মতিক্রমে পার্মা, মোডেনা, টাস্কানী ও রোমানার জনসাধারণ সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত হইবার পক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। স্যাভয় ও নীস ফ্রান্সের অনুকূলে মত প্রকাশ করিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সার্ডিনিয়া-পীয়েডমণ্টের রাজা ভিক্টর ইমান্যুয়েল উত্তর ও মধ্য ইটালীর রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে একমাত্র রোম ভিন্ন প্রায় সমগ্র ইটালী সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইল। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পর (১৮৭১ খৃঃ) রোম ঐক্যবদ্ধ ইটালীর সহিত সংযুক্ত হইল। এইভাবে ইটালীর জাতীয় ঐক্য সম্পন্ন হইলে তথায় জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হইল।

ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের শেষ পর্ব (১৮৬১-৭১)

জার্মানীর জাতীয় রাষ্ট্র (National State of Germany): ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল জার্মানীর জাতীয় রাষ্ট্র গঠন। ইওরোপের ইতিহাস আরম্ভ হইবার সময় হইতে বহুদিন পর্যন্ত ইটালীর ন্যায় জার্মানীও ছিল ভৌগলিক সংজ্ঞা (Geographical Expression) মাত্র। তিনশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে জার্মানী ছিল বিভক্ত। এই রাষ্ট্রগুলির পরস্পর বিবাদ ও স্বার্থ-সংঘাত

ভূমিকা

ইটালীর ঐক্য-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব (১৮৫০-৬১): ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সার্ডিনিয়ার নূতন রাজা ভিক্টর ইমান্যুয়েল কাউণ্ট কাভুরকে নামে এক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ্‌কে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিলেন। কাভুরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ইটালীর ঐক্যবন্ধন সম্পন্ন করা। কাভুরের ইটালীয় নীতি তিনটি উপায় অবলম্বন করিয়া অনুসৃত হইয়াছিল—যথা, (১) পীয়েডমণ্টকে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃপদের উপযোগী করিয়া তোলা, (২) ইটালীর সমস্যাকে ইওরোপীয় সমস্যায় উন্নীত করা এবং (৩) বিদেশী শক্তির সাহায্যে ইটালী হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করা। প্রথমেই কাভুর আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে যত্নবান হইলেন। তিনি কৃষি, বাণিজ্য, রাজস্ব ও সমরবিভাগে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া পীয়েডমণ্টকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করিলেন।

কাভুরের ইটালীয় নীতি

ইহার পর কাভুর ইটালীর ঐক্যবন্ধন অর্জনে যত্নবান হইলেন। ইওরোপের সহানুভূতি লাভের জন্য তিনি প্রচারকার্য শুরু করিলেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিভিন্ন ...িকায় প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ইটালীর সমস্যার প্রতি ইওরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ...লেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বৈদেশিক শক্তির সাহায্য লাভের সুযোগ আসিল। ...যুদ্ধে যোগদান করিলেন। এই যুদ্ধে সার্ডিনিয়া পীয়েডমণ্টের ...র্জন করিল। পুরস্কার স্বরূপ কাভুর প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ...র উদ্দেশ্য সফল হইল। ইটালীর সমস্যা ইওরোপের

...ী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহযোগিতা ...ীয় নেপোলিয়নের মধ্যে এক গোপন চুক্তি

...র্ডিনিয়ার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন।

(Treaty of Plombieres) স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হইল যে ফ্রান্স সার্ডিনিয়ার পক্ষে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিবে; সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি, ভেনিস ও পোপ-শাসিত রাজ্যের কতকাংশ লাভ করিবে। পুরস্কার স্বরূপ কাভুর ফ্রান্সকে নীস ও স্যাভয় প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালী হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করার জন্য সার্ডিনিয়াকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের মিত্রতা লাভ

পর বৎসর (১৮৫৯ খৃঃ) সার্ডিনিয়ার আমন্ত্রণে ফরাসীবাহিনী ইটালীতে আগমন করিয়া মেগাণ্টা ও সালফেরিনোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে পরাস্ত করিল। যুদ্ধ জয়ের মাঝখানে হঠাৎ তৃতীয় নেপোলিয়ন সার্ডিনিয়ার সহিত পরামর্শ না করিয়াই অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি ভিলাফ্রাঙ্কার সন্ধি নামে খ্যাত। ইহার শর্তানুসারে সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি লাভ করিল, ভেনিস অষ্ট্রিয়ার অধিকারে রহিল, মধ্য ইটালীতে পার্মা, মোডেনা, টাস্কানী ও পোপ-শাসি[illegible] রোমানা প্রভৃতি অঞ্চলে বিতাড়িত শাসকগণকে [illegible] স্ব স্ব পদে পুনঃস্থাপিত করা হইল। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দায়িত্ব পা[illegible] বলিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন নীস ও স্যাভয়-এর উপর দাবি পরিত্যা[illegible]

তৃতীয় নেপোলিয়নের ইটালী অভিযান (১৮৫৯)

ভিলাফ্রাঙ্কার সন্ধি (১৮৫৯)

অষ্ট্রিয়ার সহিত তৃতীয় নেপোলিয়নের সন্ধি ইটালী[illegible] পুনরায় গণ-বিপ্লব শুরু হইল। শীঘ্রই কাভুর উ[illegible] নেপোলিয়নের সম্ম[illegible] সহিত সংযুক্ত ক[illegible] নেপোলিয়[illegible] রোমানার জনসাধারণ সার্ডি[illegible]

[illegible]শিয়াকে শক্তিশালী [illegible]আভ্যন্তরীণ সকল রাজ- [illegible] করিয়া সমাজতন্ত্রীগণকে [illegible]রিয়া রাজশক্তিকে সবল করিয়া [illegible]ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের নিরপেক্ষতা লাভ [illegible]র্যায্য হইতে বঞ্চিত করা। ইটালীবাসীকে [illegible]য়া প্রত্যর্পণ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তাহাদের সমর্থন লাভ করা হইল।

ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের শেষ পর্ব (১৮৬১-৭১)

নিরপেক্ষতা অর্জন

অষ্ট্রো-প্রাশিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের নিরপেক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ প্রাশিয়া ফ্রান্সকে বেলজিয়াম প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার রুশ-বিরোধী মনোভাব রাশিয়া বিস্মৃত হয় নাই। সুতরাং অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে রাশিয়ার নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল।

এইভাবে অষ্ট্রিয়াকে বৈদেশিক সাহায্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে (অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ-১৮৬৬ খৃঃ) লিপ্ত হইলেন। অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইল। প্রাগের সন্ধি (Treaty of Prague) অনুসারে অষ্ট্রিয়া (১) ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত জার্মান রাষ্ট্র সংঘের বিলুপ্তি স্বীকার করিল, (২) হ্যানোভার, ক্যাসাল, শেলেসউইগ-হলেষ্টিন প্রাশিয়াকে প্রদান করিল, (৩) ভেনেশিয়া ইটালীকে প্রদত্ত হইল এবং (৪) প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল।

অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ ও অষ্ট্রিয়ার পরাজয় (১৮৬৬)

জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের পরিপন্থী ছিল। ইটালীর ন্যায় জার্মানীতেও নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় হইতে জাতীয়তাবোধের প্রথম সূচনা হইয়াছিল। নেপোলিয়ন জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ সম্রাটদের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া জার্মানীর প্রায় অর্ধাংশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি জার্মানীর তিন শত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে ভাঙ্গিয়া উনচল্লিশটি রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন এই সকল ব্যবস্থা করিয়া জার্মানীকে ভবিষ্যৎ ঐক্যের সন্ধান দিয়াছিলেন। অতঃপর ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর সমগ্র জার্মানী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

জার্মানীতে নেপোলিয়নের অবদান

কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনার নেতৃবৃন্দ জার্মানীর জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করেন। ইটালীর ন্যায় জার্মানী সম্পর্কেও 'বৈধাধিকার স্বত্ব-নীতির প্রয়োগ করিয়া জার্মানীকে খণ্ডিত করা হয় এবং একটি জার্মান রাষ্ট্রসমবায় গঠন' করিয়া উহার উপর অষ্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়। ভিয়েনা বন্দোবস্তের ফলে ...নীতে বহু স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা হয় এবং জার্মানী বলিয়া কোন ...স্বীকৃত হয় নাই।

ভিয়েনা কর্তৃক জার্মানীর বন্দোবস্ত (১৮১৬)

সং ... হ...িকায় ... তাহাদের ...ন। ... খৃষ্টাব্দে ব্র্যাণ্ডেন...র যু...

ঐক্য আন্দোলন (১৮১৫-৫০): ১৮১৫ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ ...র্জন ...কাস উহার জাতীয় অনৈক্য, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জাতীয় ...ধ্যের ৬ ইতিহাস। জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের পথে প্রধান ...ধান্য এবং (২) জার্মান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পর-...সঞ্চ মনোবৃত্তি। ১৮১৫ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ ...যু...ে ছিল। অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিক ...ন দমন করিতে সচেষ্ট ছিলেন।

প্রথম জীবন

শিক্ষক মহলে সুপরিচিত ছিলেন... করিয়া বিসমার্ক প্রশিয়ার সিভিল সা...র্ভিস... গতানুগতিক জীবনে তিনি ক্লান্ত হইয়া উ... ন্যায় তিনিও কয়েক বৎসর পৈতৃক ভূসম্পত্তি ...তিনিয়... "কার্লসবাদ বিধানাবলী"

*ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের গুরুত্ব: ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ... আন্দোলন সার্থক হইল। দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রসমূহ এবং ফ্রান্সের অন্তর্গত আলসাস্ লোরেন প্রভৃতি অঞ্চলগুলি উত্তর জার্মানীর রাষ্ট্রসঙ্ঘে সংযুক্ত হওয়ায় জার্মানী ইওরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে (১) তথাকার দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন হইল এবং সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদ্ভিন্ন ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি জটিল হইয়া উঠিল। (২) আলসাস্-লোরেন প্রদেশদ্বয় জার্মানীকে সমর্পণ করায় ফরাসীবাসীর মনে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্বেষ সঞ্চারিত হইল এবং এই মনোভাব পরবর্তীকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হইয়াছিল।

(৩) ইটালীর ঐক্যবন্ধন সম্পূর্ণ হইল। রোম ভিক্টর ইমান্যুয়েল কর্তৃক অধিকৃত হইল এবং উহা ঐক্যবদ্ধ ইটালীর রাজধানীতে পরিণত হইল।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ফলাফল ইওরোপের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাদির অবসান ঘটিল। জার্মানীর সাফল্য পশ্চিম ইওরোপের শান্তিভঙ্গের কারণ হইল। জাতীয়তাবাদের সাফল্যের সহিত সামরিকবাদের সূচনা হইল। অতঃপর জার্মানীর সামরিকবাদ নূতন করিয়া বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের পথ রচনা করিল।

ইওরোপের ইতিহাসে গুরুত্ব

ঐতিহাসিকগণ জার্মানীর জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব জার্মানীতেও এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে আন্দোলন গুরুতর হইয়াছিল। লিপজিগ, ক্যাসেল ও ড্রেসডেনে বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়া তাহা দক্ষিণ জার্মানীতেও প্রসারলাভ করিল। কিন্তু ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ রাজতন্ত্র-বিরোধী ছিল না। ইহা ছিল শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু মেটারনিকের সাহায্যে জার্মানীর এই গণ-অভ্যুত্থান সহজেই দমন করা হইল। পরবর্তী ১৮ বৎসরকাল জার্মানীতে কোনরূপ রাজনৈতিক আলোড়ন ঘটে নাই।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব জার্মান জনসাধারণের মধ্যে পুনরায় আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বৎসরের বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল (১) সর্বত্র শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করা এবং (২) জার্মানীর জাতীয় ঐক্য সাধন করা। স্যাক্সনী, হ্যানোভার ও প্রাশিয়া ছাড়া অ

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব

সকল রাষ্ট্রেই এই দাবি স্বীকৃত হইল। মেটারনিক ভিয়েনা হইতে পলায়ন ক[illegible]লেন। জার্মানীর সর্বত্র আন্দোলনের মাত্রা তীব্র হইল। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ [illegible] তথা সমগ্র হইয়া নূতন শাসনতন্ত্র মঞ্জুর করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুস[illegible] রাশিয়া ও ফ্রান্সের ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি রাজ্যের শাসকগণও নিজেদের রাজ্য[illegible]উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে করিতে সম্মত হইলেন। চতুর্থ ফ্রেডারিক জার্মা[illegible] সম্ভব নহে" ("Germany is স্বহস্তে গ্রহণ করার [illegible]—Bismark.)

ফ্রাঙ্কফার্টের জাতীয় পার্লামেণ্ট

উৎসাহিত [illegible]লাভের পূর্বে বিসমার্ক প্রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত এক জাতীয় মহাসভার অধিবেশন [illegible]। রাষ্ট্রদূত হিসাবে তিনি রাশিয়ার সাহায্য লাভ উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র রচনা[illegible]তে ও ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সমস্যা পর্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম হন। এইভাবে ফ্রাঙ্কফার্টের অভিজ্ঞতা এবং কূটনৈতিক প্রতি[illegible]নিধিরূপে ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানীতে অবস্থান করিয়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ বিসমার্কের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল।

বিসমার্ক ছিলেন রক্ষণশীল, রাজতন্ত্রবাদী এবং গণতন্ত্রবাদ-বিরোধী। তিনি ছিলেন সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী এবং জার্মানীর ভবিষ্যৎ যে সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়া তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াপন্থী। গভীর ধর্ম-বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি এক সময় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে "আমি যদি খৃষ্টান না হই তবেই আমি সাধারণতন্ত্রী" ("If I were not a Christian, I should be a republican") গণতন্ত্রের প্রভাব হইতে প্রাশিয়াকে মুক্ত রাখাই ছিল তাঁহার প্রধান নীতি। প্রাশিয়া-রাজতন্ত্রের নেতৃত্বে সমগ্র জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল

রাজনৈতিক মতবাদ

অধ্যক্ষ ফ্রান্সের ... ন।

এইভাবে তিনি ... র যুদ্ধে ... জুন ক ... পরি ... রাষ্ট্রের চা ...
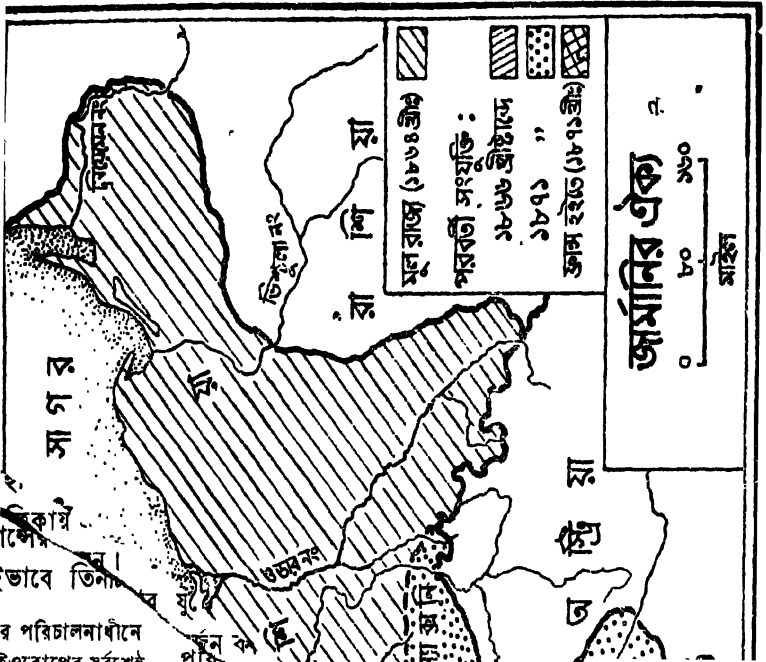
বিসমার্কের পরিচালনাধীনে জার্মানী ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পর বিসমার্ক প্রায় কু... সম... করিয়া জার্মানীকে ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে প... ঐক্যবন্ধন সম্পন্ন হইলে তিনি ইওরোপের বলসাম্য ... শান্তি স্থাপনের নীতি গ্রহণ করেন। ১৮৭১ হইতে ১৮... তিনি ছিলেন ইওরোপের ভাগ্যনিয়ন্তাস্বরূপ। তিনি ইওরোপের বিভিন্ন ... বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে এবং ফ্রান্সের আক্রমণাত্মক মনোভাবের বিরুদ্ধে জার্মানীর নিরাপত্তার বিধান করিতে সমর্থ হন।

জার্মানীর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও বিসমার্ক বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে তিনি আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, রক্ষণশীলতা, ও দেশের সমৃদ্ধি বর্ধন এই তিনটি আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন।

আভ্যন্তরীণ নীতি

সাম্রাজ্যের সংহতির জন্য তিনি জার্মানীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত স্থানীয় আইন সমূহ বাতিল করা হইল এবং তৎস্থলে সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য একই আইনবিধি প্রবর্তিত হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা, সর্বত্র একই ধরণের মুদ্রার প্রচলন, জার্মানীর রেলপথের কেন্দ্রীয়করণ প্রভৃতি ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হইল। প্রাশিয়ার

লাগিল। আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনে সাহায্য করিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর (১৮৫৪-৫৬ খৃঃ) রাশিয়ার অষ্ট্রিয়া-বিরোধী মনোভাব ও নিকট প্রাচ্য সমস্যায় অষ্ট্রিয়ার বিব্রত অবস্থা জার্মানীর জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিল। অপরদিকে উদারপন্থী উইলিয়ামের প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ এবং জার্মানীর রাজনীতির ক্ষেত্রে বিসমার্কের ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজনীতিজ্ঞের আবির্ভাব জার্মানীর ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করিল।

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি জার্মানীর পক্ষে অনুকূল

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে অটো ভন বিসমার্ক (Otto Von Bismark) প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। কাভুরের ন্যায় তিনিও নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র অস্ত্রের সাহায্যেই (Policy of "blood and iron") জার্মানীর ঐক্যবন্ধন সম্পন্ন করা সম্ভব। অষ্ট্রিয়া জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের অন্তরায়। সুতরাং অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করিয়া জার্মানীর ঐক্য সম্পন্ন করার নীতি তিনি [illegible]লেন। করেন।

বিসমার্কের নীতি

[illegible] হইতে কিছু

বিসমার্ক সর্বপ্রথম সামরিক বিভাগের পুনর্গঠন করিয়া প্র[illegible]রা। করিয়া তুলিলেন। প্রাশিয়া[illegible]ন্ত্রী কাভুরের সহিত এক নৈতিক দলগুলিকে বি[illegible]য়াকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত কঠোর হস্তে দমন [illegible]তে সসৈন্যে প্রবেশ করেন। ফ্রান্সে তুলিলেন। অতঃপর বিসমার্কের কাজ হই[illegible] পরাজিত হয় এবং ইটালী হইতে অষ্ট্রিয়ার করিয়া অষ্ট্রিয়াকে বিদেশী রাষ্ট্রের [illegible] দেয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে ফরাসী সম্রাট ভ্রে[illegible] করিয়াই অকস্মাৎ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত [illegible] করেন। ফরাসী সম্রাটের এইরূপ আচরণে ইটালীবাসী

বিসমার্ক কর্তৃক সামরিক পুনর্গঠন

অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইওরোপের [illegible]

বিক্ষুব্ধ হয় [illegible]ট কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার সমর্থনে মধ্য ইটালীর রাজ্যগুলি সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত হইলে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। নেপোলিয়নের ইটালীয় নীতি আপাততঃ সাফল্যমণ্ডিত হইলেও পরিণামে তাহা সম্রাটের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বদেশের স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছিল। সার্ডিনিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইটালীতে পোপের অবস্থা বিপন্ন করায় সম্রাট ফ্রান্সের ক্যাথলিকগণের বিরাগ ভাজন হইয়া পড়েন। স্যাভয় ও নীস্ দখল করায় সম্রাট ইংল্যাণ্ডের অসন্তুষ্টির কারণ হন এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ ইটালীর সৃষ্টি ফ্রান্সের রাজতন্ত্রীগণ ভীতির চক্ষে দেখেন।

ইটালীর ন্যায় জার্মানীর ঐক্যবদ্ধতার আন্দোলনের প্রতিও তৃতীয় নেপোলিয়নের স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল। স্লেশউইগ ও হলষ্টিন নামক প্রদেশ দুইটির ব্যাপারে নেপোলিয়ন প্রাশিয়াকে সমর্থন করিয়া অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে (১৮৬৬ খৃঃ) নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। ইহার বিনিময়ে তিনি কিছু পুরস্কারের আশা করেন। কিন্তু প্রাশিয়া

ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে সংঘটিত স্যাডোয়ার যুদ্ধ তাঁহার সকল গণনা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে। স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর জার্মানীর ঐক্য আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়। অতঃপর প্রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী বিসমার্ক জার্মানীর ঐক্য বন্ধন সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু ফ্রান্স এই ঐক্য বন্ধনের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠে। প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিদ্‌গণ জার্মানীকে খণ্ডিত রাখার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। কারণ ইহাতে ফ্রান্সের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা কম ছিল। মধ্য ও উত্তর জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইলেও দক্ষিণ জার্মানীর ক্যাথলিক রাজ্যগুলি তখন পর্যন্ত তৃতীয় নেপোলিয়নকে উহাদের পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিরক্ষক বলিয়া মনে করিত। সুতরাং দক্ষিণ জার্মানীকে সংযুক্ত জার্মানীর অন্তর্ভূক্ত করিতে হইলে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করার একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। বিসমার্ক শীঘ্রই ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করার সুযোগ পান। অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে নিরপেক্ষতার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার নিকট পুরস্কার দাবী করিলে বিসমার্ক কূটনীতির বলে ফরাসী সম্রাটকে পররাজ্যগ্রাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন। এই অবস্থায় তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকে রক্ষার উদ্দেশ্যে শেষ পর্যন্ত প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন (১৮৭১ খৃঃ)। কিন্তু তাহার পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

জার্মানী ও তৃতীয় নেপোলিয়ন

সংক্ষিপ্তসার

ইটালীর ঐক্য আন্দোলন : পঞ্চম শতাব্দীতে বর্বরদের নিকট রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইটালীর ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রীয় জীবনের সৌভাগ্য ঘটে নাই। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে প্রথম নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ইটালী একটি ভৌগলিক সংজ্ঞায় পর্যবসিত হয়। ইটালী জয় করিয়া নেপোলিয়ন ইটালীর জাতীয় ঐক্যের সূত্রপাত করেন। কিন্তু ভিয়েনার বন্দোবস্ত অনুসারে ইটালীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথে বহু অন্তরায়ের সৃষ্টি করা হয় ও ইটালীকে শতধা বিভক্ত করা হয়। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইটালীতে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের গণ-আন্দোলন ব্যর্থ হইলেও উহা আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করে। সার্ডিনিয়া পীয়েডমন্টের রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল, কাভুর, ম্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতি দেশপ্রেমিকদের চেষ্টায় ইটালীর জাতীয় ঐক্য সম্পন্ন হয় এবং ইটালীর জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়।

জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন : ইওরোপের ইতিহাস শুরু হইবার সময় হইতে বহুকাল পর্যন্ত ইটালীর ন্যায় জার্মানীও ছিল ভৌগলিক সংজ্ঞামাত্র। তিনশত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে জার্মানী বিভক্ত ছিল। এই রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিবাদ ও স্বার্থসংঘাত এবং জার্মানীর উপর অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য জার্মানীর জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী ছিল। ইটালীর ন্যায় জার্মানীতেও প্রথম নেপোলিয়ন জাতীয় ঐক্যের সূত্রপাত করেন। তিনি জার্মানীর তিনশত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করিয়া ৩৯টি রাষ্ট্রে পরিণত করেন। নেপোলিয়ন জার্মানীকে ভবিষ্যৎ ঐক্যবন্ধনের সন্ধান দেন। কিন্তু ভিয়েনার বন্দোবস্ত অনুসারে জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথে বহু অন্তরায়ের সৃষ্টি করা হয় এবং জার্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে পুনঃস্থাপন করা হয়। ইটালীর ন্যায় জার্মানীতেও অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করা হয়। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জার্মানীতেও গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এই আন্দোলন দুইটি ব্যর্থ হইলেও আংশিক সাফল্য লাভ করে। অবশেষে আন্তর্জাতিক ও জার্মানীর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, বিসমার্কের নীতি এবং অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান ও ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ প্রভৃতির ফলে জার্মানীর জাতীয় ঐক্য সম্পন্ন হয় এবং জার্মানীর জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়।

[illegible]

১। উনবিংশ শতাব্দীতে ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের কাহিনী বর্ণনা কর।

[Tell the story of the Italian unification in the 19th century.] উঃ ১১২-১১৭ পৃঃ দেখ।

২। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনের কাহিনী বর্ণনা কর।

[Tell the story of the German unification in the 19th century.]

উঃ ১১৭-১২২ পৃঃ দেখ।

৩। ইটালী ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনে তৃতীয় নেপোলিয়ন কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন?

[What part did Napoleon III play in the Italian and German unification Movements?] উঃ ১২৫-১২৬ পৃঃ দেখ।

৪। বিসমার্কের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

[Describe the character and achievements of Bismarck.] উঃ ১২২-১২৫ পৃঃ দেখ।

৫। নিম্নলিখিতগুলি সম্পর্কে কি জান:

(১) ম্যাৎসিনী, (২) কাভুর, (৩) গ্যারিবল্ডি।

Write notes on:

(1) Mazinni, (2) Cavour, (3) Garibaldi. উঃ ১১৩-১১৬ পৃঃ পাদটীকা দেখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচ্য সমস্যা—১৬৮৩-১৯১৪

(The Eastern Question)

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে তুরস্ক ইওরোপের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ছিল। বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্য এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইওরোপের বল্কান অঞ্চলও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকার সংযোগস্থল দার্দানেলিশের তীরে অবস্থিত কনস্টান্টিনোপল ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের রাজধানী। জলে স্থলে তুরস্ক ছিল ইওরোপের প্রবেশ দ্বার।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবনতি ও প্রাচ্যসমস্যার উদ্ভব

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিশেষ করিয়া ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনার প্রবেশ পথে পোল্যাণ্ডের রাজা জন-সোবিয়েস্কির হস্তে তুর্কী বাহিনীর পরাজয়ের সময় হইতে তুরস্কের পতন শুরু হয়। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের নিকট তুরস্কের পরাজয় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সময় হইতেই তুরস্ক আক্রমণাত্মক নীতি পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করে এবং ইওরোপের কয়েকটি উদীয়মান রাষ্ট্র বিলীয়মান তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দিকে হস্ত প্রসারিত করিতে থাকে। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবনতি

ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং অপরদিকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের রাজ্যাংশ লাভ করিতে প্রতিবেশী ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির আগ্রহ প্রভৃতি কারণ হইতে ইওরোপ তথা নিকট প্রাচ্যের রাজনীতিতে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় তাহাই 'পূর্বাঞ্চল' বা 'নিকট প্রাচ্য সমস্যা' (Near Eastern Question) নামে অভিহিত। তুরস্কের ভবিষ্যৎ কি হইবে, এই প্রশ্নই ছিল পূর্বাঞ্চল বা নিকট প্রাচ্য সমস্যার প্রধান কথা।*

প্রাচ্য-সমস্যা কি ?

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তুরস্ক ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নিকট অবিরত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে থাকে। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের পর পোপের নেতৃত্বে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 'হোলি-লীগ' (Holy League) নামে একটি রাষ্ট্র সমবায় গঠিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা। ১৬৯৯ ও ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে কার্লোভিজ ও প্যাসারোভিজ-এর যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হইলে উহার কিছু রাজ্যাংশ ইওরোপীয় দেশগুলির হস্তগত হয়। ইতিমধ্যে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া পশ্চিম ইওরোপের দিকে অগ্রসর হইয়া তুরস্কের আজফ্ বন্দরটি দখল করে। সুতরাং ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তুরস্কের দুর্বলতা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিলে উহার ভবিষ্যৎ ইওরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক দারুণ জটিলতার সৃষ্টি করে।

১৬৮৩ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তুরস্কের লাঞ্ছনা

প্রাচ্য বা নিকট-প্রাচ্য সমস্যা কোন একটি সূত্রকে অবলম্বন করিয়া আবর্তিত হয় নাই। ইহার মূলে ছিল একাধিক ঘটনার সমাবেশ এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই সমস্যা আবর্তিত হইতে থাকে। প্রাচ্য বা নিকট প্রাচ্য সমস্যার মূল কারণগুলি ছিল—প্রথমতঃ, তুর্কী সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবনতি, সামরিক শক্তির সাহায্যে তুর্কী সাম্রাজ্য সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে শাসনযন্ত্রের অযোগ্যতা, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভৃতি কারণে তুর্কী সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল দুর্নীতিগ্রস্থ ও শাসকগণ ছিলেন সংস্কারবিমুখ। শাসন বিশৃঙ্খলার সুযোগে তুর্কী অভিজাতগণ ও প্রাদেশিক শাসকগণ ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি এমন শিথিল হইয়া পড়ে যে তুরস্ক "ইওরোপের রুগ্নব্যক্তি" (Sickman of Europe) আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। তুর্কী সাম্রাজ্যের এই ক্রমিক অবনতি ও দুর্বলতা প্রাচ্য বা নিকট প্রাচ্য সমস্যার অন্যতম কারণ।

প্রাচ্য সমস্যার বিশেষ কারণ

(১) তুর্কী সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবনতি

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতা স্পৃহা। ইওরোপের বল্কান অঞ্চল তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহা দানিউব ও ঈজিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী পর্বত্য

*"Roughly speaking the Eastern Question was what was to become of Turky ?"
—(Riker)

অঞ্চলকে বুঝায়। বল্কান ছিল বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র যথা—গ্রীক, সার্ব, বুলগার, আলবানীয় ইত্যাদি। বল্কানবাসীর অধিকাংশই ছিল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই ইসলাম ধর্মীয় তুরস্কের শাসকশ্রেণীর অত্যাচার ও ধর্মান্ধতা বল্কান-বাসীকে বিদিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। তুর্কী সাম্রাজ্যের ক্রমিক দুর্বলতার সুযোগে বল্কানের খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন নিকট প্রাচ্য সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বল্কানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল।

(২) বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতা স্পৃহা

তৃতীয়তঃ, বল্কানের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি। কৃষ্ণসাগর হইতে বহির্গত হইয়া দার্দানেলিশ প্রণালী বাহিয়া ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ভূখণ্ডে অধিকার স্থাপন করাই রুশ পররাষ্ট্র নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুর্কী সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও উহার খৃষ্টান প্রজাবর্গের গভীর অসন্তোষ রাশিয়ার এই পররা নীতিতে ইন্ধন যোগাইল উপরন্তু রুশেরা ও বল্কানের অধিবাসী শ্লাভেরা একই জাতি-গোষ্ঠীভুক্ত, একই ধর্মে বিশ্বাসী ও গ্রীক চার্চের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কারণে রাশিয়া বল্কান অঞ্চলের স্বাভাবিক অভিভাবকত্ব দাবি করে

(৩) রাশিয়ার অগ্রগতি

চতুর্থতঃ, তুরস্কে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বার্থ। বল্কান তথা তুরস্কের দিকে রাশিয়ার রাজ্য বিস্তার ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের স্বার্থের ঘোর পরিপন্থী ছিল। ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার প্রতিপত্তি স্থাপিত হইলে ইংল্যাণ্ডের ভারতীয় সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ইহা ছাড়া তুরস্কে রাশিয়ার প্রতিপত্তি স্থাপন এশিয়ায় ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের দিক দিয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। তুরস্কের সহিত অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত ছিল। দানিউব অঞ্চলের সহিত অষ্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক স্বার্থও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। ইহা ছাড়া বল্কান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রতিপত্তি স্থাপন অষ্ট্রিয়ার নিরাপত্তার দিক দিয়াও বিপজ্জনক ছিল। বহু জাতিগোষ্ঠী সমন্বয়ে গঠিত অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে শ্লাভগণ ছিল অন্যতম। রাশিয়া কর্তৃক প্রচারিত শ্লাভ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হইলে অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বিপন্ন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছিল। নিকট প্রাচ্যে ফ্রান্সের রাজনৈতিক স্বার্থ অপেক্ষা বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থই অধিক ছিল। তুর্কী সুলতানগণ তুরস্কে অবস্থিত ল্যাটিন চার্চগুলির অভিভাবকত্বের অধিকার ফ্রান্সকে দিয়াছিলেন। সুতরাং তুর্কী সাম্রাজ্যে রাশিয়ার প্রতিপত্তি স্থাপন ফ্রান্সের স্বার্থের বিরোধী ছিল।

(৪) তুরস্কে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ

ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ

অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ

ফ্রান্সের স্বার্থ

সুতরাং নিকট-প্রাচ্য সমস্যার প্রধান বিষয়বস্তু হইল তুরস্কের ক্রমিক অবনতি,

বল্কান জাতিগুলির স্বাধীনতা স্পৃহা, রাশিয়ার অগ্রসর নীতি এবং ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া কর্তৃক রাশিয়ার প্রতি বিরোধিতা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার উদ্ভব হয়, উনবিংশ শতাব্দীতে এই সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইহার সমাধান হয়।

উপসংহার

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বার্লিন সন্ধি (১৮৭৮) পর্যন্ত নিকট-প্রাচ্য সমস্যার ক্রম-বিকাশ

(Development of the Eastern Question from the mid 18th Century to the Treaty of Berlin)

রাশিয়ার জার পিটার-দি-গ্রেটই সর্ব প্রথম তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্দেশে কৃষ্ণসাগরের উপকূল পর্যন্ত রুশ-সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তুরস্কের সহিত রাশিয়ার সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় এবং ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে উভয় রাষ্ট্র প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। রাশিয়ার তুরস্ক-বিরোধী নীতির কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, তুর্কীরা ছিল রাশিয়ার প্রাচীন শত্রু তাতারদের বংশধর; দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া ছিল গ্রীক চার্চের পৃষ্ঠপোষক। এই কারণে রাশিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত গ্রীকচার্চের অনুগামী খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীগণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা স্বাভাবিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিত; তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক স্বার্থে কৃষ্ণসাগরের উপকূল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রতিপত্তি বিস্তারের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

রাশিয়া ও তুরস্ক (১৭৬৮-৭২)

রাশিয়ার তুর্কী বিরোধী নীতির কারণ

দ্বিতীয় ক্যাথারিন রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তুরস্ক সম্পর্কে রাশিয়ার প্রাচীন নীতি অনুসরণ করেন। ক্রিমিয়া জয় করিয়া কৃষ্ণসাগরে রুশ বাণিজ্য জাহাজের অবাধ চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখিবার সংকল্প ক্যাথারিন গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তুরস্কের সহিত যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্যাথারিন তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত মন্টিনিগ্রো ও বোসনিয়ার অধিবাসীগণকে তুরস্কের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে একদল রুশ সৈন্য তুর্কী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বাল্টা নামক শহরটি ভস্মীভূত করিয়া দেয়। এই অবস্থায় ফ্রান্সের প্ররোচনায় ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

রুশ-তুর্কী যুদ্ধ (১৭৬৮)

রাশিয়া ও তুরস্ক উভয়েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এই যুদ্ধে জার্মানীকে জড়াইবার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৭৬৯ হইতে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া মোলডাভিয়া, ওয়ালাকিয়া, বুখারেষ্ট, আজফ, ক্রিমিয়া প্রভৃতি স্থান দখল করিল। রাশিয়ার প্ররোচনায় গ্রীকগণ তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল।

রাশিয়ার ক্রমাগত সাফল্য

নিকট ও মধ্য প্রাচ্য
হাঙ্গারী
রুমানিয়া
যুগোস্লাভিয়া
ওডেসা
রস্টভ
বুখারেস্ট
বুলগেরিয়া
সোফিয়া
আলবানিয়া
কৃষ্ণ সাগর
ইস্তাম্বুল
এঙ্গোরা
স্মার্ণা
তুরস্ক
তিফলিস
অস্ট্রাখান
আরল সাগর
বলখাস হ্রদ
মঙ্গোলিয়া
তাসখন্দ
তুর্কমান
সমরকন্দ
মার্ভ
তাজিক
ইয়ারখন্দ
সিনকিয়াং
চীন
সাইপ্রাস
আলেপ্পো
তাব্রিজ
তেহরাণ
বীরুট
সিরিয়া
দামাস্কাস
জেরুজালেম
প্যালেস্টাইন
আলেকজান্দ্রিয়া
বাগদাদ
ইরাণ
হিরাট
কাবুল
আফগানিস্তান
তিব্বত
লাসা
কায়রো
ট্রান্স জর্ডান
ইরাক
বসরা
ইস্পাহান
লাহোর
লিবিয়া
আসিউট
মিশর
কোয়েটা
দিল্লী
নেপাল
ভুটান
গঙ্গা নদ
ব্রহ্মপুত্র নদ
বেলুচিস্তান
পারস্য উপসাগর
রিয়াধ
নেজদ
মক্কা
ওমান
মস্কট
করাচী
ভারতবর্ষ
কলিকাতা
মান্দালয়
ব্রহ্মদেশ
আমেদাবাদ
সুয়াকিন
লোহিত সাগর
ইঙ্গ মিশরীয়
দিউ (পর্তু:)
দমন (পর্তু:)
বোম্বাই
হায়দরাবাদ
ভিজাগাপটম
রেঙ্গুন
শ্যাম
ব্যাঙ্কক
আসির
খার্তুম
সুদান
এরিট্রিয়া
ইয়েমেন
এডেন
আরব সাগর
গোয়া (পর্তু:)
বঙ্গোপসাগর
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী (ফ:)
কারিকল (ফ:)
মাহে (ফ:)
সোমালিল্যাণ্ড (ফ:)
সকোত্রা
আদিসআবাবা
ইথিওপিয়া
0 400 ৮০০
মাইল
সোমালিল্যাণ্ড
সিংহল
কলম্বো
সুমাত্রা
মালয় (বৃ:)

রুশ-তুর্কী যুদ্ধে রাশিয়ার ক্রমাগত সাফল্যে অষ্ট্রিয়া ভীত হইয়া পড়িল। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া তুরস্কের সহিত একটি গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এ পর্যন্ত ফ্রেডারিক নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু রুশ-তুর্কী যুদ্ধ সম্প্রসারিত হইলে প্রাশিয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি এই যুদ্ধে মধ্যস্থতা করিলেন। অবশেষে কুসুক-কাইনারজি (Kutchuk-Kainardji)-র সন্ধি দ্বারা রুশ-তুর্কী যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সন্ধি দ্বারা তুরস্কের কিছু রাজ্যাংশ লাভ করা ছাড়াও রাশিয়া ভবিষ্যতে তুরস্কে গ্রীক ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া তুরস্কের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করার পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিল। এই সন্ধিকে নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের "নিকট-প্রাচ্যের রাজনৈতিক সংকটের সূচনামাত্র" বলিয়া অভিহিত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধির পর হইতেই তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে তুরস্কের শ্লাভ জাতির বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়।

কুসুক-কাইনারজির সন্ধি (১৭৭৪) ও ইহার গুরুত্ব

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করিয়া কন্‌স্টাণ্টিনোপল-এর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এইভাবে দ্বিতীয় রুশ-তুর্কী যুদ্ধ শুরু হইল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

দ্বিতীয় রুশ-তুর্কী যুদ্ধ (১৭৮৭-১৭৯২)

রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া কর্তৃক চতুর্দিক হইতে তুরস্ক আক্রান্ত হইলে তুরস্ক এক দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইল। ঠিক এই সময় ব্রিটেন, হল্যাণ্ড ও প্রাশিয়া যুগ্মভাবে তুরস্কের সাহায্যে অগ্রসর হইলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও প্রাশিয়ার মধ্যস্থতায় অষ্ট্রিয়া ও তুরস্কের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইংল্যাণ্ড ও প্রাশিয়ার চাপে রাশিয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত জ্যাসি-র সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। সুতরাং তুর্কীগণকে ইওরোপ হইতে বিতাড়িত করিয়া কন্‌স্টাণ্টিনোপল-এ একটি গ্রীক রাজ্য ও খৃষ্টান বল্কান রাজ্য স্থাপনের যে পরিকল্পনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

জ্যাসির সন্ধি (১৭৯২)

কিন্তু রাশিয়া ক্রমেই তুরস্কের রাজ্যাংশ গ্রাস করিয়া চলিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বুখারেষ্টের সন্ধি (Treaty of Bucharest) দ্বারা রাশিয়া তুরস্কের নিকট হইতে বেসারাবিয়া আদায় করিল।

বুখারেষ্টের সন্ধি ও রাশিয়ার লাভ

তুরস্কের দিকে রাশিয়ার ক্রমাগ্রগতি স্বভাবতঃই ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিল। কারণ তুরস্ক তথা পূর্বাঞ্চলের সহিত এই সকল ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। সুতরাং স্বার্থের খাতিরে ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ককে শক্তিশালী করিতে এবং

রাশিয়ার অগ্রগতিতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের আশঙ্কা

তুরস্কের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করিতে বদ্ধপরিকর হইল। ইংল্যাণ্ড ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিল।

১৮১৫ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার ক্রমবিকাশ

সার্বিয়ার আন্দোলন

ফরাসী বিপ্লবের ফলে বল্কান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের সুর ধ্বনিত হইতেছিল। তুর্কীর কুশাসন ও ধর্মোন্মত্ততার বিরুদ্ধে সার্বিয়ার বিদ্রোহ বল্কান অঞ্চলের প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলন সুরু হয়। প্রায় ১৩ বৎসর আন্দোলন চলিবার পর রাশিয়ার হস্তক্ষেপের ফলেই সার্বিয়া আংশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে।

গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বল্কান জাতিগুলির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ এক গৌরবময় অধ্যায়। তুর্কী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সর্বপ্রথম সার্বিয়ার অধিবাসীগণ বিদ্রোহী হইয়া কিছু শাসনতান্ত্রিক সুবিধা আদায় করিয়াছিল (১৮১৭ খৃঃ)। কিন্তু গ্রীকগণই সর্বপ্রথম তুরস্কের অধীনতা-পাশ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। তুর্কীর শাসনাধীনে গ্রীকগণ নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিত এবং উহাদের জাতীয় ও ধর্মীয় ঐক্য, ভাষা ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। তুর্কী সরকারের উদারনীতির ফলেই গ্রীকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইয়াছিল। ইহা ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে গ্রীকদের মধ্যে গ্রীসের প্রাচীন যুগের ঐতিহ্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ফরাসী বিপ্লব ইহাতে ইন্ধন যোগাইল। ফলে গ্রীকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের সৃষ্টি হইল।

গ্রীসে জাতিয়তাবাদের উন্মেষের কারণ

১৮২১ খৃষ্টাব্দে জানিনা (Janina) প্রদেশের তুর্কী শাসনকর্তা আলিপাশা তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ামাত্র গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হইল। প্রিন্স আলেকজাণ্ডার হিপ্‌সিল্যান্টি-র (Prince Hypsilanti) নেতৃত্বে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাকিয়ার গ্রীকগণ বিদ্রোহের প্রথম ধ্বজা উত্তোলন করিল। গ্রীকগণ রাশিয়ার সাহায্য আশা করিয়াছিল। কারণ গ্রীক ও রুশেরা উভয়েই ছিল গ্রীক চার্চের অনুগামী এবং তুরস্কের পতন রাশিয়ার একান্ত কাম্য ছিল। কিন্তু রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিকের প্রভাবাধীন থাকায় আলেকজাণ্ডার গ্রীকগণকে সাহায্য পাঠাইতে পারিলেন না। ফলে গ্রীকদের আন্দোলন দুর্বল হইয়া পড়িল এবং তুর্কী-বাহিনী অতি সহজেই বিদ্রোহ দমন করিল।

সংগ্রামের প্রথম পর্ব ও ব্যর্থতা

ইহার অল্পকাল পরেই দক্ষিণ গ্রীসের মোরিয়া নামক স্থানে গ্রীকগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইল। সর্বত্র মুসলমান নরনারীকে হত্যা করিয়া গ্রীকগণ উহাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক

সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করিল। ইহার প্রতিশোধে মুসলমানগণ ম্যাসিডোনিয়ার গ্রীকগণকে নির্বিচারে হত্যা করিতে লাগিল। ছয় বৎসর কাল এইভাবে উভয় পক্ষে মারাত্মক সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম ছয় বৎসর ইওরোপীয় শক্তিবর্গ নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া গ্রীক বিদ্রোহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। প্রাশিয়া এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিল। ইংল্যাণ্ডও গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্লিপ্ত রহিল, কারণ ইংল্যাণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্যের অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখিবার পক্ষপাতী ছিল। একমাত্র রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারই গ্রীকদের উপর তুর্কীদের নৃশংস অত্যাচারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তুর্কী সুলতানের নিকট একটি চরমপত্র প্রেরণ করিলে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যস্থতায় এই সম্ভাবনা দূর হইল এবং তুর্কী বাহিনী মোরিয়া পরিত্যাগ করিল।

গ্রীক-সংগ্রামের প্রতি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নির্লিপ্ততা

তুর্কী বাহিনী মোরিয়া পরিত্যাগ করিলেও মূল সমস্যার সমাধান হইল না। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীক স্বাধীনতা সংগ্রামের তৃতীয় পর্ব শুরু হইল। তুর্কী সুলতান মিশরের শাসনকর্তা মেহমেত আলির সাহায্যে গ্রীকগণকে দমন করিলেন। ফলে গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইল।

সংগ্রামের তৃতীয় পর্ব

এই নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে ইওরোপের সর্বত্র গ্রীকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হইল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে গ্রীকগণকে সাহায্য করার জন্য তুমুল উৎসাহ দেখা দিল। জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের পুত্র প্রথম নিকোলাস এই সময় রাশিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও গ্রীকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া লণ্ডনের চুক্তি নামে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া স্থির করিল যে প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ পূর্বক তুর্কী সুলতানকে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করা হইবে।

গ্রীসের প্রতি ইওরোপের সহানুভূতি

লণ্ডন চুক্তি (১৮২৭)

ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধজাহাজ ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিয়া তুর্কী নৌ-বহরকে বিধ্বস্ত করিল (১৮২৭ খৃঃ)। এদিকে ইংল্যাণ্ডে ক্যানিং-এর স্থলে ওয়েলিংটন মন্ত্রিত্ব লাভ করিলে ইংল্যাণ্ড তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করিয়া তুরস্কের সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিল। এই অবস্থায় রাশিয়া নিজ দায়িত্বে গ্রীকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তুরস্কের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। রুশবাহিনী মোলডাভিয়া ও ওয়ালাকিয়া দখল করিয়া দার্দানেলিশে প্রবেশ করিল। গ্রীস ও বল্কান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইবার আশঙ্কায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স

রাশিয়া কর্তৃক গ্রীকগণকে সাহায্য দান

পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করিল। তুর্কী সুলতান আড্রিয়ানোপল-এর সন্ধি (Treaty of Adrianople, 1829) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধি দ্বারা (১) তুরস্ক গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করিল, (২) রাশিয়ার রক্ষণাধীনে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাকিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিল এবং (৩) রাশিয়া তুর্কীসাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করিল।

গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসান ও আড্রিয়ানোপল-এর সন্ধি (১৮২৮)

মেহমেত আলি ও তুরস্ক ঃ তুরস্কের ভাগ্যবিপর্যয় তথা নিকট-প্রাচ্য সমস্যার অবসান হইল না। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে মিশরের শাসনকর্তা মেহমেত আলি তুরস্ক আক্রমণ করিয়া কনস্টান্টিনোপল দখল করার উপক্রম করিলেন। এই অবস্থায় তুর্কী সুলতান ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় তুরস্ক ও মেহমেত আলির মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল।

অল্প সময়ের মধ্যে তুর্কী সুলতান মেহমেত আলির নিকট হইতে সিরিয়া পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলে উভয়পক্ষে পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। পূর্বাঞ্চলে অধিকার বিস্তারের উদ্দেশ্যে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ মেহমেত আলির পক্ষ অবলম্বন করিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মেহমেত আলি ও ফ্রান্সের প্রভাব প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এক আন্তর্জাতিক বৈঠক আহ্বান করিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত লণ্ডনের সন্ধি (Treaty of London) অনুসারে মেহমেত আলি তুরস্ককে সিরিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন এবং যুদ্ধের সময় দার্দানেলিশ প্রণালীতে সকল রাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইল। মোট কথা, এই সন্ধি দ্বারা তুরস্কের নিরাপত্তার বিধান করা হইল; ফ্রান্সের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইল; তুরস্কে রাশিয়ার অগ্রগতি বাধা পাইল এবং পামারস্টোনের কূটনীতির জয় হইল।

লণ্ডন সন্ধিব ফলাফল

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ—১৮৫৪-৫৬ (The Crimean War) ঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিকট-প্রাচ্য সমস্যার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আপাত দৃষ্টিতে এই যুদ্ধ অতি সামান্য কারণে সংঘটিত হইয়াছিল। অর্থাৎ জেরুসালেমে অবস্থিত পবিত্র স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন লইয়া গ্রীক ও ল্যাটিন ধর্মযাজকগণের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ সংঘটিত হইয়াছিল বটে কিন্তু ইহার মূলে কতকগুলি প্রশ্ন নিহিত ছিল। গ্রীক ও ল্যাটিন ধর্ম যাজকগণের মধ্যে বিবাদ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের উপলক্ষ্য মাত্র। এই বিবাদের পশ্চাতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ জড়িত থাকায় অবশেষে এই সামান্য বিবাদ আন্তঃরাষ্ট্রিক যুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ধর্মের ভান, জাতীয় প্রতিযোগিতা

যুদ্ধের কারণ

জেরুসালেমের কর্তৃত্ব লইয়া গ্রীক ও ল্যাটিন যাজকদের মধ্যে বিবাদ

ও বাণিজ্য স্বার্থ তুর্কী সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করিয়া ইওরোপীয় রাজনীতিতে বিষাক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ফ্রান্সের দাবি

দীর্ঘকাল ধরিয়া ফ্রান্স ও তুরস্ক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জেরুসালেমের কয়েকটি পবিত্র স্থানের এবং উহার রোমান বা ল্যাটিন ধর্মযাজকগণের উপর অভিভাবকত্বের অধিকার ফ্রান্স তুরস্কের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্স এই বিষয়ে অমনোযোগী হওয়ায় পবিত্র স্থানগুলির কর্তৃত্বের অধিকার গ্রীক যাজকগণের হস্তে চলিয়া যায়। কিন্তু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন জেরুসালেমের ল্যাটিন ধর্মযাজকগণের উপর অভিভাবকত্বের দাবি করিলেন।* তৃতীয় নেপোলিয়নের দাবি ইওরোপের অন্যান্য ক্যাথলিক দেশগুলি—যথা, অষ্ট্রিয়া, স্পেন ও পর্তুগাল সমর্থন করিল। তুর্কী সুলতান ফ্রান্সের দাবি স্বীকার করিলেন।

রাশিয়ার দাবি

তুর্কী সুলতান ফ্রান্সের দাবি স্বীকার করিলে রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস জেরুসালেমের গ্রীক ধর্মযাজকগণের অধিকার মানিয়া লওয়ার জন্য এবং ফ্রান্সের অধুনাপ্রাপ্ত অধিকার বাতিল করার জন্য তুর্কী সুলতানের নিকট দাবি করিলেন।†

জার নিকোলাস ইংল্যাণ্ডের নিকট তুরস্ক বিভাগের প্রস্তাব করিলেন, কারণ জারের মতে তুরস্ক ছিল 'রুগ্নরাজ্য' (Sick man of Europe)। কিন্তু ইংল্যাণ্ড এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না কারণ নিকট-প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করাই ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল।

তুরস্কে রুশ আক্রমণ ও ভিয়েনা নোট

তুর্কী সুলতান রাশিয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করিলে রুশ বাহিনী তুরস্কে প্রবেশ করিল। রাশিয়ার অগ্রগতিতে আতঙ্কিত হইয়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া রাশিয়া ও তুরস্কের নিকট 'ভিয়েনা নোট' নামে এক প্রস্তাব পাঠাইল। এই প্রস্তাবে তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাবর্গকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইল। রাশিয়া ভিয়েনা নোটের প্রস্তাব গ্রহণ করিল কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিবর্গের হঠকারিতার

---

*তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য : তৃতীয় নেপোলিয়নের দাবির পশ্চাতে কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল—(১) ফ্রান্সের সিংহাসন সুরক্ষিত করার জন্য তিনি বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতির দ্বারা ফ্রান্স-বাসীকে চমৎকৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। (২) ফ্রান্সের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রীতি ও সমর্থন অর্জনের জন্য তিনি তুর্কী সুলতানের নিকট ল্যাটিন যাজকগণের অভিভাবকত্বের দাবি করিয়াছিলেন। (৩) জেরুসালেমের গ্রীক ও ল্যাটিন যাজকগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অজুহাতে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রথম নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা তৃতীয় নেপোলিয়নের মনে প্রবল ছিল।

†রাশিয়ার উদ্দেশ্য : (১) তুর্কী সুলতানের অধীনস্থ সমগ্র খৃষ্টান জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং (২) বসফোরাস ও দর্দানেলিশ প্রণালীর উপর রুশ অধিকার স্থাপন করা।

ফলে শান্তি প্রস্তাব ব্যর্থ হইল। ইংল্যাণ্ডের আচরণে উৎসাহিত হইয়া তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রাশিয়া কৃষ্ণসাগরে তুরস্কের নৌ-বহর ধ্বংস করিল। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও তুরস্ক যুগ্মভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এইভাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হইল (১৮৫৪ খৃঃ)।

তুর্কী-বাহিনী দানিউব অঞ্চলে আক্রমণ চালাইল। অপরদিকে রুশ নৌবহর সিনপ বন্দরে আক্রমণ চালাইয়া তুর্কী রণতরীগুলিকে ছত্রভঙ্গ করিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স একযোগে তুরস্কের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল। মিত্র-পক্ষ ক্রিমিয়ায় অবস্থিত রাশিয়ার অন্যতম ঘাঁটি সিবাস্তোপোল আক্রমণ করিল। মিত্রপক্ষ সিবাস্তোপোল দখল করিয়া বালাক্লাভার যুদ্ধে রুশবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিল। ইতিমধ্যে জার প্রথম নিকোলাস পরলোক গমন করিলে (১৮৫৫ খৃঃ) শান্তির প্রস্তাব উত্থাপিত হইল।

যুদ্ধের প্রধান ঘটনা

অবশেষে প্যারিসের সন্ধি (Peace of Paris) দ্বারা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হইল। ইহার শর্তানুসারে (১) রাশিয়া মোলডাভিয়া ও ওয়ালাকিয়া পরিত্যাগ করিল, (২) রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের খৃষ্টান প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের দাবি পরিত্যাগ করিল, (৩) কৃষ্ণ-সাগর নিরপেক্ষ এলাকা বলিয়া ঘোষিত হইল এবং (৪) ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্স তুরস্কের স্বাধীনতা ও ভৌমিক অখণ্ডতা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল।

প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬)

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলাফল (Results of the Crimean War): ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে (১) কিছুদিনের জন্য তুরস্কের উপর রাশিয়ার পরিকল্পনা প্রতিহত হইল এবং রাশিয়া তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাবর্গের রক্ষণের দাবি পরিত্যাগ করিল। (২) ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের প্রচেষ্টায় ভগ্নপ্রায় তুরস্ক সাম্রাজ্য নবজীবন লাভ করিল এবং তুর্কী সুলতান ইওরোপীয় সংঘের সদস্যরূপে প্রবেশাধিকার পাইলেন। (৩) ইংল্যাণ্ডের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পাইল এবং অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার শত্রুতা লাভ করিল। (৪) ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অন্যতম পরোক্ষ ফল হইল সার্ডিনিয়া-পীয়েডমণ্টের নেতৃত্বে ইটালীর স্বাধীনতার সুযোগলাভ এবং ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ইটালীর সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হইল। (৫) এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার রুশ-বিরোধী নিরপেক্ষতা রাশিয়া ভুলিতে পারে নাই। অষ্ট্রিয়ার ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া রাশিয়া প্রাশিয়ার প্রতি ঝুঁকিল। (৬) ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে জারের প্রতি রুশ জনসাধারণের শ্রদ্ধা হ্রাস পাইল এবং প্রকাশ্যে জার-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইল।

প্রত্যক্ষ ফল

পরোক্ষ ফল

প্যারিসের সন্ধি অনুসারে তুর্কী সুলতান তাঁহার সাম্রাজ্যে সংস্কার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি তাহা পালন করিতে অবহেলা করিলে বল্কান জাতিগুলির মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

১৮৫৬ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিকট-প্রাচ্য সমস্যার ক্রমবিকাশ

দানিউব নদীর উপকূলে অবস্থিত মোলডাভিয়া ও ওয়ালাকিয়া প্রদেশ দুইটিতে গণ-আন্দোলন শুরু হইলে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। উভয় প্রদেশের জনসাধারণ পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিল। ফ্রান্স ও রাশিয়া এই দাবি সমর্থন করিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ড এই গণ-আন্দোলনের বিরোধিতা করিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উভয় প্রদেশের জনসাধারণ একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। এই নূতন রাষ্ট্রের নামকরণ হইল রুমানিয়া। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ এই নূতন রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইল।

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাকিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাকিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যে বল্কান অঞ্চলের অন্যান্য জাতিগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিল। সার্বিয়া, গ্রীস, মোলডাভিয়া ও ওয়ালাকিয়ার পর তুর্কী-বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হইল বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার অধিবাসীগণ বিদ্রোহী হইল। রাশিয়া তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাবর্গের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল। ইহার ফলে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ শুরু হইল (১৮৭৭ খৃঃ)। তুর্কীগণ পরাজিত হইয়া সানষ্টিফানো (San-Stefano) নামক সন্ধি স্বাক্ষর করিল। এই সন্ধি দ্বারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হইল এবং বল্কান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল।

বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার স্বাধীনতা আন্দোলন
রুশ-তুর্কী যুদ্ধ
সানষ্টিফানোর সন্ধি (১৮৭৭)

সানষ্টিফানোর সন্ধি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তিগুলির মনঃপূত হইল না। ইহারা দাবি করিল যে যেহেতু নিকট-প্রাচ্য সমস্যা ইওরোপের আন্তঃরাষ্ট্রিক সমস্যা সেইহেতু রাশিয়া এককভাবে নিকট-প্রাচ্যের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করিতে পারে না। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ সানষ্টিফানোর সন্ধি পুনর্বিবেচনা করবার দাবি করিলে রাশিয়া তাহাতে সম্মত হইতে বাধ্য হইল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর চ্যান্সেলার বিসমার্কের সভাপতিত্বে বার্লিনে এক বৈঠক আহূত হইল। বহু আলাপ আলোচনার পর বার্লিন সন্ধি (Treaty of Berlin 1878) স্বাক্ষরিত হইল। বার্লিন সন্ধির শর্তানুসারে (১) মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া ও রুমানিয়া তুরস্কের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইল, (২) রাশিয়া বেসারাবিয়া, বাটুম, ফার্স ও আর্মেনিয়ার কিছু অংশ লাভ করিল, (৩) সাইপ্রাস দ্বীপের শাসনভার ইংল্যাণ্ডের হস্তে অর্পিত হইল এবং (৪) ভবিষ্যতে টিউনিস (Tunis) অধিকার করার অনুমতি ফ্রান্সকে দেওয়া হইল।

রাশিয়ার প্রতি ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের বিরোধিতা

বার্লিন সন্ধি (১৮৭৮)

বার্লিন সন্ধি দ্বারাও নিকট প্রাচ্য সমস্যার সমাধান হইল না। অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও ব্রিটেনের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের জন্যই বল্কান অঞ্চলের সমস্যা বহুদিন পর্যন্ত সমাধান করা সম্ভবপর হয় নাই। এই কারণে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে প্রথম

বার্লিনের সন্ধি হইতে বুখারেষ্টের সন্ধি পর্যন্ত নিকট-প্রাচ্য সমস্যার ক্রমবিকাশ

বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বল্কান ইওরোপের ঝটিকা কেন্দ্র (Storm centre) হইয়া রহিল।

বার্লিন সন্ধির পর নিকট প্রাচ্যের ইতিহাসে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—(১) বুলগেরিয়াই সর্বপ্রথম বার্লিন সন্ধির বিরোধিতা করিল।

রুমানিয়ার সহিত বুলগেরিয়ার মিলন (১৮৮৬)

বার্লিন সন্ধি অনুসারে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়াকে স্বতন্ত্র দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এই ব্যবচ্ছেদ ছিল কৃত্রিম। সুতরাং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ প্রিন্স আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া একটি অখণ্ড রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিল। ইংল্যাণ্ড এই মিলন স্বীকার করিয়া লইলে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কী সুলতানও ইহা স্বীকার করিলেন।

(২) কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত আর্মেনিয়া ছিল তুরস্কের অধিকারভুক্ত। বার্লিন সন্ধি অনুসারে তুর্কী সুলতান আর্মেনিয়ায় সংস্কার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সুলতান সেই প্রতিশ্রুতি পালনে অবহেলা করিলে আর্মেনিয়ানগণ বিদ্রোহী হইল। কিন্তু তুর্কী সুলতান কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন।

আর্মেনিয়ার বিদ্রোহ (১৮৯৪-'৯৬)

(৩) ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গ্রীকগণ স্বাধীনতা লাভ করিলেও গ্রীক-ভাষী ক্রীট, থেসালী, এপিরাস ও ম্যাসিডনিয়া প্রভৃতি অঞ্চল গ্রীকরাষ্ট্রের বহির্ভূত ছিল। বার্লিন সন্ধি গ্রীসবাসীকে হতাশ করিয়াছিল। সুতরাং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গ্রীস তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করিল। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের মধ্যস্থতায় তুর্কী সুলতান থেসালী ও এপিরাসের কতকাংশ গ্রীসকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু গ্রীকগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ক্রীটের অধিবাসীগণ স্বেচ্ছায় গ্রীসের সহিত উহাদের অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করিলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইওরোপের রাষ্ট্রবর্গের মধ্যস্থতায় ক্রীটকে স্বয়ং-শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করা হইল। কিন্তু ক্রীটের অধিবাসীগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক যখন বল্কান যুদ্ধে ব্যস্ত সেই সময় গ্রীস সুযোগ বুঝিয়া ক্রীট দখল করিয়া লইল।

গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৯৭)

(৪) ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা এক নূতন পর্যায়ে এবং নূতনভাবে দেখা দিল। ইতিমধ্যে তুরস্কে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত তুর্কী যুবকদের পরিচালনায় একটি সংস্কারপন্থী দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই আন্দোলন তরুণ তুর্কী-আন্দোলন (Young Turk Movement) নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল—(১) আধুনিকভাবে তুরস্ককে গড়িয়া তোলা, (২) বৈদেশিক শক্তির প্রভাব হইতে তুরস্ককে মুক্ত করা এবং (৩) গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে তুরস্কের শাসনতন্ত্র রচনা করা।

তরুণ তুর্কী আন্দোলন (১৯০৮-'৯)

তুর্কী সাম্রাজ্যে নব চেতনার সূচনা দেখিয়া ইওরোপীয় শক্তিগুলি অস্বস্তিবোধ করিল এবং অপরদিকে বার্লিন সন্ধির শর্তাবলীও লঙ্ঘিত হইতে লাগিল। বুলগেরিয়া তুরস্কের অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। অষ্ট্রিয়া বর্লিন্ সন্ধি অমান্য করিয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা দখল করিল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার আচরণ সহ্য করিল। কিন্তু এই ব্যাপারে সর্বাধিক রুষ্ট হইল সার্বিয়া। ভাষা, ঐতিহ্য ও জাতিগোষ্ঠীর দিক দিয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা প্রদেশদ্বয়ের উপর অষ্ট্রিয়া অপেক্ষা সার্বিয়ার দাবি অধিক ছিল। এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে অষ্ট্রিয়া-সার্বিয়ার সংঘর্ষ হইতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম স্ফুলিঙ্গ উদ্ভূত হইয়াছিল।

বার্লিন সন্ধির উল্লঙ্ঘন

তরুণ তুর্কীদলের নেতৃবর্গ গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল 'তুরস্কীকরণ নীতি' (Turkification) অনুসরণ করিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উপর একাধিপত্য স্থাপন করা। তুরস্কীকরণ নীতির নামে প্রথমেই ম্যাসিডনিয়া ও আলবেনিয়ার খৃষ্টান অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হইল।

প্রথম বল্কান যুদ্ধ (১৯১১)

তুরস্কের অত্যাচার নিবারণ করার অভিপ্রায়ে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রীস ও বুলগেরিয়া বল্কানের এই চারিটি রাষ্ট্র 'বল্কান-লীগ' (Balkan League) নামে এক সংঘের প্রতিষ্ঠা করিল। তুর্কী সুলতান ম্যাসিডনিয়ার খৃষ্টান প্রজাবর্গের উপর অত্যাচারের অবসান করিয়া তথায় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করিতে অসম্মত হইলে বল্কান লীগ সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধ প্রথম বল্কান যুদ্ধ নামে পরিচিত। তুর্কী বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল এবং একমাত্র কনস্টান্টিনোপল ভিন্ন তুরস্ক সাম্রাজ্যের আর সকল অংশই বল্কান লীগের অধিকারভুক্ত হইল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের সন্ধি অনুসারে প্রথম বল্কান যুদ্ধের অবসান হইল। এই সন্ধি দ্বারা (১) তুরস্ককে একমাত্র কনস্টান্টিনোপল ছাড়া আর সবই হারাইতে হইল, (২) অষ্ট্রিয়ার বিশেষ আগ্রহে সার্বিয়ার ক্ষমতা খর্ব করার জন্য আলবেনিয়াকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হইল।

তুরস্কের পরাজয়ের পর বল্কান অঞ্চলের ভাগ বণ্টন লইয়া বল্কান লীগের সদস্যদের মধ্যে বিবাদ শুরু হইল এবং এই বিবাদের পরিণতি হইল দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ। ম্যাসিডনিয়ার ব্যাপার লইয়া বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইল। সার্বিয়া ম্যাসিডনিয়ার দাবি পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে বুলগেরিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করিল। ফলে দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ শুরু হইল। গ্রীস ও রুমানিয়া সার্বিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিল। বল্কানের এই অন্তর্বিবাদের সুযোগ লইয়া তুরস্ক বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। বুলগেরিয়া পরাজিত হইল। বুখারেষ্টের সন্ধি (Treaty of Bucharest) দ্বারা বুলগেরিয়া গ্রীস ও সার্বিয়াকে

দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ (১৯১৩)

বুখারেষ্টের সন্ধি (১৯১৩)
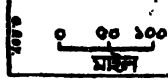
রাশিয়া
অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী
মোলডাভিয়া
বেসারাবিয়া
ওয়ালাচিয়া
দবরুদজা
দানিয়ুব নং
বোসনিয়া
সার্বিয়া
বুলগেরিয়া
মণ্টিনিগ্রো
পূর্ব রুমেলিয়া
আলবানিয়া
ম্যাসিডোনিয়া
ইতালি
গ্রীস
ভূমধ্য
সাগর
বলকান রাজ্যসমূহ
বুলগেরিয়া (সান ষ্টিফানোর সন্ধি)
বার্লিনের চুক্তি (১৮৭৮) :
সার্বিয়ার সহিত সংযুক্ত
রুমানিয়ার সহিত সংযুক্ত
রুমানিয়া হইতে রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত
মাইল

ম্যাসিডনিয়ার বৃহৎ অংশ ছাড়িয়া দিল এবং তুরস্ক আদ্রিয়ানোপল ও এথেন্সের কিছু অংশ ফিরিয়া পাইল।

দুই বল্কান যুদ্ধের ফলে (১) ইওরোপে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিল, (২) সার্বিয়া ও গ্রীস সর্বাপেক্ষা লাভবান হইল, (৩) তুরস্কের স্থলে রাশিয়া বল্কানের রক্ষক হিসাবে আবির্ভূত হইল (৪) সার্বিয়ার রাজ্যলাভ অষ্ট্রিয়াকে বিরূপ করিল, (৫) তুরস্ক ও বুলগেরিয়া দুর্বল হইয়া পড়ায় উহারা যথাক্রমে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইল। অপরদিকে রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্র সার্বিয়া বল্কানে সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। সুতরাং একদিকে সার্বিয়া ও অষ্ট্রিয়া এবং অপরদিকে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া এই পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইন্ধন যোগাইতে সাহায্য করিয়াছিল।

বল্কান যুদ্ধের ফলাফল

সংক্ষিপ্তসার

প্রাচ্য বা নিকট-প্রাচ্য সমস্যা কি ? সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবনতি ও অভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা, তুরস্ক সাম্রাজ্যের রাজ্যাংশ লাভ করিতে প্রতিবেশী ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের আগ্রহ এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি কারণ হইতে ইওরোপ ও নিকট-প্রাচ্যের রাজনীতিতে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় তাহা প্রাচ্য বা নিকট-প্রাচ্য সমস্যা নামে অভিহিত।

নিকট-প্রাচ্য সমস্যার কারণ : তুর্কী সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবনতি, উহার সামরিক ও প্রশাসনী দুর্বলতা, তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বাধীনতা স্পৃহা, নিকট প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি এবং ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের পরস্পরিক স্বার্থ সংঘাত এই সমস্যার প্রধান কারণ।

বার্লিন সন্ধি পর্যন্ত নিকট-প্রাচ্য সমস্যার ক্রমবিকাশ : দ্বিতীয় ক্যাথারিন সিংহাসনে আরোহন করার সময় হইতে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক কারণে তুরস্ক সাম্রাজ্যে রাশিয়ার প্রতিপত্তি স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে রাশিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত মণ্টিনিগ্রো ও বোসনিয়ার অধিবাসীগণকে তুরস্কের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকিলে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মধ্যস্থতায় কুচুক-কাইনারজির সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধিকে পরবর্তী কালের "নিকট-প্রাচ্যের রাজনৈতিক সংকটের সূচনামাত্র" বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই সন্ধির পর হইতেই তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে তুরস্কের স্লাভজাতির বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া কনস্টান্টিনোপল-এর দিকে অগ্রসর হইলে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও প্রাশিয়ার মধ্যস্থতায় জ্যাসিনা-র সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে বলকান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠে। বল্কান জাতিগুলির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ এক গৌরবময় অধ্যায়। গ্রীস রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। ১৮২১ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলন চলে। অবশেষে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যস্থতায় আদ্রিয়ানোপল-এর সন্ধি দ্বারা গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধের অবসান হয় এবং তুরস্ক গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করে।

১৮৫৪-৫৬ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিকট-প্রাচ্য সমস্যার অপর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জেরুসালেমের কর্তৃত্ব লইয়া গ্রীক ও ল্যাটিন ধর্মযাজকদের মধ্যে বিবাদ এবং এই বিবাদে রাশিয়া ও ফ্রান্সের পরস্পর-বিরোধী দাবি ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ। ফ্রান্সের দাবি তুর্কী-সুলতান কর্তৃক স্বীকৃত

এবং রাশিয়ার দাবি অস্বীকৃত হইলে রুশ-বাহিনী তুরস্ক আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করে। প্যারিসের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়।

প্যারিসের সন্ধি অনুসারে তুর্কী-সুলতান তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন না করিলে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত মোলডাভিয়া, ওয়ালাকিয়া, বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। রাশিয়া তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাবর্গের সাহায্যে অগ্রসর হইলে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৭৫)। সানষ্টিফানোর সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধি দ্বারা রাশিয়া লাভবান* হয় এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের ধ্বংস সুনিশ্চিত হয়। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ সানষ্টিফানোর সন্ধির পুনর্বিবেচনার দাবি করিলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন বৈঠক আহুত হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

বার্লিন সন্ধির পর নিকট প্রাচ্যের ইতিহাসে রুমানিয়ার সহিত বুলগেরিয়ার মিলন, আর্মেনিয়ার বিদ্রোহ, গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৯৭), তরুণ-তুর্কী আন্দোলন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বুখারেষ্টের সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের অবসান হয়।

প্রশ্নমালা

১। প্রাচ্য সমস্যা বলিতে কি বোঝ। এই সমস্যার কি কি কারণ ছিল?

[Define Eastorn Question. What were the caurses of the Eastern Question ?]

উঃ ১২৭-১৩০ পৃঃ দেখ

২। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বার্লিন-সন্ধি পর্যন্ত প্রাচ্য সমস্যার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

[Give a connecting account of the Eastern Question from the mid 18th century to Treaty of Berlin.] উঃ ১৩০-১৩৮ পৃঃ দেখ

৩। বার্লিন সন্ধি হইতে বুখারেষ্টের সন্ধি পর্যন্ত প্রাচ্য সমস্যার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

[Trace the development of the Eastern Question form the Treaty of Berlin to the Treaty of Bucharest.] উঃ ১৩৮-১৪১ পৃঃ দেখ

৪। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

[Describe the Causes and results of the Crimean war.] উঃ ১৩৫-১৩৭ পৃঃ দেখ

৫। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হইতে বার্লিন সন্ধি পর্যন্ত রুশ-তুর্কী সংঘর্ষের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

[Write a short account of the Russo-Turkish Conflict from the Crimean war to the Treaty of Berlin.] উঃ ১৩৫-১৩৮ পৃঃ দেখ

সপ্তম অধ্যায়

ইওরোপ ১৮৭৮—১৯১৪

(Europe 1878—1914)

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন সন্ধি সম্পাদিত হইলে ইওরোপীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের অবসান হইল। ১৮১৫ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগকে ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগ বলা হইয়া থাকে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফরাসী বিপ্লব প্রসূত উদারনৈতিক মতবাদ ও জাতীয়তাবাদ অধিকাংশ অঞ্চলেই জয়যুক্ত হইল। ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক রচিত ইওরোপের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল এবং এক নূতন আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া ইওরোপ পুনর্গঠিত

(১) সশস্ত্র শান্তির যুগ

হইল। জার্মানী ও ইটালীর অভ্যুত্থান ইওরোপের ভারসাম্য (balance of power) বজায় রহিল। উদারনৈতিক মতবাদ ও জাতীয়তাবাদ জয়যুক্ত হইলে ইওরোপবাসী অতঃপর বৃহত্তর বিশ্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক আদর্শ পক্ষান্তরে সর্বত্র নূতন সমস্যা ও নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিল।

ইওরোপের ইতিহাসে ১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগকে 'সশস্ত্র শান্তির যুগ' (Era of Armed Peace বলা হইয়া থাকে। প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল ইওরোপের আন্তর্জাতিক শান্তি মোটামুটি ভাবে বিরাজিত ছিল। পশ্চিম ইওরোপে ফ্রাঙ্কফার্টের সন্ধি (১৮৭১ খৃঃ) হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪খৃঃ) এবং পূর্বাঞ্চলে বার্লিন-সন্ধি (১৮৭৮ খৃঃ) হইতে বল্কান যুদ্ধ (১৯১৩ খৃঃ) পর্যন্ত শান্তি বজায় ছিল।

১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইওরোপে শান্তি অব্যাহত থাকিলেও এই সময়ের মধ্যে ইওরোপে যে স্বার্থপর ও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ দেখা দিয়াছিল তাহারই চরম পরিণতি হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইওরোপে শান্তি অব্যাহত থাকিলেও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইওরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে এমনভাবে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে যেকোন মুহূর্তে এই শান্তি ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

(২) আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র জোটের সৃষ্টি

১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইওরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে বিসমার্ক তথা জার্মানীর আধিপত্য বজায় ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্ক সমর-নীতি অনুসরণ করিয়া জার্মানীর ঐক্যবন্ধন সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি শান্তির নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে জার্মানীর অভীষ্ঠ সিদ্ধ হইয়াছে ('Germany is a satiated country')। সুতরাং জার্মানীর নূতন রাজ্য বিস্তারের আর প্রয়োজন নাই। জার্মানীর সামরিক শক্তি ও রাজ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই দিকেই বিসমার্ক অতঃপর মনোযোগী হইলেন। ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তিনি জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে ও ইওরোপের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইলেন।

ইওরোপে বিসমার্ক তথা জার্মানীর আধিপত্য

১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল (১) জার্মানীর জাতীয় সংহতি রক্ষার্থে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখা এবং (২) পরাজিত ফ্রান্সের প্রতিশোধাত্মক মনোভাব ও জার্মানীর উপর উহার সম্ভাবিত আক্রমণ হইতে জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষার্থে ফ্রান্সকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা যাহাতে ফ্রান্স ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের গ্লানির প্রতিশোধ লইতে না পারে। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী এবং ফ্রান্স ও রাশিয়া—ইহাদের মধ্যে যাহাতে কোনরূপ সদ্ভাব স্থাপিত না হয় সেইদিকে বিসমার্ক সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিলেন। অপর

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য

দিকে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যেও যাহাতে সম্পর্ক না গড়িয়া উঠিতে পারে সেদিকেও তিনি লক্ষ্য রাখিলেন।

ফ্রান্সের নিকট হইতে আলসাস-লোরেন প্রদেশদ্বয় জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করায় ফরাসী জাতির মর্যাদা যে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল—বিসমার্ক তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং ফ্রান্স যে ইহার প্রতিশোধ লইবে তাহাও বিসমার্ক জানিতেন। সুতরাং কূটনৈতিকভাবে ফ্রান্সকে অন্যান্য রাষ্ট্রের মিত্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে তিনি সচেষ্ট হইলেন। বিসমার্ক প্রথমে অষ্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। স্যাডোয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয় হওয়ার পর হইতে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। বল্কান অঞ্চলে রাশিয়াকে প্রতিরোধ করার জন্য অষ্ট্রিয়ার পক্ষেও এক শক্তিশালী মিত্রের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং বিসমার্কের চেষ্টায় জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপিত হইল। অতঃপর তিনি রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। জার্মানীর সহিত রাশিয়ার স্বার্থ সংঘাতের কোন সম্ভাবনা না থাকায় বিসমার্ককে এই বিষয়ে বেগ পাইতে হয় নাই। উপরন্তু পোলিশ বিদ্রোহের সময় প্রাশিয়ার সাহায্যে রাশিয়া বিস্মৃত হয় নাই এবং জার্মানীর সমর্থনে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময় রাশিয়া প্যারিস সন্ধি লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণসাগরে স্বীয় প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সুতরাং পূর্ব হইতেই এই দুই দেশ মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বার্লিনে সফর করিতে আসিলে বিসমার্ক সেই সুযোগে অষ্ট্রিয়া, জার্মানী ও রাশিয়া---এই তিনটি রাষ্ট্রের নরপতিগণের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। ইহা 'Dreikaiserbund' বা 'ত্রি-সম্রাট সঙ্ঘ' নামে খ্যাত। এই চুক্তি কোন লিখিত চুক্তি নহে, তিন সম্রাটের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া মাত্র। বল্কান অঞ্চলে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে স্বার্থের প্রকাশ্য সংঘাত উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি জার্মান কূটনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল। সম্রাটত্রয় পারস্পরিক সাম্রাজ্যিক অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিতে, পারস্পরিক স্বার্থ বজায় রাখিয়া নিকট প্রাচ্যের সমস্যা সমাধান করিতে এবং স্ব স্ব রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

বিসমার্ক কর্তৃক অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন ও রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব

ত্রি-সম্রাট সঙ্ঘ ও ইহার (১৮৭২)

কিন্তু শীঘ্রই বল্কান অঞ্চলের ব্যাপার লইয়া জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে মতানৈক্য ঘটিল। রাশিয়ার বন্ধুত্বের উপর বিসমার্কের আস্থা কমিতে লাগিল। এই অবস্থায় বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা আরও দৃঢ় করিতে চাহিলেন এবং তাঁহার সুযোগও আসিল। বার্লিন কংগ্রেসে (১৮৭৮ খৃঃ) বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার পক্ষ সমর্থন করিয়া সানষ্টিফানোর সন্ধি পুনর্বিবেচনার দাবি করিলেন। রাশিয়া বিসমার্কের এই পক্ষপাতিত্বে রুষ্ট হইয়া 'ত্রি-সম্রাট সঙ্ঘ' পরিত্যাগ করিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার জন্য বিসমার্ক

বার্লিন কংগ্রেসের পর ত্রি-সম্রাট সঙ্ঘের অবসান ও অষ্ট্রিয়ার সহিত দ্বৈত-সন্ধি (১৮৭৯)

অষ্ট্রিয়ার সহিত এক Dual Alliance বা দ্বৈত-সন্ধি সম্পাদন করেন। এই সন্ধি দ্বারা স্থির হইল যে রাষ্ট্র দুইটির মধ্যে যে কোনও একটি তৃতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর রাষ্ট্র তাহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে। অর্থাৎ রাশিয়া ও ফ্রান্সের আক্রমণ প্রতিহত করাই এই সন্ধির মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই সন্ধি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল।

এই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া বিসমার্ক পুনরায় রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নূতন এক সন্ধিপত্র দ্বারা ত্রি-সম্রাট সঙ্ঘকে (Dreikaiserbund) পুনরুজ্জীবিত করা হইল। এই সন্ধি দ্বারা রাশিয়া বল্কান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়ার 'বিশেষ-স্বার্থ' স্বীকার করিল; ইহার বিনিময়ে রাশিয়ার প্রস্তাবক্রমে সঙ্ঘের অপর দুই সদস্য বুলগেরিয়ার সহিত পূর্ব-রুমানিয়ার সংযুক্তি স্বীকার করিল এবং সঙ্ঘের তিনটি রাষ্ট্রই যুদ্ধের সময় কনস্টান্টিনোপল-এর প্রণালী রুদ্ধ রাখার জন্য তুরস্ককে বাধ্য করিতে স্বীকৃত হইল। বিসমার্কের উদ্দেশ্য সাধনে 'ত্রি-সম্রাট-সঙ্ঘ' বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। যখনই অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল তখনই বিসমার্ক তাহাদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিসমার্ক জার্মানীর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলেন।

পুনরায় ত্রি-সম্রাট সঙ্ঘ (১৮৮১)

অতঃপর বিসমার্ক ইটালীকেও তাঁহার দলে টানিতে সচেষ্ট হইলেন। ইটালীর জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ হইলেও তথায় ফ্রান্সের সাহায্যে পোপের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিল। এই সময় উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত টিউনিসে (Tunis) উপনিবেশ স্থাপন লইয়া ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিসমার্কের সমর্থনে উৎসাহিত হইয়া ফ্রান্স টিউনিস অধিকার করিল। বিসমার্কের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করা। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল হইল। ফ্রান্সের ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া ইটালী জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর দলে যোগদান করিল। দ্বৈত সন্ধি (Dual Alliance) অতঃপর ত্রি-শক্তি মৈত্রীতে (Triple Alliance) পরিণত হইল। ইটালীর নিকট হইতে ফ্রান্সের সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা আর রহিল না।

ইটালির সহিত সন্ধি (১৮৮২)

অতঃপর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কূটনীতিজ্ঞ বিসমার্কের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে রাশিয়াকে দূরে রাখিলে হয়ত বা রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইতে পরে। ইহা চিন্তা করিয়া ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ার সহিত পৃথক্‌ভাবে সদ্ভাবমূলক সন্ধি স্থাপন করিলেন। ইহা 'রি-ইন্সুরেন্স সন্ধি' (Reinsurance Treaty) নামে খ্যাত। এই সন্ধি দ্বারা স্থির হইল যে (১) চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে কোনও একটি রাষ্ট্র তৃতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর রাষ্ট্র নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে, (২) জার্মানী বল্কান অঞ্চলে রাশিয়ার 'বিশেষ স্বার্থ' স্বীকার করিবে এবং (৩) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্থিরীকৃত কনস্টান্টিনোপল প্রণালী সম্পর্কিত ব্যবস্থা উভয় রাষ্ট্র বজায় রাখিবে।

রাশিয়ার সহিত পৃথক সন্ধি (১৮৮৭)

ইউরোপ
১৯১৪
০ ৪০০ ৮০০
কিলোমিটার
আটলাণ্টিক মহাসাগর
আফ্রিকা
রাশিয়া
জার্মানি
ফ্রান্স
স্পেন
অস্ট্রিয়া হাঙ্গারী
কৃষ্ণ সাগর
ক্যাস্পিয়ান সাগর
ভূমধ্য সাগর
আয়ারল্যাণ্ড
ডাবলিন
বেলফাস্ট
লিভারপুল
ম্যাঞ্চেস্টার
লণ্ডন
ডেনমার্ক
কোপেনহেগেন
অসলো
স্টকহলম
হেলসিংকি
সেণ্ট পিটার্সবার্গ
রিগা
ভিলনা
মস্কো
নিজনি নোভগোরড
কাজান
কিরভ
কুর্স্ক
খারকভ
রস্টভ
অস্ট্রাখান
ওডেসা
খারসন
বার্লিন
ওয়ারস
ডানজিগ
বেলজিয়াম
প্যারিস
অর্লিয়ান্স
বোর্দো
মার্সাই
বার্সিলোনা
মাদ্রিদ
লিসবন
ওপোর্টো
জিব্রাল্টার
ভালেন্সিয়া
কর্সিকা
সার্দিনিয়া
সিসিলি
মাল্টা
রোম
জেনোয়া
ভেনিস
ট্রিস্ট
বুডাপেস্ট
বুখারেস্ট
বেলগ্রেড
সারাজেভো
সোফিয়া
মণ্টিনিগ্রো
কনস্টাণ্টিনোপল
এথেন্স
ক্রীট
রোডস
সাইপ্রাস
দানিয়ুব নং
দ্নীপার নং
ডন নং
ভলগা নং
লয়ার নং
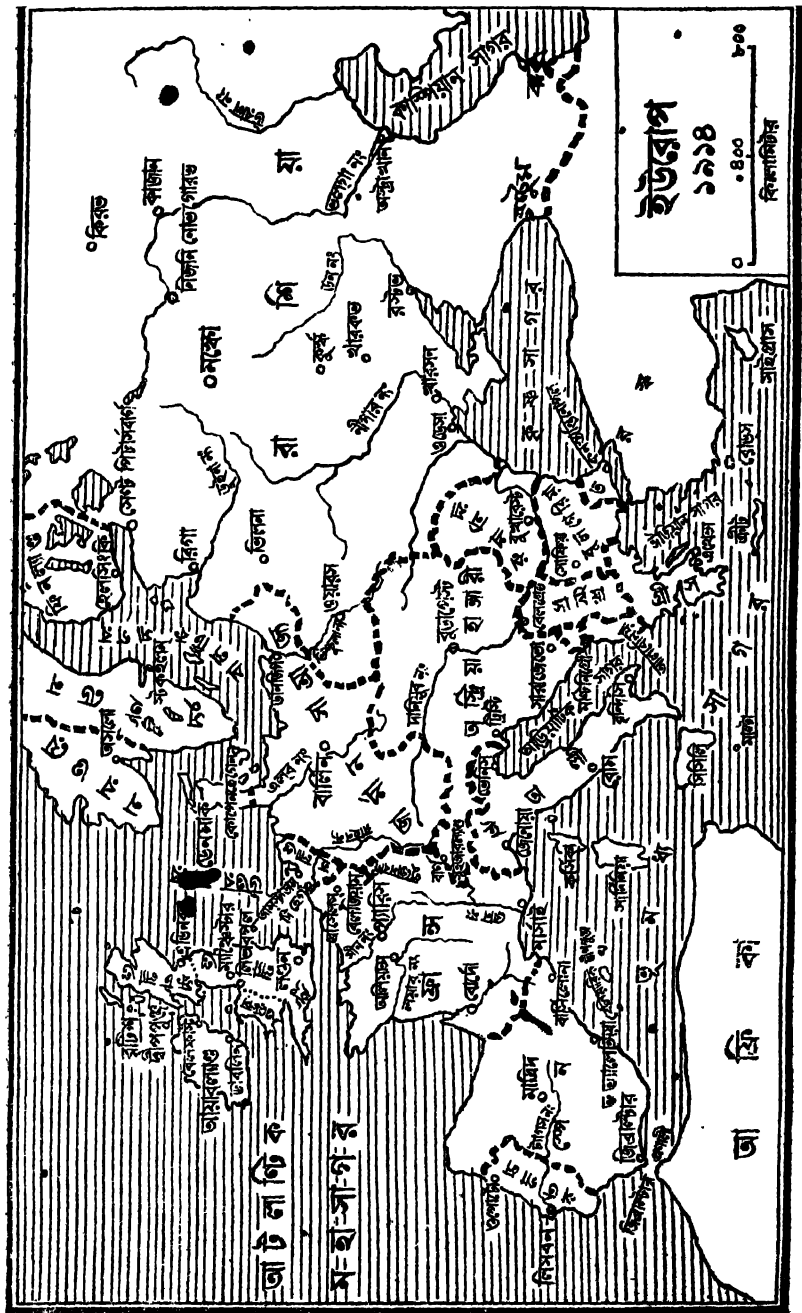
ফ্রান্স যাহাতে ইংল্যাণ্ডের মিত্রতা লাভ করিতে না পারে সেইদিকেও বিসমার্ক মনোযোগী হইলেন। মিশরের সমস্যা লইয়া ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হইলে বিসমার্ক তাহার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। জার্মানীর নৌ-শক্তি ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতি বিসমার্ক আগ্রহান্বিত না থাকায় ইংল্যাণ্ডের সহিত জার্মানীর স্বার্থ সংঘাত ঘটিবার কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। "I am still no colony man" বিসমার্ক ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংল্যাণ্ড ইংলিশ চ্যানেলে অবস্থিত হেলিগোল্যাণ্ড জার্মানীকে সমর্পণ করিল এবং ইহার বিনিময়ে জার্মানী জাঞ্জিবারের (Zanzibar) উপর ইংল্যাণ্ডের কর্তৃত্ব স্বীকার করিল।

ইংল্যাণ্ডের বন্ধুত্ব অর্জন

নিকট প্রাচ্যে জার্মানীর কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল না বটে কিন্তু জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষার্থেই বিসমার্ক এই অঞ্চলে শক্তি-সাম্য বজায় রাখিতে যত্নবান ছিলেন। বল্কান সম্পর্কে তাঁহার নীতি ছিল (১) জার্মানীর সম্মতি ব্যতীত বল্কান সমস্যার কোনরূপ সমাধান হইতে না দেওয়া, (২) অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতে না দেওয়া এবং (৩) দার্দানেলিশ প্রণালীতে ইংল্যাণ্ডের একক আধিপত্য স্থাপিত হইতে না দেওয়া।

বল্কান নীতি

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে তাঁহার আমলে জার্মানী ইওরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। তিনি জার্মানীর স্বার্থ ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইওরোপে জার্মানীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল এবং ফ্রান্স দীর্ঘকাল মিত্রচ্যুত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ ফ্রান্স আপাততঃ পাইল না। ফলে কিছুদিন পর্যন্ত ইওরোপের শান্তিও অব্যাহত রহিল।

বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য

উপরোক্ত রাষ্ট্র-জোট বা মৈত্রী বন্ধনের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি অব্যাহত রাখা এবং জার্মানীর নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা। কিন্তু সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করিলেও বিসমার্কের ফরাসী নীতি অধিকদিন স্থায়ী হইল না। জার্মানীর নূতন সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদ নীতি গ্রহণ করিয়া জার্মানীকে বিশ্বরাষ্ট্ররূপে পরিণত করাই কাইজারের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পর বিসমার্ক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে "জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ"। কিন্তু সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ঘোষণা করিলেন যে জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ নহে। তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও রুশ-বিরোধী নীতি পুনরায় নূতন করিয়া রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিল।

বিসমার্কের পতনের পর কাইজার উইলিয়ামের রুশ-বিরোধী নীতি নূতন রাষ্ট্রজোটের কারণ

বিসমার্কের পতনের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বি-শক্তি মৈত্রী (Dual Alliance) গঠন। অবশ্য উভয় দেশের মধ্যে আদর্শগত বৈষম্য ছিল প্রচুর। রুশজার ফরাসীদের গণতান্ত্রিক ও সাধারণতান্ত্রিক আদর্শ মোটেই পছন্দ করিতেন না। অপরদিকে ফরাসীগণও জারতন্ত্রের বিরোধী ছিল। উদারপন্থী ফ্রান্স ও গোঁড়াপন্থী রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপন সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু কয়েকটি কারণে উভয় দেশের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। (১) কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসানকল্পে ফ্রান্সের পক্ষে মিত্রলাভ করার প্রয়োজন ছিল। (২) কাইজার উইলিয়াম রাশিয়ার সহিত 'রি-ইন্স্যুরেন্স' সন্ধি পুনঃ প্রবর্তন করিতে অসম্মত হইলে এবং বল্কান অঞ্চলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করিলে রাশিয়া জার্মানীর উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। উপরন্তু আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ব্যাপারে রাশিয়ার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং এই অর্থ একমাত্র ফ্রান্সই রাশিয়াকে প্রদান করিতে পারিত। সুতরাং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বি-শক্তি মৈত্রী (Dual Alliance) স্থাপিত হইল। উভয় রাষ্ট্র জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল।

রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে দ্বি-শক্তি মৈত্রী (১৮৯৪)

নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর হইতে ইওরোপের আন্তর্জাতিক সকল ব্যাপার হইতে ইংল্যাণ্ড নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। একমাত্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে (নিকট-প্রাচ্যের ব্যাপার লইয়া) ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬ খৃঃ) যোগদান করা ছাড়া ইংল্যাণ্ড আন্তর্জাতিক জটিলতায় কোনরূপ অংশ গ্রহণ করে নাই।

ইংল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতার অবসান

কিন্তু আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে ইংল্যাণ্ড 'বিচ্ছিন্ন-থাকার' নীতি বর্জন করিতে বাধ্য হইল। মধ্য-এশিয়ায় রাশিয়ার অগ্রগতি এবং মিশরের কর্তৃত্ব লইয়া ফ্রান্সের সহিত দ্বন্দ্ব এবং জার্মানীর বিরাট নৌ-বাহিনী গঠন প্রভৃতি কারণে ইংল্যাণ্ড আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুনরায় অংশ গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর সহিত সন্ধি স্থাপন করার প্রস্তাব করিল। কিন্তু জার্মানী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল।

রাশিয়া ও ফ্রান্সের সহিত ইংল্যণ্ডের বিবাদ

জার্মানীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে ইংল্যাণ্ডের আকাঙ্ক্ষা

ইংল্যাণ্ডের সন্ধি প্রস্তাব জার্মানী প্রত্যাখ্যান করিলে ইংল্যাণ্ড এশিয়ার উদীয়মান রাষ্ট্র জাপানের সহিত মৈত্রী স্থাপনে উদ্যোগী হইল। সুদূর প্রাচ্যে (Far East) ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ ছিল বাণিজ্য। কিন্তু জাপান ও রাশিয়ার স্বার্থ ছিল সাম্রাজ্যবিস্তার। সুতরাং এই অঞ্চলে রাশিয়ার অগ্রগতি ইংল্যাণ্ড ও জাপানের স্বার্থহানির কারণ হইয়া উঠিতেছিল।

ইঙ্গ-জাপ মৈত্রী (১৯০২)

এইরূপ অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের সহিত জাপানের মিত্রতা সহজেই স্থাপিত হইল। ইঙ্গ-জাপ মৈত্রী (Anglo-Japanese Alliance) অনুসারে উভয় রাষ্ট্র অপরাপর ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল।

ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রতা

ইঙ্গ-জাপ মৈত্রী স্থাপনের পরেই ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী স্থাপিত হইল। ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে মিশর ও আফ্রিকার ব্যাপার লইয়া ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল এবং ফ্যাসোডা ঘটনাকে (Fashoda incident) উপলক্ষ্য করিয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উভয়েই জার্মানীর আক্রমণাত্মক মনোভাব ও জার্মান সম্রাট কাইজারের সামরিক প্রস্তুতি হেতু নিজেদের স্বার্থ বিপন্ন মনে করিয়া পুনরায় সদ্ভাব স্থাপনে যত্নবান হইল। ফলে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইল্যাণ্ডের মধ্যে আঁতাত বা মিত্রতা স্থাপিত হইল। ইংল্যাণ্ড মরক্কোর উপর ফ্রান্সের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ফ্রান্সের এই অধিকারের বিরোধিতা করিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মরক্কোর অন্তর্গত আগাদির বন্দরে একটি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিলেন। ইংল্যাণ্ডের মধ্যস্থতায় মীমাংসা হইলে ফ্রান্স জার্মানীকে ফরাসী-কঙ্গো সমর্পণ করিল। প্রথমে আলসাস-লোরেন ও পরে ফরাসী-কঙ্গো জার্মানীকে সমর্পণ করায় ফ্রান্সের জার্মান বিরোধী মনোভাব আরও তীব্র হইল। ইহার ফলে ফ্রান্স সামরিক সজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল এবং উহার রাষ্ট্রনেতাগণ জার্মানীর সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ অনিবার্য বলিয়া জনমতকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সের যুদ্ধ-স্পৃহা প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের একটি কারণ।

ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী (১৯০৭)

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রীর পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ মিত্রতা স্থাপিত হইল। পারস্যের বণ্টন সম্পর্কেই এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। উত্তর-পারস্যে রাশিয়া ও দক্ষিণ পারস্যে ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য স্বীকার করা হইল। লর্ড অক্সফোর্ড এই মিত্রতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ইহার দ্বারা রাশিয়া কর্তৃক ভারত সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবার আশঙ্কা চিরতরে দূর হইল।"

আগাদির ঘটনা ও ত্রি-শক্তি আঁতাত

আগাদির ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব আরও শক্তিশালী হইল এবং ইহাদের মধ্যে একটি ত্রি-শক্তি আঁতাত (Triple Entente) স্থাপিত হইল। জার্মানীকে কঙ্গো প্রদান করায় ফ্রান্স নিজেকে অপমানিত মনে করিয়াছিল। অপর দিকে জার্মানী সমগ্র মরক্কো নিজ অধীনে আনিতে না পারায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উপর বিরূপ হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা আগাদির ঘটনাতে যে নিহিত ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ

বল্কান অঞ্চলের ব্যাপার লইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল তাহাও প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের কারণ হইয়া উঠিল। ইহাদের স্বার্থ-

সংঘাতের ফলে নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা এতই জটিল হইয়া উঠিয়াছিল যে উহার সুষ্ঠু সমাধান একরূপ অসম্ভবই ছিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে 'নব্যতুর্কী' আন্দোলনের (Young Turk Movement) সুযোগ লইয়া অষ্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা দখল করিলে রাশিয়ার তাহা মনঃপূত হয় নাই। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল বল্কান অঞ্চলস্থ শ্লাভগণকে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও তুরস্কের কবল হইতে মুক্ত করিয়া নিজ প্রভাবাধীনে আনয়ন করা। বার্লিন-সন্ধি অনুযায়ী অষ্ট্রিয়াকে উক্ত প্রদেশদ্বয়ের শাসনভারই অর্পন করা হইয়াছিল কিন্তু তাহা অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত করার জন্য নহে। সুতরাং অষ্ট্রিয়ার কার্যকলাপে বার্লিন-সন্ধি উল্লঙ্ঘিত হওয়ায় ইংল্যাণ্ড প্রতিবাদ জানাইল এবং রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার উপর আক্রমণ চালাইবার হুমকি দেখাইল। কিন্তু সদ্য রুশো-জাপান যুদ্ধে পরাজিত রাশিয়া অধিকদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। পুনরায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সেরাজিভোর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার লইয়া অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার নিকট চরম পত্র পাঠাইলে রাশিয়া ইহাই উপলব্ধি করিল যে সার্বিয়ার ধ্বংসের দ্বারা অষ্ট্রিয়া বল্কান অঞ্চলে পরোক্ষভাবে রাশিয়ার প্রভাব বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সুতরাং সার্বিয়ার ব্যাপারে রাশিয়া উদাসীন থাকিতে পারিল না। রাশিয়ার সমর্থন লাভ করিয়া সার্বিয়া অষ্ট্রিয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করিলে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা অনিবার্য হইয়া উঠিল। বিসমার্ক এক সময় বল্কান সমস্যা প্রসঙ্গে হামবুর্গ জাহাজ কোম্পানীর ডিরেক্টর হার-বালিনকে (Herr Ballin) বলিয়াছিলেন, "I shall not see the world war, but you ; and it will start in the Near East।" বল্কান সমস্যার চরম পরিণতি সম্পর্কে বিসমার্কের এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইয়াছিল।

প্রথম বল্কান সঙ্কট (১৯০৮)

বল্কান অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীভুক্ত জনসাধারণ তাহাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির জন্য বহু পূর্ব হইতেই আন্দোলন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু উক্ত অঞ্চলের পুনর্গঠন ব্যাপারে অষ্ট্রিয়া ছিল প্রধান অন্তরায়। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে শ্লাভজাতি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সার্বিয়ার কামনা ছিল বল্কান অঞ্চলের সমগ্র শ্লাভজাতিকে মিলিত করিয়া সার্বিয়ার নেতৃত্বে একটি অখণ্ড শ্লাভরাষ্ট্র গঠন করা। কিন্তু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ইহা যে শুধু সার্বিয়াকেই আঘাত করিল এমন নহে, ইহা ইওরোপের ভারসাম্য ব্যাহত করিয়া একটি সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করিল। অপরদিকে জার্মানী বার্লিন-বাগদাদ রেল লাইন সুরক্ষিত করার জন্য সর্বদাই সর্বিয়াকে দুর্বল রাখিতে চাহিয়াছিল। সুতরাং অষ্ট্রিয়া-সর্বিয়া সংঘর্ষে জার্মানী অষ্ট্রিয়াকে সমর্থন করিল।

অষ্ট্রিয়া-সার্বিয়া সংঘর্ষ

অষ্ট্রিয়ার সার্বিয়া বিরোধী মনোভাবই দ্বিতীয় বল্কান সঙ্কটের (Second Balkan Crisis) কারণ। ১৯১২-১৩ সালের বল্কান যুদ্ধের সময় অষ্ট্রিয়া জার্মানীর সমর্থনপুষ্ট হইয়া আড্রীয়াটিক সাগরের উপকূলস্থ কয়েকটি শহর ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য সর্বিয়াকে বাধ্য করিল। ইংল্যাণ্ড

দ্বিতীয় বল্কান-সঙ্কট (১৯১২-১৩)

ও রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার এই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। এমন কি রাশিয়া সার্বিয়াকে সাহায্য করার জন্য সৈন্য সমাবেশও করিতে লাগিল। এইভাবে শ্লাভজাতির ভবিষ্যৎ লইয়া যখন অষ্ট্রিয়া ও সর্বিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছিল সেই সময় বোসনিয়ার রাজধানী সেরাজিভো শহরে এক আততায়ীর হস্তে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ড নিহত হইলেন। সার্বিয়াকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করিয়া অষ্ট্রিয়া জার্মানীর সমর্থনপুষ্ট হইয়া সার্বিয়ার নিকট এক চরম পত্র প্রেরণ করিল। অপরদিকে সার্বিয়া রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট হইয়া এই চরম পত্রের দাবি মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইল। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল।

উপসংহার

এই ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইওরোপের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে দুইটি পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্র জোটের উৎপত্তি হইল—একটি হইল জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর মধ্যে ত্রি-শক্তি মৈত্রী (Triple Alliance) এবং অপরটি হইল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রি-শক্তি আঁতাত (Triple Entente)। আবার ত্রি-শক্তি আঁতাতের অন্তর্ভুক্ত হইল ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে দ্বি-শক্তি মৈত্রী (Dual Alliance)। এই সকল রাষ্ট্র জোটের বিপদ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের পর ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছিল যে কোথাও যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হইত না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে (১৯০৭-'১৪ খৃঃ) দুইটি পরস্পর বিরোধী সামরিক শিবিরে বিভক্ত হইয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, ঈর্ষা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব লইয়া বৃহত্তর সংকটের প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতেছিল।

(৩) সামরিক প্রতিযোগিতা

ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করিলে সকলেই সমর সজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল। ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য বাহিনীর গঠন অপরিবর্তিত রহিল। কারণ স্থলবাহিনী অপেক্ষা নৌ-বাহিনীর উপরই ব্রিটেনের স্বার্থ অধিক নির্ভর করিত। কিন্তু ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানীতে যুদ্ধ-জাহাজ, ক্রুইজার ও সাবমেরিন প্রস্তুত হইল এবং জার্মানীর নৌ-শক্তি ইংল্যাণ্ডের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। ইহার প্রত্যুত্তরে ফ্রান্সে বাধ্যতামূলক সামরিক চাকুরীর মেয়াদ তিন বৎসর করা হইল। রাশিয়াও সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিল। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড স্বীয় নৌ-শক্তির প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য অগত্যা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে বাধ্য হইল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের নৌ-শক্তি জার্মানীর দ্বি-গুণ হইল। ইতিমধ্যে নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতায় ইটালী, ফ্রান্স, জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও যোগদান করিল। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে অস্ত্রশস্ত্রের প্রস্তুতি ও নৌ-শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা শুরু হইল।

এইরূপ সময় সজ্জার সঙ্গে সঙ্গে যখন ইওরোপের জনসাধারণের মনে যুদ্ধের জন্য সামরিক প্রস্তুতি চলিতেছিল সেই সময় সেরাজিভোর হত্যাকাণ্ডে যুদ্ধের নিনাদ বাজিয়া উঠিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সূত্রপাত

সংক্ষিপ্তসার

১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অন্তবর্তীকালে ইওরোপীয় ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সেই কারণে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রজোটের উৎপত্তি এবং রাষ্ট্রবর্গের সামরিক প্রস্তুতি। ১৮৭৮ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইওরোপের রাজনীতিতে বিসমার্ক তথা জার্মানীর আধিপত্য বজায় থাকে। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্স উহার পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে পারে এই সম্ভাবনায় বিসমার্ক ফ্রান্সকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন রাখার নীতি গ্রহণ করেন। তাঁহার চেষ্টায় জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর মধ্যে ত্রি-শক্তি মৈত্রী স্থাপিত হয়। বিসমার্কের পতনের পর জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়ামের পররাজ্য গ্রাস নীতি নূতন রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করে। রাশিয়ার জার্মান-বিরোধী মনোভাব, স্বদেশের পুনর্গঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং অপরদিকে আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার অবসানকল্পে ফ্রান্সের মিত্র-অন্বেষণ প্রভৃতি কারণে রুশ-ফরাসী মৈত্রী স্থাপিত হয়। আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা শুরু হইলে ইংল্যাণ্ডও উহাতে যোগদান করে। মধ্য-এশিয়ায় রাশিয়ার অগ্রগতি এবং মিশরের কর্তৃত্ব লইয়া ফ্রান্সের সহিত বিবাদ প্রভৃতি কারণে ইংল্যাণ্ড জার্মানীর সহিত মৈত্রীবন্ধনে আগ্রহী হয়। কিন্তু জার্মানী উহা প্রত্যাখ্যান করিলে ইংল্যাণ্ড জাপানের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ হয়। ইহার পরেই জার্মানীর সামরিক প্রস্তুতিতে ভীত হইয়া ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স ত্রিশক্তি আঁতাত স্থাপন করে। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দুইটি পরস্পর বিরোধী সামরিক শিবিরে বিভক্ত হইয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ বৃহত্তর সংকটের প্রতীক্ষায় কাল যাপন করিতে থাকে।

১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে সামরিক প্রতিযোগিতাও চলিতে থাকে। জার্মানীর উগ্র সামরিকবাদ এই প্রতিযোগিতার প্রধান কারণ। প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ড ভিন্ন অপর সকল রাষ্ট্রই সামরিক প্রস্তুতির প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ইংল্যাণ্ডের নৌ-শক্তির প্রাধান্য বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে জার্মানী নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করিতে মনোযোগী হয় এবং শীঘ্রই ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বি হইয়া উঠে। ইটালী, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং জাপানও এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

প্রশ্নমালা

১। 'ত্রি-শক্তি' মৈত্রী (Triple Alliance) ও 'ত্রিশক্তি আঁতাত' (Triple Entente)-এর ঐতিহাসিক পটভূমিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

[Describe the historical background of the Triple Alliance and Triple Entente.]

উঃ ১৫০-১৫২ পৃঃ দেখ

২। ১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অন্তর্বতীকালে ইওরোপের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[Relate the European international relations between 1878 and 1914.]

উঃ সংক্ষিপ্তসার দেখ

৩। ১৮৭৮ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি বর্ণনা কর।

[Describe the foreign policy of Bismarck from 1878 to 1890.] উঃ ১৪৫-১৪৮ পৃঃ দেখ

অষ্টম অধ্যায়

আফ্রিকা বণ্টন ঃ চীন ও জাপানে ইওরোপের প্রবেশ
(Partition of Africa : Western Penetration into China and Japan)

(ক) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা ঃ ইওরোপের বিস্তৃতি ঃ

ভূমিকা ঃ ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার কল্পে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ["One of the principal features of the 19th century has been the Europeanisation of the world on a large scale"] পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা প্রমুখ নাবিক ও আবিষ্কারকদের প্রচেষ্টায় বিশ্বের ভৌগলিক আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছিল। ইহার ফলে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইওরোপের বহির্ভূত দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ইওরোপের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পর্তুগাল, স্পেন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড ইওরোপের বাহিরে, বিশেষ করিয়া আফ্রিকা ও এশিয়ায় স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্বেতজাতি সমূহ বিশ্বের অনুন্নত ও দুর্বল দেশগুলিকে সামরিক শক্তির সাহায্যে একের পর এক গ্রাস করিতে থাকে। এমন কি প্রাচীন সভ্যতার দেশ-গুলিও ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যিক লিপ্সা হইতে রক্ষা পায় নাই। আফ্রিকা ও চীন বণ্টনের ব্যাপার লইয়া ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয় এবং উহাদের সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তিও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে ইওরোপ পর্যাপ্ত নহে বলিয়া বিবেচিত হইল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু ইওরোপে সীমাবদ্ধ রহিল না। ইহা বিশ্বের সুদূর অঞ্চলে বিশেষ করিয়া আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক-নীতি বিশ্বরাজনীতিতে রূপান্তরিত হইল এবং সমগ্র বিশ্বই ইওরোপীয় কূটনীতির মঞ্চে পরিণত হইল।

ভৌগলিক আবিষ্কার ও ইওরোপের বিস্তৃতি

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগাল, স্পেন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারকল্পে পৃথিবীর নানাস্থানে গমন করিয়াছিল এবং উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল (বিস্তৃত আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের উৎসাহ কতকটা হ্রাস পায়। ইহার কারণ হইল (১) বহুক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলি ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া উঠিয়াছিল এবং (২) উপনিবেশগুলি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের উৎসাহ হ্রাস

মাতৃভূমির স্কন্ধে বোঝা স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন করার ব্যাপারে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের তেমন আগ্রহ ছিল না। ফ্রান্সের পূর্বেকার উপনিবেশগুলির প্রায় সবই হস্তচ্যুত হইয়াছিল। কয়েকটি মাত্র স্পেনের অধিকারে ছিল। ব্রেজিল স্বাধীনতা অর্জন করিলে (১৮২২ খৃঃ) পর্তুগীজদের কয়েকটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছাড়া অবশিষ্ট কিছুই ছিল না। ইংল্যাণ্ডের আমেরিকা মহাদেশস্থ উপনিবেশগুলি হস্তচ্যুত হইলেও (১৭৮৩ খৃঃ) একমাত্র ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলি রক্ষা পাইয়াছিল।

(খ) ১৮৭০-১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইওরোপের বিস্তার ঃ ১৮৭০ সাল বিশ্বের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করে। এই সময় হইতে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারকল্পে তীব্র প্রতিযোগিতা নূতন করিয়া শুরু হইল। আফ্রিকা, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দ্রুতগতিতে ইওরোপের অধিকার বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উপনিবেশ বিস্তারের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এই সময়ের পর হইতে অপরাপর দেশগুলি ইংল্যাণ্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইল। সদ্য জাতীয় রাষ্ট্রে উন্নীত জার্মানী ও ইটালী আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদালাভের আশায় সাম্রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হইল। পূর্বে সাইবেরিয়ার দিকে এবং দক্ষিণে ভারতের দিকে সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রয়োজন সম্পর্কে রাশিয়াও সজাগ হইয়া উঠিল। শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকারও সাম্রাজ্য লিপ্সা দেখা দিল। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইল। এমন কি পর্তুগাল ও বেলজিয়ামের ন্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিও সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় যোগদান করিল।

১৮৭০ সাল বিশ্বের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা

বহির্জগতে উপনিবেশ বিস্তারের কারণ ঃ বহির্জগতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের একাধিক কারণ ছিল।

(১) অর্থনৈতিক কারণ ঃ শিল্প-বিপ্লবের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন আসিয়াছিল। কলকারখানা স্থাপিত হইলে কৃষি ও কুটিরশিল্প বিনষ্ট হইল এবং সর্বত্র বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভাবও বৃদ্ধি পাইল। কলকারখানা স্থাপিত হইলে কাঁচামালের প্রয়োজন দেখা দিল এবং আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ ইহার উৎপন্ন ক্ষেত্র ছিল। উপরন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য বৃহত্তর বাজারেরও প্রয়োজন হইল। সুতরাং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য সংগ্রহ, কাঁচামাল সংগ্রহ ও বৃহত্তর বাজারের প্রয়োজনকল্পে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশ বিস্তারের নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

শিল্প-বিপ্লবের গুরুত্ব

(২) রাজনৈতিক কারণ ঃ ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিল। অধিকন্তু

দেশের সামরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়োজন ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপলব্ধি করিল।

(৩) **উপনিবেশ জাতীয় গৌরবের মানদণ্ড:** রাষ্ট্রীয় গৌরব বৃদ্ধি করার জন্যও উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজন ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপলব্ধি করিয়াছিল। জার্মানী ও ইটালীতে এইরূপ মনোবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সর্বত্র জাতীয়তাবাদ উগ্র হইল এবং স্বদেশপ্রীতি 'সাম্রাজ্যপ্রীতি'তে পরিণত হইল।

(৪) **ধর্মনৈতিক কারণ:** খৃষ্টধর্ম প্রচারের আগ্রহ চার্চের এক প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে বহির্জগতের সহিত ইওরোপের বাণিজ্য সম্পর্ক পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাণিজ্য সম্পর্ক কালক্রমে রাজনৈতিক সম্পর্কে পরিণত হইল। চীন ও আফ্রিকায় ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এক কথায় খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণকে সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক বলা যাইতে পারে।

(গ) **আফ্রিকায় ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অধিকার বিস্তার:** সমুদ্র পরিবেষ্টিত ও অরণ্যানীমণ্ডিত এক বিচিত্র মহাদেশ এই আফ্রিকা। অভ্যন্তরস্থিত বিশাল মালভূমি, নিবিড় অরণ্য, উর্বর মরুভূমি, দুর্গম পর্বতরাজি এবং দুরন্ত নদ-নদী ও জলপ্রপাত এই মহাদেশটিতে এক মনোরম প্রাকৃতিক বৈচিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। আফ্রিকা মহাদেশে ইওরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস চমকপ্রদ। আফ্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া ইওরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদ নীতি তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আফ্রিকা ইওরোপের অগোচরেই ছিল। অবশ্য আফ্রিকার উত্তর সীমান্তের মিশরীয় ও কার্থেজীয় সভ্যতা প্রাচীনকাল হইতেই অনেকের নিকট সুবিদিত ছিল। ভৌগলিক অবস্থানের দিক হইতে অন্যান্য মহাদেশ অপেক্ষা আফ্রিকা ইওরোপের সর্বাধিক নিকটবর্তী। কিন্তু আফ্রিকা বহুদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে সকল জাতি আফ্রিকার সংস্পর্শে আসিয়াছিল উহাদের অধিকার উপকূলভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত ছিল অজ্ঞাত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই আফ্রিকাকে বলা হয় 'অন্ধ-মহাদেশ' ('Dark Continent')।

আফ্রিকার পরিস্থিতি

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নানা কারণে আফ্রিকা সম্বন্ধে ইওরোপের আগ্রহ দেখা দেয়। (১) নেপোলিয়ন কর্তৃক মিশর অধিকার এবং পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ড কর্তৃক মিশর হইতে ফরাসী বাহিনী বিতাড়ন প্রভৃতি ব্যাপারে আফ্রিকার গুরুত্ব ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ উপলব্ধি করে। (২) খৃষ্টান মিশনারীগণ আফ্রিকায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করিয়া আফ্রিকা সম্বন্ধে ইওরোপের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করে। (৩) মনরো নীতি (Monroe Doctrine) প্রয়োগের ফলে আমেরিকায় ইওরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ রুদ্ধ হইলে ইওরোপের দৃষ্টি আফ্রিকার উপর নিবদ্ধ হয়। (৪) ১৮৫০ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে স্পেক, লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যানলী প্রমুখ অনুসন্ধিৎসু অভিযাত্রী ও ধর্মপ্রচারকদের চেষ্টায়

আফ্রিকার গুরুত্ব

ফলে এবং তাঁহাদের প্রচারিত আফ্রিকা অভিযানের কাহিনী ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কেপ-কলোনী ইংল্যাণ্ড কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার সময় হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা উন্মুক্ত হইতে থাকে। স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও এই অঞ্চল শ্বেতকায়দের কর্মস্থানের উপযোগী ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যায় উত্তর আফ্রিকাও ইওরোপীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত। রোমান সাম্রাজ্যের সময় হইতে উত্তর আফ্রিকা বিশেষ করিয়া ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চল ইওরোপের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি কনস্টাণ্টিনোপল-এর স্থলতানের শাসনভুক্ত ছিল। একমাত্র মরক্কো স্বাধীন ছিল। মিশর, ত্রিপোলী, টিউনিস ও আলজেরিয়া স্থানীয় শাসকবর্গের অধিকারভুক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলি ইওরোপের সন্নিকটে থাকায় ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের আক্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল।

আফ্রিকায় ইওরোপীয় উপনিবেশ

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ফ্রান্সই সর্বপ্রথম এই অঞ্চলে অভিযান চালাইয়া ১৮৩০ হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আলজেরিয়ায় আধিপত্য স্থাপন করিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে বাণিজ্যের মাধ্যমে মরক্কো ও টিউনিসে আধিপত্য বিস্তার করার নীতি ফ্রান্স গ্রহণ করিল। কিন্তু এই বিষয়ে কোনরূপ প্রচেষ্টা করার পূর্বেই মিশরের সমস্যা দেখা দিল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইসমাইল পাশা মিশরের খেদিভ পদে অধিষ্ঠিত হন।* অর্থনৈতিক কারণে তিনি সুয়েজ খালে** মিশরের যে সকল 'শেয়ার, ছিল তাহা নগদ অর্থের বিনিময়ে ইংল্যাণ্ডের নিকট বিক্রয় করেন (১৮৭৫ খৃ:)। ইতিমধ্যে বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট কৃত ঋণের দেয় টাকা ইসমাইল পাশা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলে তিনি মিশরের আর্থিক পুনর্গঠনের সকল দায়িত্ব ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উপর অর্পণ করেন। ফলে মিশরে দ্বি-শক্তি আধিপত্য (Duel Control) স্থাপিত হইল। কিন্তু এই দ্বি-শক্তি আধিপত্য মিশরীয়দের মনঃপুত হইল না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আরাবী পাশার নেতৃত্বে 'মিশর মিশরবাসীর' এই দাবির ভিত্তিতে এক বিরাট আন্দোলন শুরু হইল। ইংল্যাণ্ড একক হস্তে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ দমন করিয়া ইংল্যাণ্ড

মিশরে ইংল্যাণ্ডের প্রভুত্ব স্থাপন (১৮৮২)

---

* মিশর ছিল তুর্কীর শাসনভুক্ত। গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় (১৮২৯) তুর্কী স্থলতান মিশরের শাসনকর্তা মেহমেত আলির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেহমেত আলি তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া অবশেষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তুর্কীর স্থলতান তাহা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন।

** সুয়েজখালের পরিকল্পনা ফ্রান্সই সর্বপ্রথম গ্রহণ করিয়াছিল। বাণিজ্য প্রসারকল্পে ফ্রান্স সুয়েজখাল খনন করিয়া ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফ্রান্সের ইঞ্জিনিয়ার লেইবনিজ সর্বপ্রথম সুয়েজের গুরুত্ব ফরাসীরাজ চতুর্দশ-লুইকে জ্ঞাপন করেন এবং প্রধানমন্ত্রী কোলবার্ট ইহা সম্পন্ন করিতে তৎপর হন। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিনাণ্ড-ডি-লেসেপ্স্ সর্বপ্রথম খালের খননকার্য আরম্ভ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে খালের খননকার্য সম্পন্ন হয়।

মিশরে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করিল। মিশরে ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য স্থাপন ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।†

মিশরে কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে ফ্রান্স টিউনিস ও মরক্কোতে আধিপত্য স্থাপনে যত্নবান হইল। টিউনিস স্থানীয় শাসকের অধীন হইলেও উহা তুরস্কর সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল। আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধন হেতু টিউনিসের শাসনকর্তা ফ্রান্স ও ইটালীকে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং টিউনিসে ফ্রান্স ও ইটালী উভয়ের স্বার্থ জড়িত ছিল।

ফ্রান্স কর্তৃক টিউনিস দখল (১৮৮১)

পূর্বে ইংল্যাণ্ড উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তারের বিরোধী ছিল। কিন্তু ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড টিউনিসে ফ্রান্সের দাবি স্বীকার করিল। ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া ইটালীকে জার্মানীর দলে টানিবার উদ্দেশ্যে বিসমার্ক টিউনিসের উপর ফ্রান্সের দাবি সমর্থন করিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স টিউনিস দখল করিল। ইটালী ইহাতে রুষ্ট হইয়া জার্মানী-অষ্ট্রিয়ার দলে যোগদান করিল।

টিউনিস দখলের আশা ধুলিসাৎ হইলে ইটালী ত্রিপোলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইটালী ত্রিপোলী দখল করিল।

আফ্রিকার বণ্টন: (Partition of Africa): ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য-আফ্রিকা অনাবিষ্কৃত ছিল। প্রাকৃতিক অসুবিধাই ইহার কারণ। এই অঞ্চল গ্রীষ্ম প্রধান ও অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় শ্বেতকায়দের বসবাসের অনুপযুক্ত ছিল।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গো পার্ক এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে স্পেক যথাক্রমে নাইজার ও নীল নদের উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করেন। ১৮৪০ হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিভিংষ্টোন জাম্বেজী ও কঙ্গো নদীর উপকূল অঞ্চল আবিষ্কার করেন। ১৮৭৪ হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ষ্ট্যানলী 'অন্ধ-মহাদেশের' পূর্ব সীমান্ত হইতে পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করেন। কঙ্গো উপত্যকার প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ এই অঞ্চল গ্রাস করিতে তৎপর হয়।

বেলজিয়াম কর্তৃক কঙ্গো উপত্যকা অধিকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বণ্টনকার্য ত্বরান্বিত হইল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়াম রাজ দ্বিতীয় লিওপোল্ড ব্রাসেলস্-এ ইওরোপীয় রাষ্ট্রের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে আফ্রিকার অন্তর্দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বেলজিয়াম রাজের সভাপতিত্বে এক আন্তর্জাতিক ভৌগলিক সমিতি স্থাপিত হইল। আফ্রিকায় ইওরোপীয় সভ্যতা বিস্তারকল্পেও একটি আন্তর্জাতিক সমিতি গঠিত হইল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ব্রাসেলস্ সম্মেলনে গৃহীত আন্তর্জাতিক

ব্রাসেলস্ সম্মেলন (১৮৭৬)

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব

† "The establishment of British control over Egypt forms a curious chapter in the history of British empire building."—Ketelby

কর্মপন্থা শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইল। প্রতিটি ইওরোপীয় রাষ্ট্র আফ্রিকায় নিজস্ব সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হইল।

উপনিবেশ স্থাপনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের তৎপরতা

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় লিওপোল্ড কঙ্গো উপত্যকায় এক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মধ্য-আফ্রিকায় একটি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইলে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি বিনষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় পর্তুগাল কঙ্গো নদীর মোহনার অঞ্চলগুলি দাবি করিল। জার্মানীও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ পাইল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর দাবি সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিসমার্ক বার্লিনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করিলেন।

বার্লিন সম্মেলন (১৮৮৪-৮৫)

কিন্তু বার্লিন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত* কার্যকরী করা সম্পর্কে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন রাষ্ট্রেরই আগ্রহ দেখা গেল না। ইতিমধ্যে বেলজিয়াম রাজ কঙ্গো স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া অপরাপর রাষ্ট্রগুলি আফ্রিকা ভাগাভাগি করিয়া লইতে তৎপর হইল।

ফ্রান্সের উপনিবেশ

পূর্ব হইতেই আলজেরিয়া ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স টিউনিস দখল করিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কঙ্গো নদীর দক্ষিণ উপকূল অধিকার করিয়া ফ্রান্স চাঁদ-হ্রদ পর্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মাদাগাস্কার ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মরক্কো ফ্রান্সের অধিকারে আসিল। এইভাবে উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। পর্তুগালও এই ভাগাভাগিতে যোগদান করিল।

পর্তুগালের উপনিবেশ

পর্তুগাল এ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিক দখল করিল।

ইটালীর উপনিবেশ

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইটালী লোহিতসাগরে অবস্থিত এরিত্রিয়া এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত সোমালিল্যাণ্ড দখল করিল। এই দুইটি অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকল্পে ইটালী আবিসিনিয়া দখল করিতে অগ্রসর হইলে এ্যাডোয়ার যুদ্ধে (১৮৯৬ খৃঃ) পরাজিত হইল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইটালী তুরস্কের নিকট হইতে ত্রিপোলী অধিকার করিল।

জার্মানীর উপনিবেশ

প্রথমদিকে বিসমার্ক উপনিবেশ স্থাপনের প্রতি উদাসীন থাকিলেও অবশেষে জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী দলের চাপে পড়িয়া তাঁহাকে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগদান করিতে হয়। ১৮৯০

* বার্লিন সম্মেলনে সিদ্ধান্ত : এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির হইয়াছিল যে (১) কোন রাষ্ট্র আফ্রিকার কোন অংশ দখল করিতে চাহিলে পূর্বেই তাহা অন্যান্য রাষ্ট্রকে জানাইতে হইবে, (২) স্বাধীন কঙ্গো-রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইবে, যদিও ইহার শাসনকার্য বেলজিয়াম কর্তৃক পরিচালিত হইবে। (৩) স্বাধীন কঙ্গো-রাষ্ট্রে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ব্যবসা-বাণিজ্য করার সমান অধিকার থাকিবে।

বার্লিন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কঙ্গো-উপত্যকা-সন্ধি (Congo Basin Treaty) নামে খ্যাত। এই সন্ধির শর্তাদি ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল।

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
ইউরোপ
ভূমধ্যসাগর
এশিয়া
মরক্কো
আলজিরিয়া
ত্রিপোলি
মিশর
রিও-ডি-ওরো
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা
লোহিত সাগর
ইরিত্রিয়া
মিশরীয় সুদান
গাম্বিয়া
নাইজেরিয়া
আবিসিনিয়া
ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড
বেলজিয়ান কঙ্গো
ভারত মহাসাগর
জার্মান পূর্ব আফ্রিকা
দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর
পোর্তুগীজ পশ্চিম আফ্রিকা
জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা
মাদাগাস্কার
দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র
ইতালীয়
স্পেনীয়
বেলজিয়ান
পোর্তুগীজ
জার্মান
ফরাসী
ব্রিটিশ
আফ্রিকায় বৈদেশিক উপনিবেশ ও অধিকার (১৯১৪ খ্রীঃ)
মাইল
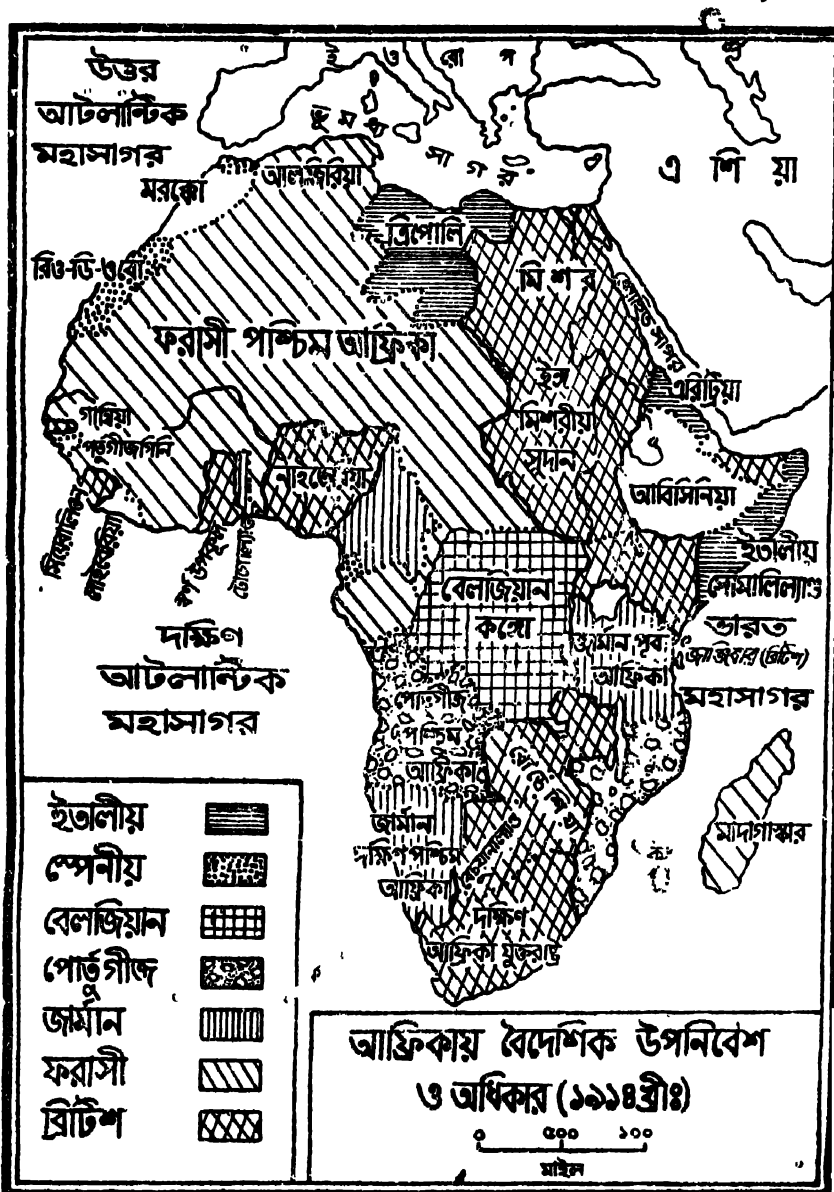
খৃষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, টগোল্যাণ্ড এবং কেমেরুনস্ জার্মানীর দখলে আসিল।

আফ্রিকার বৃহৎ অংশ ইংল্যাণ্ডের ভাগ্যে জুটিল। ওলন্দাজদের নিকট হইতে কেপ-কলোনী, নাটাল ও অরেঞ্জ-রিভার কলোনী এবং বুয়রদিগকে পরাজিত করিয়া ট্রান্সভাল ইংল্যাণ্ডের দখলে আসিল। দক্ষিণ আফ্রিকার এই অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গঠিত হইল। উত্তর আফ্রিকায় মিশর অধিকার করিয়া ইংল্যাণ্ড সুদান পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পূর্ব আফ্রিকা ও উগাণ্ডাও ইংল্যাণ্ডের অধিকারে আসিল।

ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ

কেবলমাত্র আবিসিনিয়া ও লাইবেরিয়া ইওরোপীয় দেশগুলির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এইভাবে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আফ্রিকা বণ্টিত হইল।

আফ্রিকা বণ্টনের বৈশিষ্ট্য ঃ আফ্রিকা বণ্টন ব্যাপারে দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, বণ্টন উপলক্ষ্য করিয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। সকল ক্ষেত্রেই পরস্পরের দাবি আপোষে মীমাংসিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় আফ্রিকার বণ্টনকার্য ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয় নাই, বরঞ্চ অতি দ্রুততার সহিত ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল। নব-স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও উগ্র জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জার্মানী ও ইটালীর ইওরোপীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে আবির্ভাবই এই দ্রুততার কারণ।

বণ্টন ব্যাপারে দুইটি বৈশিষ্ট্য

আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদের ফলাফল
(Consequences of the Partition of Africa)

প্রথমে বিনাযুদ্ধে ও আপোষের মাধ্যমে আফ্রিকার বণ্টনকার্য সম্পন্ন হইলেও পরে ইহার ফলে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়।

(১) মিশর ও সুদানে ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য স্থাপিত হইলে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। অবশেষে তাহা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

(২) ফ্রান্স টিউনিস দখল করিলে ইটালীর সহিত ফ্রান্সের বিরোধ ঘটে এবং ইটালী জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত যোগদান করিয়া ত্রি-শক্তি রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করে।

(৩) মরক্কোয় ফ্রান্সের একক আধিপত্য জার্মানীর মনঃপুত হয় নাই এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের সমর্থন লাভ করায় জার্মানী বলপ্রয়োগ করিতে সাহস পায় নাই। ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

(৪) আফ্রিকা বণ্টনের ফলে জিব্রাল্টার, এডেন, সকোট্রা, জাঞ্জিবার প্রভৃতি অঞ্চলে ইংল্যাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা অধিকার করিয়া ইংল্যাণ্ড তথায় শ্বেতকায়দের উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছিল।

(৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে যে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়াছিল তাহার উদ্ভব হয় আফ্রিকা হইতে।

চীন ও জাপান (China and Japan)

(ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত)

চীন (China)

আয়তন

সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঃ আয়তনের দিক দিয়া চীন ইওরোপ অপেক্ষা বৃহৎ। মাঞ্চু-রাজবংশের আমলে চীনের কর্তৃত্ব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কোরিয়ার উত্তরাংশ হইতে ক্যাম্বোডিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগর হইতে তিব্বতের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত চীন সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

চীনের সভ্যতা

রোমের সভ্যতা যেমন একসময় পশ্চিম ইওরোপকে প্রভাবিত করিয়াছিল, চীনের সভ্যতাও সেইভাবে পূর্ব এশিয়াকে এক সময় প্রভাবিত করিয়াছিল। জাপান, কোরিয়া, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশগুলিতে চীনের সভ্যতা ও সংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল। চীনবাসীদের সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা এবং উহাদের আচার-ব্যবহার চীনকে এক সময় গৌরবদান করিয়াছিল। চীনেরাই সর্বপ্রথম কাগজ, বারুদ ও মুদ্রণ বিষয়ক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়াছিল। চীনেরা স্বভাবতঃই গোঁড়াপন্থী। কৃষি ও কুটির শিল্পই অধিকাংশ চীনাদের উপজীবিকা ছিল। সমাজে বণিকগণ যথেষ্ট সম্মান পাইত।

ধর্ম

চীনে দুইটি প্রধান ধর্ম প্রচলিত ছিল। নিম্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং উচ্চ-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা ছিল কনফিউসিয়ান* মতাবলম্বী।

ভাষা

সমগ্র চীনে কোন একটি সাধারণ ভাষা ছিল না। আঞ্চলিক ভাষাই সর্বত্র প্রচলিত ছিল। আধুনিক যুগ আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত জনসাধারণের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

শাসনব্যবস্থা

'স্বর্গের-পুত্র'—উপাধিধারী সম্রাটের অধীনে স্বৈরাচারী রাজত্বই ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থা। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাতার জাতিগোষ্ঠীভুক্ত মাঞ্চুগণ মিং-রাজবংশের উচ্ছেদ করিয়া চীন অধিকার করিয়াছিল। বিদেশী মাঞ্চুগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী ছিল। সাম্রাজ্যের সুদূর প্রদেশগুলির শাসনভার গভর্ণরদের হস্তে ন্যস্ত থাকিত এবং উহাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল খাজানা আদায় করা। দলাই লামার অধীনে তিব্বত একরূপ স্বাধীন ছিল, যদিও তিনি চীন সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। সরকারী কর্মচারীগণ 'ম্যাণ্ডারিন' নামে পরিচিত ছিল এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উহাদের নিয়োগ করা হইত।

---

* কনফিউসিয়ান মতবাদকে কোন একটি বিশিষ্ট ধর্ম অপেক্ষা ব্যবহারিক রীতি-নীতি বলাই অধিক সঙ্গত। এই মতবাদ চীনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি কনফিউসিয়াসের (খৃঃ পূর্ব ৫৫১-৪৭৯) দর্শন ও উপদেশ হইতে উপৎত্তি লাভ করিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বহির্জগতের সহিত চীনের সম্পর্ক: সুদূর অতীতকাল হইতে চীন পাশ্চাত্য দেশগুলির নিকট পরিচিত ছিল। চারিদিকে সমুদ্র, মরুভূমি ও পর্বতমালার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া চীন উহার অতীত গৌরব ও সভ্যতা সম্পর্কে অতিশয় গর্ববোধ করিত। চীন বহির্জগতের অন্যান্য দেশ বা জাতির সহিত সম্পর্ক সর্বোতভাবে বর্জন করিয়া চলিত। কিন্তু তাই বলিয়া বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চীনের যে কিছু কিছু সংযোগ ছিল না—একথা বলা যায় না। রোমের বিলাস-সামগ্রী চীনে সমাদৃত হইত, রোমের ক্যাথলিক চার্চ চীনে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিত এবং আরব ও পারস্যের সহিত উহার কূটনৈতিক বিনিময় চলিত।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনের বিপুল ঐশ্বর্যের কথা ইওরোপে প্রচারিত হইতে থাকিলে চীনের সহিত ইওরোপের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা চলিল। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল পর্তুগীজগণ। চীনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে ব্যর্থ হইলেও উহারা দক্ষিণ চীনের ম্যাকাও বন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করিল। পর্তুগীজদের পর স্পেনীয়গণ দক্ষিণ চীনের কর্তৃপক্ষের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ক্যান্টন বন্দরে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করিল। কিন্তু পর্তুগীজদের ন্যায় স্পেনীয়গণও চীনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে অসমর্থ হইল।

পর্তুগীজদের আগমন

স্পেনীয়গণের আগমন

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ ফরমোসা দখল করিয়া তথায় ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করিল। মাঞ্চু-রাজবংশের আমলে চীনের সহিত ইওরোপের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে চীন-সম্রাটের আদেশে ক্যান্টন বন্দর ইওরোপীয়দের নিকট উন্মুক্ত করা হইল এবং ইংরাজ বণিকগণ তথায় কারখানা স্থাপন করার অনুমতি পাইল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে চীন সাম্রাজ্যে ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্য উত্তরোত্তর প্রসারলাভ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে রাশিয়াও স্থলপথ দিয়া চীনের উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। রাশিয়ার এশিয়া মহাদেশস্থ সাম্রাজ্য চীন সাম্রাজ্যের সংলগ্ন হওয়ায় উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিত। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে চীন সরকার ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইল (Treaty of Narsching)। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইওরোপীয় বণিকদল বিভিন্ন সময়ে চীনে আগমন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করিয়াছিল।

ওলন্দাজগণের আগমন

ইংরাজদের আগমন

চীন-রুশ সন্ধি

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইওরোপের সহিত চীনের সম্পর্ক: নানাপ্রকার অপমানজনক বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া চীন সরকার ইওরোপীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য ও এমন কি ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করিতেন। ইওরোপীয় বণিককুল নির্বিকার চিত্তে সকল অপমান সহ্য করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়া যাইতেছিল।

প্রথম চীন যুদ্ধ (১৮৪০-৪২) ঃ উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে চীনে এক গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। ইওরোপীয় বণিকদের ব্যবসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উহারা কোনমতেই চীন সরকারের খেয়ালখুসীর উপর নিজেদের লাভজনক ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে পারিল না। সুতরাং চীনের সহিত ইওরোপীয়দের বিবাদও শুরু হইল। এই বিষয়ে ইংরাজগণ অগ্রণী ছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত হইলে বহু ইংরাজ বণিক দক্ষিণ-চীনে আগমন করিল এবং উহারা চীন সরকারের বিধি নিষেধ মানিয়া লইতে অসম্মত হইল। এই সময় ইওরোপের সর্বত্র অবাধ-বাণিজ্য-নীতি গৃহীত হওয়ায় ইওরোপীয়গণ উহা চীনেও প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। ইংরাজগণ বাণিজ্য সম্পর্কিত বিধিনিষেধ তুলিয়া লওয়ার এবং সমতার ভিত্তিতে সন্ধি স্থাপন করার দাবি করিল। চীন সরকার ইহাতে অসম্মত হইলে বিবাদের সূত্রপাত হইল। অবশেষে চীনে ইংরাজদের অহিফেন ব্যবসার প্রশ্ন লইয়া তিক্ততা বৃদ্ধি পাইল। পর্তুগীজগণই সর্বপ্রথম চীনে অহিফেনের প্রচলন করিয়াছিল। ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পর হইতে চীনে অহিফেন ব্যবসা বৃদ্ধি পায়। চীনবাসীদের মধ্যে অহিফেনের নেশা সংক্রামিত হইলে চীন সরকার ইহার কু-অভ্যাস এবং কু-প্রভাব হইতে চীনবাসীগণকে মুক্ত করার জন্য চীনে অহিফেন আমদানি নিষিদ্ধ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও অহিফেন আমদানি বন্ধ হইল না। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে চীন সরকারের আদেশে লিন্ (Leen) নামক জনৈক উচ্চপদস্থ চীনা কর্মচারী অহিফেন আমদানি বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি বহু অহিফেনের বাক্স বাজেয়াপ্ত করিয়া সেইগুলি নষ্ট করিয়া দিলেন। ফলে চীন সরকারের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল। (১৮৪০-'৪২ খৃঃ)।

যুদ্ধের কারণ

ইহা প্রথম চীন যুদ্ধ বা অহিফেন যুদ্ধ নামে খ্যাত। চীন সরকার পরাজিত হইয়া ইংরাজদের সহিত নানকিং-এর সন্ধি (Treaty of Nanking) স্বাক্ষর করিলেন। ইহার শর্তানুসারে চীন সরকার (১) ইংরাজগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলেন, (২) হংকং বন্দরটি ইংরাজদের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং (৩) চারিটি বন্দর—যেমন নিংপো, ফুচাও, সাংহাই ও এ্যময় ইওরোপীয় বণিকদের নিকট উন্মুক্ত করিলেন।

চীনের পরাজয় ও নানকিং-এর সন্ধি

প্রথম চীন যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার ফলে চীনের দুর্বলতা ইওরোপীয়দের নিকট ধরা পড়িল, ইংল্যাণ্ডের সুদূর প্রাচ্য-নীতির (Far Eastern Policy) ভিত্তি রচিত হইল এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্র চীনে স্ব স্ব প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যোগী হইল।

যুদ্ধের গুরুত্ব

দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ (১৮৫৬) ঃ প্রথম চীন যুদ্ধের কয়েক বৎসর পর তুচ্ছ কারণে দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ শুরু হইল (১৮৫৬ খৃঃ)। চীন সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ প্রচারের অপরাধে

চীন রাজকর্মচারী কর্তৃক জনৈক ফরাসী ধর্মজাযক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে ফ্রান্স চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। সেই বৎসর একটি ইংরাজ জাহাজ ইংরাজ পতাকা উত্তোলন করিয়া যাইবার অপরাধে জাহাজের কর্মচারীগণ চীন সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হইলে ইংরাজগণও চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। চীন পুনরায় পরাজিত হইল এবং তিয়েনসিনের সন্ধি (Treaty of Tientsin—1858) স্বাক্ষরিত হইল। ইহার শর্তানুসারে (১) চীন সরকার ইংরাজ ও ফরাসীগণকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলেন এবং (২) এগারোটি নূতন বন্দর ইওরোপীয়দের নিকট উন্মুক্ত করিলেন।

তিয়েনসিনের সন্ধি (১৮৫৮)

বহিঃশক্তি কর্তৃক চীন সাম্রাজ্য গ্রাস ও অর্থনৈতিক শোষণ : তিয়েনসিনের সন্ধির পর হইতে বহিঃশক্তি কর্তৃক চীনের রাজ্যগ্রাস ও অর্থনৈতিক শোষণ শুরু হইল। নানকিং ও তিয়েনসিনের সন্ধি অনুসারে চীনের ষোলটি বন্দরে ইওরোপীয়গণকে বসবাস ও বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল বন্দরে ইওরোপীয়গণ নিজেদের পৌরশাসন ও আদালত স্থাপন করিল। ইয়াংসি নদীর উপকূলে ইংরাজ, ফরাসী, রুশ ও জার্মান শাসিত অঞ্চল গড়িয়া উঠিল। এই সকল অঞ্চলে চীন সরকারের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইল। এমন কি এই সকল অঞ্চলে ইওরোপীয়দের সুবিধামত জমি-সংক্রান্ত আইন চালু হইল এবং খাজনা আদায় করা ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করার দায়িত্বও উহারা গ্রহণ করিল। উপরন্তু চীনের অন্তর্দেশীয় জলপথগুলির উপরেও ইওরোপীয়দের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইল। এতদ্ভিন্ন রাশিয়া আমুর নদী পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড দখল করিল, ফ্রান্স আনাম ও টংকিন দখল করিল; জার্মানী কিয়াওচাও বন্দর আদায় করিল জাপান লু-চু-দ্বীপপুঞ্জ দখল করিল এবং ইংল্যাণ্ড ওয়ে-হাই-ওয়ে (Wei-Hai-Wei) দখল করিল।

চীনের রাজ্য গ্রাস

রাজ্যগ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে চীনের অর্থনৈতিক শোষণ শুরু হইল। তিয়েনসিনের সন্ধির পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইওরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রই চীনের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিল। ইংরাজদের ব্যবসা প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পাইল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, স্পেন, বেলজিয়াম প্রভৃতি বিদেশী রাষ্ট্রগুলি চীনের নিকট হইতে বহুবিধ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিল। চীনের বাণিজ্য, শুল্ক ও ডাক বিভাগও বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণাধীন হইল। এমন কি চীনের অন্তর্দেশীয় রেলপথ বিদেশী মূলধনে নির্মিত ও পরিচালিত হইতে লাগিল।

অর্থনৈতিক শোষণ

চীনের নবজাগরণ : চীন সাম্রাজ্যে ইওরোপীয়দের অধিকার বিস্তার ও উহাদের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে চীনবাসী তীব্র প্রতিবাদ শুরু করিল। চীনবাসীদের মধ্যে ক্রমশঃ এক অভূতপূর্ব জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইল। ইওরোপীয়দের প্রতি ঘৃণা হইতে আত্মপ্রকাশ করিল বক্সার বিদ্রোহ (Boxer Rebellion)। ইওরোপীয়দের বিরুদ্ধে ইহাই হইল চীনবাসীর সর্বপ্রথম প্রতিবাদ। চীনের শিক্ষিত

সম্প্রদায় জাপান ও ইওরোপীয় দেশগুলির আক্রমণাত্মক ও শোষণ নীতির কবল হইতে চীনকে রক্ষার জন্য চীনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে সংস্কার প্রবর্তন করিতে ক্রমশঃ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু চীনের প্রতিক্রিয়াশীল ও গোঁড়া সম্প্রদায় স্বদেশের এই দুরবস্থার জন্য পাশ্চাত্য জাতিগুলিকেই সর্বোতভাবে দায়ী করিল, এমন কি বিদেশী শিক্ষাকেও তাহারা ঘৃণার চোক্ষে দেখিতে লাগিল। তাহাদের এই পাশ্চাত্য-বিরোধী ঘৃণা আত্মপ্রকাশ করিল বক্সার বিদ্রোহে। এই বিদ্রোহ মুষ্টিযোদ্ধার (boxer) ভ্রাতৃ-সংঘের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা ইতিহাসে বক্সার-বিদ্রোহ নামে খ্যাত।

ইওরোপের প্রতি চীনবাসীর ঘৃণা

এই বিদ্রোহের মূলে ছিল তিনটি কারণ—যথা (১) জাপান কর্তৃক চীনের পরাজয় (১৮৯৬ খৃঃ), (২) চীনে পাশ্চাত্য দেশগুলির ক্রমবিস্তার এবং (৩) চীন-সম্রাট কোয়াং-সু কর্তৃক ইওরোপের অনুকরণে স্বদেশে সংস্কার প্রবর্তনের প্রচেষ্টা।

বিদ্রোহের কারণ

চীনের একাধিক অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হইল। বহু বিদেশী স্ত্রী-পুরুষ ও খৃষ্টান ধর্মযাজক বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। "বিদেশীগণকে ধ্বংস করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা কর"—ইহাই ছিল বিদ্রোহীদের একমাত্র কথা। বিদ্রোহীগণ পিকিং ও তিয়েনসিন দখল করিল। প্রায় ছয় সপ্তাহকাল বিদ্রোহীগণ কর্তৃক ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড চলিবার পর সর্বশেষে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের এক সম্মিলিত বাহিনী চীনে আগমন করিয়া বিদ্রোহ দমন করিল। এই বিদ্রোহের ফলে (১) ইওরোপীয়গণকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে চীন সরকারকে বাধ্য করা হইল, (২) উত্তর চীনে বিদেশী সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হইল এবং (৩) বিদেশী বণিকগণকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে চীন সরকারকে বাধ্য করা হইল। ইহার পর শুরু হইল সংস্কার আন্দোলন। পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে সংস্কার প্রবর্তন করাই সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল 'তরুণ-চীন' (Young China) দল। চীনে ইওরোপীয় সাহিত্য ও পুস্তকাদির চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল; বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকেরা পিকিং-এ স্থাপিত বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করিল এবং দেশের বহু স্থানে বৈদেশিক স্কুল ও সংঘ গড়িয়া উঠিল। এমন কি চীনের সম্রাট পর্যন্ত এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। সংস্কার আন্দোলনের চাপে পড়িয়া চীন সরকার কিছু সংস্কারও প্রবর্তন করিলেন—যেমন প্রাচীন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার অবসান, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ, ইওরোপের অনুকরণে স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। কিন্তু 'তরুণ-চীন' দল ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-০৫ খৃঃ)

বক্সার বিদ্রোহ (১৯০০)

বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও ফলাফল

তরুণ চীনদল ও সংস্কার আন্দোলন

জাপানের জয়লাভে চীনে এক অভূতপূর্ব জাতীয় চেতনার উদ্ভব হইল। সংস্কার-পন্থীগণ মাঞ্চু-রাজবংশের অবসান ও পার্লামেণ্টারী শাসনের দাবি করিল। ইতিমধ্যে দক্ষিণ চীনে ডাঃ সান-ইয়াত-সেনের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী কুয়োমিং-তাং দল সাধারণতান্ত্রিক আন্দোলন স্থরু করিল। এই আন্দোলনে আতঙ্কিত হইয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দে চীন সরকার একটি জাতীয় পরিষদ আহ্বান করিয়া উহাকে পার্লামেণ্টারী শাসনতন্ত্র রচনা করার অধিকার প্রদান করিলেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী দল মাঞ্চু রাজবংশের সহিত কোনরূপ আপোষমূলক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কুয়োমিং-তাং দল সশস্ত্র আন্দোলন করিয়া নানকিং শহর দখল করিল এবং তথায় এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চু-সম্রাট স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিলে সমগ্র চীনে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইল। ডাঃ সান-ইয়াত-সেন ইহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন।

সান-ইয়াত-সেন ও গণবিপ্লব (১৯১১)

মাঞ্চু বংশের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (১৯১২)

চীনের পরবর্তী ইতিহাস: স্বদেশের সংহতি ও ঐক্যবন্ধনের জন্য সান-ইয়াত-সেন ইউয়ান-সি-কাই-এর অনুকূলে প্রেসিডেণ্ট পদ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইউয়ানের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে চীনে এক দারুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। ইউয়ান পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করার পরিবর্তে স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতেই অধিক যত্নবান ছিলেন। ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পাদিত অসম সন্ধিগুলি (Unequal Treaties) রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া কার্যতঃ উহাদের সহযোগিতায় স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করাই ইউয়ানের লক্ষ্য ছিল। ইউয়ান বিদেশী পঞ্চ-শক্তির নিকট হইতে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করিয়া চীনের অর্থনীতি সংক্রান্ত সকল ব্যাপার উহাদের হস্তেই ছাড়িয়া দিলেন। ইউয়ানের জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপে চীনবাসী আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। দক্ষিণ চীনের সর্বত্র ইউয়ানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিল। কিন্তু ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইউয়ানের মৃত্যু হইলে চীন এক বিরাট সংকট হইতে রক্ষা পাইল। ইউয়ানের মৃত্যুর পর ডাঃ সান-ইয়াত্ সেন পুনরায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন। কিন্তু সেই সময় চীনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা সমর নেতাদের হস্তগত হইয়াছিল। ডাঃ সান-ইয়াত-সেন দেশের ঐক্যের জন্য সমর-নেতাদের দমন করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রাশিয়ার সাহায্যে কুয়োমিং-তাং দলকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন এবং চীনে এক নূতন সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী গড়িয়া উঠিল। তাঁহার 'তিন-দফা কর্মসূচী (Three Point Programme) চীনবাসীর আদর্শ হইয়া উঠিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে চিয়াং-কাইশেক কয়োমিং তাং দলের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন।

ইউয়ান-সি-কাই-এর আমলে চীনের দুরবস্থা

সান-ইয়াত-সেন ও চীনের পুনর্গঠন

চীন ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে

যোগদান করিয়াছিল। চীনের আশা ছিল যে যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভ করিলে চীন উহাদের সাহায্যে অসম-সন্ধিসমূহ বাতিল করিয়া বিদেশীগণের নিকট হইতে উহার অঞ্চল সমূহ ফেরৎ পাইবে ইতিমধ্যে যুদ্ধের প্রথম দিকে মিত্রশক্তি ইওরোপের যুদ্ধে বিব্রত থাকায় জাপান সেই সুযোগে চীনের নিকট 'একুশ-দফা দাবি' করিল। সেই সময় চীন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন ইউয়ান্-সি-কাই। তিনি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জাপানের দাবি মানিয়া লইলেন। কিন্তু চীনবাসী দাবির বিরোধিতা করিল।

চীনের সুবিধা

যুদ্ধে যোগদান করিয়া চীনের কিছু সুবিধা হইয়াছিল যথা (১) চীনের অনুকূলে বাণিজ্যিক শুল্ক পুনর্বিবেচিত হইল, (২) জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার অধিকৃত অঞ্চল চীন ফেরৎ পাইল এবং (৩) যুদ্ধ অবসানে শান্তি সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হইল।

চীনের অসুবিধা

কিছু লাভ হইলেও যুদ্ধে যোগদান করিয়া চীনের অসুবিধাও হইয়াছিল—যথা (১) জাপান চীনে আত্ম-প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইল, (২) চীনের আর্থিক দূরবস্থা বৃদ্ধি পাইল এবং (৩) চীন অর্থের জন্য আমেরিকার দ্বারস্থ হইল।

জাপানের উত্থান

(Rise of Japan)

ভূমিকা: চারিটি বৃহৎ এবং প্রায় তিন সহস্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ লইয়া জাপান গঠিত।

দেশ পরিচয়

দ্বীপপুঞ্জগুলির অধিকাংশই আগ্নেয়গিরি ও পর্বতময়। মাত্র শতকরা চৌদ্দভাগ জমি কৃষির উপযোগী। জাতি ও সভ্যতার দিক দিয়া চীনের সহিত জাপানের সাদৃশ্য থাকিলেও বহু বিষয়ে চীনদেশের ন্যায় বিশ্বের অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া জাপান নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত

সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা

জাপানের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা অনেকটা মধ্যযুগের ইওরোপের মত ছিল। জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস। ইহারা অভিজাতদের সম্পূর্ণ অধীন ছিল। ইওরোপের সামন্তদের ন্যায় জাপানী অভিজাতগণ স্ব স্ব এলাকা শাসন করিত এবং পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। সমাজে সামুরাই (Samurai) নামে অপর একটি শ্রেণী ছিল। যুদ্ধই ইহাদের জীবিকা ছিল। দেশের সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাট বা মিকাডো (Mikado)। আইনতঃ সম্রাট দেশের সর্বেসর্বা হইলেও প্রকৃত শাসনক্ষমতা 'সোগান' (Shogun) পদবীধারী শাসনকর্তার হস্তে ন্যস্ত থাকিত। নেপালের 'রানা'-দের ন্যায় 'সোগান' পদ ছিল বংশানুক্রমিক। দেশের জনসাধারণের সহিত সম্রাটের কোনরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। জাপানীদের ধর্ম 'সিন্তবাদ' তাহাদিগকে দেবতার

ধর্ম

প্রতি ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমও শিক্ষা দিত। জাপানী-দের দেশাত্মবোধ ছিল গভীর এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা তাহাদের মহান গুণ ছিল।

জাপানের বিচ্ছিন্নতা : চীনের ন্যায় জাপানও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। জাপানের কর্তৃপক্ষ কোন বিদেশীকে জাপানে প্রবেশাধিকার প্রদান না করিলেও ষোড়শ শতাব্দী হইতে পর্তুগীজ, স্পেনীয় ও ওলন্দাজ বণিকগণ জাপানে প্রবেশ করিতে থাকে। খৃষ্টান মিশনারীগণ দলে দলে জাপানে আগমন করিয়া খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে থাকে এবং বহু জাপানী খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। ফলে শীঘ্রই জাপানে মিশনারীদের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে জাপানে মিশনারী ও বিদেশী বণিকদের আগমন নিষিদ্ধ হইল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কমডোর পেরি (Commodore Perry) নামে আমেরিকার জনৈক নৌ-সেনাপতি কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ লইয়া জাপানে আসিলেন। জাপানের নিকটবর্তী সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত আমেরিকার জাহাজগুলির নিরাপত্তার জন্য এবং জাপানী বন্দর হইতে আমেরিকার জাহাজগুলির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ও আমেরিকার পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করিবার অধিকার তিনি দাবি করিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাপানের কর্তৃপক্ষ পেরির দাবি স্বীকার করিয়া লইলেন এবং আমেরিকার সহিত এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। জাপানের দুইটি বন্দর আমেরিকার জাহাজগুলির নিকট উন্মুক্ত করা হইল। আমেরিকার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইওরোপের পনেরোটি রাষ্ট্র জাপানের সহিত বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করিল।

পেরির আগমন ও জাপানের দ্বার উন্মোচন

জাপানের সহিত ইওরোপী রাষ্ট্রবর্গের চুক্তি-বন্ধন

জাপানের গণ বিপ্লব : এইভাবে বহির্জগতের সহিত যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার পর হইতে জাপানের রাষ্ট্র ও সামাজ জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসিল। পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত অসম-চুক্তি (Unequal Treaties) সম্পাদিত হইলে জাপানে বিদেশী-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইল। বিক্ষিপ্তভাবে ইওরোপীয়দের উপর আক্রমণ চলিলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা বোমার দ্বারা জাপানের কাগোসিমা ও সিমোনসেকি শহর দুইটির ক্ষতি সাধন করিল। ইওরোপীয়দের সামরিক শক্তিতে ভীত হইয়া জাপানবাসী উপলব্ধি করিল যে ইওরোপীয়দের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ইওরোপের আদর্শে দেশকে শক্তিশালী করা একান্ত প্রয়োজন। এইরূপ মনোভাব হইতেই ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জাপানে এক আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। সোগান পরিবারের আধিপত্য হইতে জাপানের সম্রাটকে মুক্ত করা হইল এবং অভিজাত ও সামরিক শ্রেণীর সকল প্রকার অধিকার বিলুপ্ত করা হইল। বিনা রক্তপাতে জাপানে যে বিপ্লব সংঘটিত হইল তাহা জাপানের ইতিহাসে 'Restoration' নামে পরিচিত।

কারণ

ইহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাপানের রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসিল। প্রাশিয়ার শাসনতন্ত্রের আদর্শে এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। কোড-নেপোলিয়নের অনুকরণে নূতন আইন রচিত হইল। ইংরাজী শিক্ষা অবশ্য-পাঠ্য করা হইল।

জাপানের পুনরুজ্জীবন

প্রাশিয়াব অনুকরণে স্থলবাহিনী ও ইংল্যাণ্ডের অনুকবণে নৌ-বাহিনী গঠিত হইল। জাপানেব সর্বত্র বেলপথ, ডাক ও টেলিগ্রাফ স্থাপিত হইল। শিল্প ও বাণিজ্যেব প্রসারেব জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হইল এবং বহু কলকাবখানা স্থাপিত হইল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দুই কক্ষযুক্ত একটি পার্লামেণ্ট স্থাপন করা হইল। পাশ্চাত্য আদর্শেব অনুকবণে আধুনিকতাব পথে অগ্রসব হইলেও জাপান কখনও স্বাতন্ত্র্যবোধ বিসর্জন দেয নাই। নব্য-জাপানেব স্রষ্টাদেব মধ্যে ইযামাগাতা (Yamagata), ইটো (Ito), ইতাগাকি (Itagakı) এবং ওকুমাব (Okuma) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জাপানের পররাষ্ট্রনীতি (১৮৬৭-১৯০৫) : ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পর হইতে জাপান সাম্রাজ্যবাদেব পথে অগ্রসব হইতে লাগিল। জাপানেব সাম্রাজ্যবাদ বা পবরাষ্ট্রনীতিব মূলে ছিল বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাবণ। জাপানের সহিত অসম-চুক্তি স্বেচ্ছায বাতিল কবিতে পাশ্চাত্য দেশগুলি অসম্মত হইলে জাপান এক বলিষ্ঠ পবরাষ্ট্রনীতি গ্রহণ কবিল। জাপানের সাম্রাজ্যবাদ নীতিব মূলে অর্থ-নৈতিক কাবণও ছিল। উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাব স্থান সংকুলান এবং জাপানী শিল্পগুলিব জন্য কাঁচামাল সংগ্রহেব জন্য উপনিবেশেব প্রযোজন ছিল।

সাম্রাজ্যবাদেব পথে জাপান : প্রথম পব

(১) চীন জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-'৯৫) : ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে চীনেব সহিত বিবাদেব সূত্রপাত করিযা জাপান লু-চু দ্বীপপুঞ্জ দখল কবিল। ইহাব পব ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোবিযার প্রশ্ন লইযা চীন-জাপানের যুদ্ধ শুরু হইল। আইনতঃ কোবিযা চীন সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু চীনেব দুর্বলতা হেতু কোবিযায আভ্যন্তবীণ গোলযোগ উপস্থিত হইলে তথায পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলিব প্রতিপত্তি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। কোরিযা জাপানের অতি নিকটে অবস্থিত হওযায নিরাপত্তাব দিক দিযা উহার উপর জাপানেব আধিপত্য স্থাপন কবাব প্রযোজন ছিল। ইহা ছাডা মাঞ্চুরিযাব দিকে রাশিয়াব অগ্রগতিতে জাপানেব নিরাপত্তা বিপজ্জনক হইযা উঠিযাছিল। এই অবস্থায় জাপান চীনেব সহিত এইরূপ শর্তে সন্ধি করিল যে উভয রাষ্ট্র একে অপরকে না জানাইযা কোবিযায় সৈন্য পাঠাইবে না। কিন্তু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীন সন্ধিব শর্ত ভঙ্গ করিযা কোরিযায সৈন্য পাঠাইলে জাপানও তথায় সৈন্য পাঠইল। চীন কোরিযার উপর স্বীয় সার্বভৌমত্বের দাবি কবিল। কিন্তু জাপান কোনমতেই কোরিযার উপর স্বীয় অধিকার পবিত্যাগ করিতে বাজী হইল না। ফলে উভযের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। ইহা চীন-জাপান যুদ্ধ (Sino-Japanese War) নামে পরিচিত। ইওবোপীয পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত জাপ-বাহিনীর নিকট চীনা বাহিনী পরাজিত হইল। চীন সিমোনসেকির সন্ধি (Treaty of Shimonoshakı) স্বাক্ষব কবিতে বাধ্য হইল। ইহার শর্তানুসারে (১) চীন পোর্ট-আর্থার, লিযাও-তাং উপদ্বীপ ও পেসকাডোর দ্বীপপুঞ্জ জাপানকে সমর্পণ করিল, (২) জাপান বাণিজ্যিক সুবিধালাভ করিল এবং (৩ কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল।

কাবণ : কোবিযার প্রশ্ন লইযা চীন ও জাপানেব মধ্যে বিবাদ

এই যুদ্ধের ফলে জাপানের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল; জাপানের আত্মসচেতনা সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল; চীনের দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া চীনে পাশ্চাত্য দেশগুলির শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল, চীনের অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হইল এবং ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পাদিত অসম চুক্তিগুলি নাকচ করিতে জাপান সমর্থ হইল

যুদ্ধের গুরুত্ব

(২) **রুশ-জাপান যুদ্ধ** (১৯০৪-০৫) : চীন তথা সুদূর প্রাচ্যের সহিত রাশিয়ার স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত ছিল। সুদূর-প্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তৃতির পথে জাপানকে প্রধান অন্তরায় মনে করিয়া রাশিয়া সিমোনসেকির সন্ধির রদবদল করিতে অগ্রণী হইয়াছিল। রাশিয়া জাপানকে লিয়াও-তাং উপদ্বীপ ও পোর্ট-আর্থরের উপর দাবি-দাওয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। জাপান রাশিয়ার এই আচরণ কখনও বিস্মৃত হয় নাই। মাঞ্চুরিয়ার ভবিষ্যৎ লইয়া রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দিল। চীনের বক্সার-বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্য পাঠাইল। রাশিয়ার অগ্রগতিতে ইংল্যাণ্ডও আশঙ্কিত হইল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী সম্পাদিত হইল। এই মৈত্রীর মধ্যেই রুশ-জাপান যুদ্ধের পূর্বাভাষ সূচিত হইল। স্বার্থ রক্ষার্থে রাশিয়া চীনের নিকট দাবি করিল যে মাঞ্চুরিয়ায় একমাত্র রাশিয়া ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রকে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া চলিবে না। চীন এই দাবি অগ্রাহ্য করিলে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়াকে রুশ-সাম্রাজ্যভুক্ত প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহা ছাড়া রাশিয়া কোরিয়ায় একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতে উদ্যোগী হইলে জাপান প্রস্তাব করিল যে রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানের স্বার্থ স্বীকার করিবে এবং জাপান মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ায় স্বার্থ স্বীকার করিবে। রাশিয়া ইহাতে অসম্মত হইলে রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হইল। রাশিয়া পরাজিত হইল এবং পোর্টসমাউথের সন্ধি (Treaty of Portsmouth-1905) দ্বারা যুদ্ধের অবসান হইল। ইহার শর্তানুসারে (১) কোরিয়ায় জাপানের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইল, (২) রাশিয়া জাপানকে লিয়াও-তাং ও শাখালিন দ্বীপের কিছু অংশ ছাড়িয়া দিল এবং (৩) রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে সম্মত হইল।

কারণ

সুদূর প্রাচে রাশিয়ার অগ্রগতি

ইংল্যাণ্ড ও জাপানের আশঙ্কা : ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী

কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া সম্পর্কে জাপানের প্রস্তাব, রাশিয়া কর্তৃক প্রত্যাখ্যান

পোর্টসমাউথের সন্ধি

রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে (১) সাময়িকভাবে সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি স্থগিত রহিল, (২) রাশিয়ার পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রুশ-বিপ্লব আসন্ন হইল, (৩) জাপানের সামরিক শক্তি ও জাতীয় মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, (৪) পাশ্চাত্য শিক্ষা, শাসন ও সামরিক পদ্ধতির অনুকরণে রাষ্ট্র ও সমাজ পুনর্গঠনের প্রয়োজন চীনবাসী উপলব্ধি করিল

যুদ্ধের গুরুত্ব

এবং (৫) আমেরিকার মনরো-নীতি সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হইল এবং সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে আমেরিকা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল।

জাপানের পররাষ্ট্র-নীতি (১৯০৫-'১৯)ঃ পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবন পুনর্গঠন করার পর হইতে জাপান ক্রমশঃ সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। প্রথমে চীন-জাপান যুদ্ধে এবং পরে রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপান নিজ শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিল এবং সাম্রাজ্যবাদের পথে বহুদূর অগ্রসর হইল। চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে জাপান আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইল এবং রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করিল। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপানের সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হইল। পোর্টসমাউথ সন্ধির কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান কোরিয়া স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ইওরোপে ব্যস্ত থাকায় জাপান এশিয়ায় এবং বিশেষ করিয়া চীনে স্বীয় প্রতিপত্তি সুদৃঢ় করিতে প্রয়াস পাইল। জাপান মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া চীনে জার্মানী-অধিকৃত কিয়াওচাও ও সাণ্টুং প্রদেশ দখল করিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনের নিকট 'একুশ-দফা-দাবি' করিল। যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া জাপান উহার অধিকাংশ দাবি আদায় করিল। ইহার ফলে চীনের দ্বার ইওরোপের নিকট রুদ্ধ হইল। অতঃপর জাপান সুদূর-প্রাচ্য হইতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যাবতীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিশ্চিহ্ন করিয়া "এশিয়া-এশিয়াবাসীদের জন্য"—এই নীতির ভিত্তিতে আপন প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যোগী হইল। মিত্রপক্ষে যোগদান করার পুরস্কারস্বরূপ ভার্সাই সম্মেলনে (১৯১৮ খৃঃ) মিত্রপক্ষ জাপানের 'একুশ-দফা দাবি' সমর্থন করিল। ওয়াশিংটন বৈঠকের (১৯২১-২২ খৃঃ) সিদ্ধান্ত অনুসারে জাপান প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সাণ্টুং প্রদেশটি চীনকে ফিরাইয়া দিল কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় জাপানের 'বিশেষ-স্বার্থ' স্বীকৃত হইল।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় পর্ব

সংক্ষিপ্তসার

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতাঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে শুরু হইয়া সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যম হ্রাস পায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পুনরায় ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ইহার পশ্চাতে ছিল শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত কারণ। আফ্রিকা, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই প্রতিযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করে।

আফ্রিকাঃ ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে সর্বপ্রথম ফ্রান্সই আফ্রিকায় আলজিরিয়া, মরক্কো, টিউনিস প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। মিশরে ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়াম-রাজ লিওপোল্ড কঙ্গো স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিলে আফ্রিকার বণ্টনকার্য শুরু হয়। ফ্রান্স কঙ্গো নদীর দক্ষিণ উপকূল দখল করে। ইহা ছাড়া আলজেরিয়া, মরক্কো, টিউনিস, পশ্চিম-

আফ্রিকা, ফরাসী-সোমলিল্যাণ্ড, মাদাগাস্কার প্রভৃতি স্থান ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়। এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও পূর্ব আফ্রিকা পর্তুগালের অধিকারভুক্ত হয়। ত্রিপোলী, ইটালীয়, সোমালিল্যাণ্ড, এরিত্রিয়া—প্রভৃতি স্থান ইটালীর অধিকারভুক্ত হয়। কেপ-কলোনী, অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেট্, নাটাল, ট্রান্সভাল, রোডেশিয়া, বেচুয়ানাল্যাণ্ড, ব্রিটিশ-সোমালিল্যাণ্ড, সুদান, মিশর প্রভৃতি স্থান ইংল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত হয়। এইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে আফ্রিকায় ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছিল উহার উদ্ভব হয় আফ্রিকা হইতে।

চীন ঃ আয়তনের দিক দিয়া চীন সাম্রাজ্য ইওরোপ অপেক্ষা সুবিস্তৃত ছিল। চীনের সভ্যতা সুপ্রাচীন। এশিয়ার বহু অঞ্চলে চীনের সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সম্রাটের অধীনে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ছিল প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যের সুদূর প্রদেশগুলি গভর্ণর শাসিত ছিল। চীনবাসী স্বভাবতঃই গোঁড়াপন্থী। সমাজে বণিকগণ যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী ছিল।

সুদূর অতীত কাল হইতে চীন পাশ্চাত্য দেশগুলির নিকট পরিচিত ছিল। রোমের বিলাস-সামগ্রী চীনে সমাদৃত হইত এবং আরব ও পারস্যের সহিত চীনের কূটনৈতিক বিনিময় চলিত। কিন্তু বহির্জগতের সহিত চীন সর্বোতভাবে সম্পর্ক বর্জন করিয়া চলিত। ষোড়শ শতাব্দী হইতে পর্তুগীজ, স্পেনীয়, ওলন্দাজ, ইংরাজ প্রভৃতি ইওরোপীয় বনিকগণ চীনে আসিতে শুরু করে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চীন ইওরোপীয় বণিকগণকে কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। ইওরোপে অবাধ বাণিজ্য নীতি গৃহীত হওয়ায় ইওরোপীয়গণ চীনেও এই নীতির প্রয়োগ করিয়া অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দাবি করিল। কিন্তু চীন সরকার ইহাতে অসম্মত হইলে ইওরোপীয় বণিকদের সহিত সংঘর্ষের সূত্রপাত হইল। অবশেষে অহিফেন ব্যবসার প্রশ্ন লইয়া ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ হইল। চীন পরাজিত হইল এবং উহার পাঁচটি বন্দর ইওরোপীয়দের নিকট উন্মুক্ত হইল। এই যুদ্ধের কয়েক বৎসর পর তুচ্ছ কারণে দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ হইল। চীন পুনরায় পরাজিত হইল এবং উহার এগারোটি বন্দর ইওরোপীয়দের নিকট উন্মুক্ত হইল। ইহার পর হইতে বহিঃশক্তি কর্তৃক চীনের রাজ্যগ্রাস ও অর্থনৈতিক শোষণ শুরু হইল। চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে ইওরোপীয়দের প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল এবং চীনের বাণিজ্য, শুল্ক ও ডাক বিভাগ ইওরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন হইল। চীন সাম্রাজ্যে ইওরোপীয়দের অধিকার বিস্তার ও উহাদের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে চীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। বক্সার বিদ্রোহে চীনের বিদেশী-বিরোধী মনোভাব সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। অপদার্থ চীন-সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণ সংস্কার আন্দোলন শুরু করিল। অবশেষে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ডাঃ সান-ইয়াত-সেন ও তাঁহার কুয়োমিং-তাং দল দক্ষিণ চীনে প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চু-বংশের পতন হইলে চীনে প্রজাতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত হইল। কিন্তু চীনের ঐক্যবন্ধন তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। চিয়াং-কাইশেক সমর-নায়কগণকে দমন করিয়া চীনের ঐক্যবন্ধন সম্পূর্ণ করেন।

জাপান ঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপানের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা অনেকটা মধ্যযুগের ইওরোপের মত ছিল। অভিজাত, সামুরাই ও সার্ফ—এই তিনটি শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত ছিল। দেশের সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাট। কিন্তু সেই সময় রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা 'সোগান' উপাধিধারী শাসনকর্তার হস্তগত ছিল।

চীনের ন্যায় জাপানও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু ষোড়শ-শতাব্দী হইতে ইওরোপীয় বণিক ও মিশনারীগণ জাপানে আসিতে আরম্ভ করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ সেনাপতি কমডোর পেরি জাপান সরকারকে সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। আমেরিকার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ইওরোপের অপরাপর দেশগুলি জাপানের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিল। বহির্জগতের সহিত যোগসূত্রে স্থাপিত হওয়ার পর হইতে জাপানের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসিল। পাশ্চাত্য দেশগুলির বিরুদ্ধে দেশকে শক্তিশালী করিয়া তুলি-

বার উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জাপানে এক আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সংঘটিত হইল। সোগান পরিবারের আধিপত্য হইতে জাপানের সম্রাটকে মুক্ত করা হইল এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করা হইল। জাপান আধুনিকতার পথে অগ্রসর হইল।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে জাপান সাম্রাজ্যবাদী-নীতি গ্রহণ করিল। কোরিয়ার আধিপত্যের প্রশ্ন লইয়া চীন-জাপান যুদ্ধ ও মাঞ্চুরিয়ার প্রশ্ন লইয়া রুশ-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হইল। উভয় যুদ্ধেই জাপান জয়লাভ করিয়া সুদূর প্রাচ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র-পক্ষে যোগদান করিয়া জাপান চীনের কিছু অংশ দখল করিল। ভার্সাই সম্মেলনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের 'বিশেষ-স্বার্থ' স্বীকৃত হইল।

প্রশ্নমালা

১। আফ্রিকা বণ্টনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।
[Give a short account of the partition of Africa.] উ: ১৫৮-১৬১ পৃ: দেখ

২। আফ্রিকা বণ্টনের ফলাফল কি হইয়াছিল ?
[What were the consequences of the partition of Africa ?] উ: ১৬১ পৃ: দেখ

৩। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত চীনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
[Give an account of the history of China from the mid-19th century to the First World War.] উ: ১৬৩-১৬৮ পৃ: দেখ

৪। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চীনের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং চীনের সহিত ইওরোপের সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।
[Give an account of the Political and Social systems of China up to mid-19th century and its relations with the European powers.]
উ: ১৬২-১৬৩ পৃ: দেখ

৫। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চীনের নব-জাগরণ সম্পর্কে কি জান ?
[What do you know about the Nationalistic rising of China in the first decade of 20th century.] উ: ১৬৫-১৬৭ পৃ: দেখ

৬। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাপানের অভ্যুত্থানের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
[Describe shortly the rise of Japan from the mid-19th century to the First World War.] উ: ১৬৭-১৭০ পৃ: দেখ

৭। ১৮৬৭ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের পররাষ্ট্র-নীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।
[Give an account of the foreign policy of Japan from 1867 to 1921.]
উ: ১৭০-১৭২ পৃ: দেখ

৮। চীন-জাপান ও রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ ও গুরুত্ব আলোচনা কর।
[Describe the causes and consequences of the Sino-Japanese and Russo-Japanese wars.] উ: ১৭০-১৭২ পৃ: দেখ

৯। প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের কারণ ও গুরুত্ব আলোচনা কর।
[Describe the causes and consequences of the First Anglo-Chines war.]
উ: ১৬৪ পৃ: দেখ

নবম অধ্যায়

আমেরিকা (America)

পূর্বাভাষঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। ইওরোপের নানা স্থান হইতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে আমেরিকা মহাদেশে আগমন করিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিল। আমেরিকার ইতিহাস একটি শতাব্দীর মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। ইওরোপীয় দেশগুলির ন্যায় আমেরিকার কোন প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল না। একমাত্র ভৌগোলিক বন্ধন ব্যতীত আমেরিকাবাসীদের মধ্যে কৃষ্টিগত বা ভাষাগত কোন বন্ধন ছিল না বলিলেই চলে। আমেরিকার সমস্যা ও প্রয়োজন ইওরোপের সমস্যা ও প্রয়োজন হইতে ছিল স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্রভাবেই আমেরিকা উহার সমাধান করিয়াছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে আমেরিকার ইতিহাস (আভ্যন্তরীণ)

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার তেরটি উপনিবেশের বিদ্রোহ হইতে স্বাধীন আমেরিকার উৎপত্তি হয়। পর বৎসর আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত ভার্সাই সন্ধি অনুসারে আমেরিকার স্বাধীনতা ইংল্যাণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত হয়। কিন্তু শান্তি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন আমেরিকার সম্মুখে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমেরিকা অতিরিক্ত মাত্রায় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ অচল অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ফ্রান্স এযাবৎ যে সকল সুযোগ-সুবিধা আমেরিকাবাসীকে দিয়া আসিতেছিল তাহাও প্রত্যাহার করা হইয়াছিল। ফলে আমেরিকায় এক দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়াছিল।

অর্থনৈতিক সমস্যা

অর্থনৈতিক সমস্যার সহিত রাজনৈতিক সমস্যাও প্রকট হইয়া উঠিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের মধ্যে আঞ্চলিক বিবাদ পুনরায় দেখা দিল। যুদ্ধের সময় আমেরিকার সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত একটি কংগ্রেসের হস্তে শাসনভার অর্পণ করা হইয়াছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রগুলির অবিশ্বাস এতই প্রবল ছিল যে প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ক্ষমতাই ছিল না। ফলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

রাজনৈতিক সমস্যা

নূতন শাসনতন্ত্র ঃ আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংহতি বজায় রাখিয়া এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়োজন হইল। এই উদ্দেশ্যে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বে ফিলাডেলফিয়া শহরে সকল রাষ্ট্রের এক সম্মেলন আহূত হইল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করিয়া এক নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইল। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গৃহীত হইল। কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ-রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইল।

কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ-রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন

নূতন শাসনতন্ত্রকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইল—কংগ্রেস (আইন-পরিষদ), প্রেসিডেন্ট ও সুপ্রীমকোর্ট। যুক্ত রাষ্ট্রীয় সরকারের সর্বোপরি রহিলেন প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি।

শাসনতন্ত্রের তিনটি অংশ

জর্জ ওয়াশিংটন ঃ জর্জ ওয়াশিংটন সর্বসম্মতিক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্রষ্টা জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সম্মানের অধিকারী। তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার ফলে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমদিকে বহু বিপদ কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাঁহার পররাষ্ট্র সচিব জেফারসন ও রাজস্বসচিব হ্যামিল্টনের চেষ্টায় আভ্যন্তরীণ উন্নতি সম্ভব হইল। হ্যামিল্টনের চেষ্টায় জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল, বাণিজ্য-পোত নির্মাণে উৎসাহ ও সরকারী সাহায্য দেওয়া হইল এবং বিভিন্ন অঙ্গ-রাষ্ট্রের যুদ্ধ-ঋণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিলেন। এই সকল বিবিধ ব্যবস্থার ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। পর পর দুইবার প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইবার পর ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটন এই পদ পরিত্যাগ করেন।

জন এ্যাডামস্ ঃ জর্জ ওয়াশিংটনের পর জন এ্যাডামস্ প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। তাঁহার সম্মুখে সমস্যাগুলি ছিল জটিল। এই সময় ইওরোপে ফরাসী বিপ্লব শুরু হইয়াছিল। ইতিপূর্বে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধির (১৭৭৮ খৃঃ) শর্তানুসারে ফ্রান্স ইওরোপের বিরুদ্ধে আমেরিকার সক্রিয় অংশ গ্রহণের দাবি করিল। ইহা ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ফ্রান্স আমেরিকাকে যে ঋণ দিয়াছিল তাহাও পরিশোধ করার জন্য ফ্রান্স আমেরিকাকে চাপ দিল। যাহা হউক, ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আমেরিকার সহিত মীমাংসা করিয়া লইলেন এবং ফ্রান্সের প্রাপ্য অর্থ পরিত্যাগ করিলেন। আমেরিকা ইওরোপের ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিল। এ্যাডামস্-এর আমলেই 'ফেডারেলিস্ট' ও 'রিপাবলিকান-ডেমোক্রাট' এই দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে তীব্র বিবাদের সৃষ্টি হয়।

থোমাস জেফারসন ঃ এ্যাডামস্-এর পর ডেমোক্রাট দলের প্রার্থী থোমাস জেফারসন প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। তাঁহার আমলে আমেরিকার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। সরকারী ব্যয়সংকোচ করিয়া, বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া এবং কৃষিকার্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া তিনি অর্থনৈতিক অবস্থার

উন্নতি করিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জেফারসন নেপোলিয়নের নিকট হইতে সামান্ত মূল্যে লুসিয়ানা ক্রয় করিলেন। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারিত হইল।

জেমস্ ম্যাডিসন ও জেমস্ মন্‌রো : থোমাস জেফারসনের পর যথাক্রমে জেমস্ ম্যাডিসন ও জেমস্ মন্‌রো প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হন। তাঁহাদের আমলে আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের কার্য দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহণ-ব্যবস্থা উন্নত হইল। উত্তর আমেরিকায় বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। দক্ষিণ আমেরিকায় বহু অঞ্চল বাসস্থানের উপযোগী করিয়া তোলা হইল এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করা হইল।

এ্যানড্রু জ্যাকসন : ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এ্যানড্রু জ্যাকসন প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হন। তিনি বহু দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করিয়া শাসন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক উঠাইয়া দিয়া সরকারী অর্থ বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বণ্টন করিয়া দিলেন। ইহার ফলে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় এক দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছিল। তাঁহার আমলের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল দক্ষিণ আমেরিকা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শুল্ক-সংক্রান্ত বিবাদ। যাহা হউক, শেষপর্যন্ত শুল্ক-সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক মীমাংসা হইল।*

আব্রাহাম লিঙ্কন : বুকাননের পর আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হইলেন। তাঁহার আমলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি

(উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত)

ফরাসী বিপ্লবের সময় আমেরিকার নিরপেক্ষতার নীতি

স্বাধীনতা লাভের পর আমেরিকাবাসীর দৃষ্টি আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের প্রতি অধিক নিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব এবং ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইলে আমেরিকার পক্ষে উদ্বেগের কারণ ঘটিল। কিন্তু আমেরিকা বিবদমান কোন রাষ্ট্রের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া পররাষ্ট্র ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকার নীতি গ্রহণ করিল।

ফরাসী বিপ্লবের প্রতি আমেরিকাবাসী সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ফ্রান্স আমেরিকাকে যে সাহায্য করিয়াছিল আমেরিকাবাসী সেইজন্য ফরাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই। আমেরিকার

*জ্যাকসনের পর গৃহযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত অপরাপর রাষ্ট্রপতি ছিলেন ভ্যান-বিউবেন (১৮৩৭-৪১), হ্যারিসন (১৮৪১), টাইলার (১৮৪১-৪৫), পক্ (১৮৪৫-৪৯), টেলার (১৮৪৯-৫০), ফিলমোর (১৮৫০-৫৩), পিয়ার্স (১৮৫৩-৫৭), বুকানন (১৮৫৭-৬১)।

জনমত ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্য করার পক্ষপাতী না হইলেও জর্জ ওয়াশিংটন ইহা সমর্থন করেন নাই। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটন সরকারীভাবে ইওরোপের ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সময় ইওরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রই আমেরিকা হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিতে থাকায় আমেরিকায় এক অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিল। ইহাতে ইংল্যাণ্ড ঈর্ষান্বিত হইল এবং আমেরিকার বাণিজ্যপোত আটক করিতে লাগিল। ইংল্যাণ্ডের এই আচরণে আমেরিকাবাসী বিক্ষুব্ধ হইল এবং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি করিল। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন নিরপেক্ষতার নীতি বজায় রাখিয়া ইংল্যাণ্ডের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন। জে'র সন্ধি (Jay's Treaty—জে ছিলেন আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক) নামক এক সন্ধি দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আপস-মীমাংসা হইল।

প্রেসিডেণ্ট জেফারসনের আমলে আমেরিকা সকল রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল।

ইংল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ

সকল রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলা সত্ত্বেও ১৮১২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিল। সম্রাট নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডের পণ্যদ্রব্য যাহাতে ইওরোপের কোন দেশের বন্দরে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য এক অবরোধ ঘোষণা করিলেন। ইহার প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ড এক ঘোষণার দ্বারা ফ্রান্স ও উহার মিত্রবর্গের সহিত বিশ্বের নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিল। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে আমেরিকাই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমেরিকাবাসী ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি করিল এবং শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল। সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

ফলাফল

এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইল এবং প্রাদেশিক মনোভাব বহুলাংশে দূরীভূত হইল।

মনরো-নীতি

ইঙ্গ-আমেরিকার যুদ্ধের পর হইতে প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত আমেরিকা ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া আভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণ ও উন্নতির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় অবস্থিত স্পেনের উপনিবেশগুলি বিদ্রোহী হইলে স্পেন ইওরোপীয় রাষ্ট্রসংঘ (Concert of Europe)-এর নিকট সাহায্য চাহিল। আমেরিকা মহাদেশ ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের দ্বন্দ্বস্থলে পরিণত হইতে পারে এবং ইহার ফলে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও সম্প্রসারণ ব্যাহত হইতে পারে এই আশঙ্কায় রাষ্ট্রপতি মনরো তাঁহার বিখ্যাত ঘোষণা প্রচার করিলেন (১৮২৩ খৃঃ)। ইহা 'মনরো-নীতি' (Monroe Doctrine) নামে পরিচিত। মনরো সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিলেন

মনরো-নীতির উদ্দেশ্য

যে আমেরিকা মহাদেশের কোন অংশে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের উপনিবেশ স্থাপন করা বা আমেরিকা মহাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে উহাদের হস্তক্ষেপ করা চলিবে না; বৈদেশিক কোন রাষ্ট্র আমেরিকা মহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিলে আমেরিকা তাহা মিত্রতা-বিরোধী কার্য বলিয়া বিবেচনা করিবে। এই ঘোষণার ফলে (১) ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ আমেরিকা মহাদেশে হস্তক্ষেপ করিতে আর সাহসী হইল না, (২) মনরো-নীতি ভবিষ্যতে 'প্যান-আমেরিকানিজম' বা নিখিল আমেরিকাবাদের সূচনা করিল, (৩) ইওরোপের রাজনৈতিক জটিলতা হইতে দূরে থাকিয়া যুক্তরাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানের সুযোগ পাইল এবং (৪) দক্ষিণ আমেরিকার নিরাপত্তা যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত হইল।

মনরো-নীতির ফলাফল

আব্রাহাম লিঙ্কন ও আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

(Abraham Lincoln and Civil War)

প্রথম জীবনঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম স্রষ্টা আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কেণ্টাকির এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতাহেতু বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ছিল প্রবল। তিনি ছিলেন দয়াবান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও সরল প্রকৃতির। তিনি কিছুদিন এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কেরানীর পদে নিযুক্ত থাকেন। পরে তিনি স্বেচ্ছাসৈনিক রূপে আমেরিকার সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং 'রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধশেষে তিনি কিছুদিন স্থানীয় পোস্ট অফিসে পোস্টমাস্টার পদে নিযুক্ত থাকেন।

রাজনৈতিক জীবনঃ ইহার পর লিঙ্কন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইলিয়নোস আইন-পরিষদে কয়েকবৎসর সভ্যরূপে থাকিয়া রাজনীতি সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ পান। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইলিয়নোস আইন-সভার ডগ্লাস নামক জনৈক সদস্যের সহিত রিপাবলিকান দলের আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে এক বিতর্কে আব্রাহাম অসাধারণ বাগ্মিতা ও ক্ষমতার পরিচয় দেন। সেই বৎসর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি রিপাবলিকান দলের পক্ষ হইতে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হন। সেই সময় ডেমোক্র্যাটিক দলের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হওয়ায় আব্রাহাম অতি সহজেই প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হন।

লিঙ্কনের উদ্দেশ্য ও নীতিঃ আব্রাহামের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করা। সেই সময় আমেরিকাবাসীদের নিকট দাসপ্রথার প্রশ্ন একটি জটিলতম প্রশ্ন ছিল। এই প্রশ্ন লইয়া দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকিত। লিঙ্কন দাসপ্রথাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি ও ঐক্যের জন্য দাসপ্রথার

বিলুপ্তি প্রয়োজন। শিল্প-প্রধান উত্তর আমেরিকায় দাসপ্রথার অবসান ঘটিয়াছিল। কিন্তু কৃষি-প্রধান দক্ষিণ আমেরিকায় এই প্রথা বাঁচইয়া রাখার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হইলে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি স্বভাবতঃই দাসপ্রথার উচ্ছেদের আশঙ্কা করিতে লাগিল।

লিঙ্কন ও গৃহযুদ্ধ: দুইটি বিষয় লইয়া উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল—যেমন দাসপ্রথার অবসান ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে কোন অঙ্গরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার। দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলি মনে করিত যে দাসপ্রথার অবসান ঘটিলে কৃষি-প্রধান দক্ষিণ আমেরিকা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু শিল্প-প্রধান উত্তর আমেরিকায় ক্রীতদাসের কোন প্রয়োজন ছিল না এবং এই কারণে উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি দাসপ্রথার উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিল। দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিটি রাজ্য মনে করিত যে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্বার্থ রক্ষাকল্পেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সেই স্বার্থ রক্ষা না হইলে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার উহাদের আছে। ইহা ছাড়া শুল্কের ব্যাপারেও আমেরিকার উত্তর অংশের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেন যে দাসপ্রথা থাকুক বা না থাকুক দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার কখনই দেওয়া যাইতে পারে না এবং সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করা হইবে।

কারণ

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-ক্যারোলিনা নামক উপনিবেশের নেতৃত্বে আলাবামা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, টেক্সাস ও জর্জিয়া প্রভৃতি দক্ষিণী রাজ্যসমূহ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি পৃথক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিল। উহারা এক জাতীয় পাতাকাও গ্রহণ করিল। ইহার পর উহারা সামটার নামক দুর্গটি আক্রমণ করিল। এই অবস্থায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আব্রাহাম দক্ষিণী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। পর বৎসর দাসপ্রথার উচ্ছেদকল্পে তিনি এক ঘোষণা দ্বারা সমগ্র আমেরিকা মহাদেশ হইতে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করিলেন এবং ক্রীতদাসমাত্রকেই স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা দান করিলেন। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণী রাজ্যগুলি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অখণ্ডতা রক্ষা পাইল এবং দাসপ্রথাও আমেরিকা মহাদেশ হইতে বিলুপ্ত হইল।

মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী উত্তর আমেরিকার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের উচ্চশ্রেণী ও বণিকগণ দক্ষিণ-আমেরিকার রাজ্যগুলিকে সমর্থন করিয়াছিল। কারণ কৃষিপ্রধান দক্ষিণ আমেরিকা ছিল ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত সামগ্রীর বৃহৎ বাজার। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সরকারীভাবে নিরপেক্ষ থাকিলেও দক্ষিণী রাজ্যগুলির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। কিন্তু গৃহযুদ্ধের সময় দুইটি ঘটনা ইংল্যাণ্ড ও যুক্ত-

আব্রাহাম ও 'ট্রেণ্ট'-ঘটনা

রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রথমটি হইল 'ট্রেন্ট-ঘটনা'। গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলি 'ট্রেন্ট' নামক একটি ব্রিটিশ জাহাজে উহাদের দুইজন দূতকে ইংল্যাণ্ডে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু পথে উত্তর আমেরিকার একটি জাহাজ ট্রেন্টকে আটক করিয়া উক্ত দূতগণকে ধরিয়া লইয়া যায়। ইংল্যাণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিলে লিঙ্কন দূত দুইজনকে প্রত্যার্পণ করেন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া ইংল্যাণ্ডের সহিত বিরোধের মীমাংসা করেন। দ্বিতীয়টি হইল 'আলাবামা' ঘটনা।

আলাবামা ঘটনা

'আলাবামা' নামক ইংল্যাণ্ডে নির্মিত একখানি জাহাজ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে বা অসাবধানতাবশতঃ দক্ষিণ-আমেরিকায় রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক উত্তর আমেরিকার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। গৃহযুদ্ধের অবসানে যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষতা ভঙ্গের জন্য ইংল্যাণ্ডকে দায়ী করিল। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায় অনুসারে ইংল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মার্কিন গৃহযুদ্ধ অবসানের কয়েক দিনের মধ্যেই এক অভিনয়-

লিঙ্কনের হত্যা

গৃহে জন্ উইলকিস বুথ নামক এক অভিনেতার মত্ত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত গুলিতে আব্রাহাম নিহত হন।

আব্রাহামের কৃতিত্ব: জর্জ ওয়াশিংটনকে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের স্রষ্টা বলা যাইতে পারে, লিঙ্কনকেও তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষাকর্তা বলা যাইতে পারে। তাঁহার সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা পাইয়াছিল। দাসপ্রথার উচ্ছেদ তাঁহার অন্যতম কৃতিত্ব। দাসপ্রথার বিলোপ সাধন করিয়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

মার্কিন গৃহযুদ্ধের কারণ

(১) শুল্ক-সংক্রান্ত বিরোধ: উত্তর আমেরিকা ছিল শিল্প-প্রধান ও দক্ষিণ আমেরিকা ছিল কৃষি-প্রধান। উত্তরাঞ্চল শুল্ক সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিল কিন্তু দক্ষিণাঞ্চল অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং শুল্ক-সংক্রান্ত প্রশ্ন উভয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল।

(২) দাসপ্রথা সম্পর্কিত বিরোধ: দাসপ্রথার প্রশ্ন লইয়া উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যে বিরোধ তীব্র হইয়াছিল। স্বাধীনতালাভের কিছুদিনের মধ্যেই উত্তরাঞ্চলে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্পাস শিল্প রক্ষা করার জন্য দক্ষিণাঞ্চল এই প্রথা বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর ছিল। মিসৌরী-চুক্তি (১৮২০খৃঃ) দ্বারা উভয় পক্ষে এক আপস-মীমাংসা হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দাসপ্রথা বিরোধী মনোভাবাপন্ন আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

(৩) রাজনৈতিক বিরোধ: সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে উত্তরাঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের সকল ব্যাপারে প্রাধান্য ভোগ করিতেছিল: এই কারণে দক্ষিণাঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের

সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল দক্ষিণাঞ্চলের এই চেষ্টা মার্কিন গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

মার্কিন গৃহযুদ্ধের ফলাফল

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা: দক্ষিণ আমেরিকার পরাজয়ের ফলে আমেরিকা মহাদেশের অখণ্ডতা রক্ষা পাইল। অতঃপর যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার অবকাশ পাইল। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গ-রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত হইল। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

(২) দাসপ্রথার বিলুপ্তি: আমেরিকা মহাদেশে দাসপ্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হইল। ইহার ফলে আমেরিকা গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হইল।

(৩) দক্ষিণাঞ্চলে শিল্পের প্রসার: দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটিলে দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি-বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইল। এই অবস্থায় দক্ষিণাঞ্চল বাণিজ্য ও শিল্প-প্রসারে উদ্যোগী হইল। শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনে পরিবর্তন ঘটিল।

(৪) নিগ্রো সমস্যা: দাসপ্রথা বিলুপ্ত হইলে দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। ইহাতে আশঙ্কিত হইয়া তথাকার শ্বেতকায়গণ বহু গুপ্ত-সমিতি গঠন করিয়া নিগ্রো-দমনে উদ্যোগী হইল। নিগ্রোগণ দাসত্ব হইতে মুক্ত হইল বটে কিন্তু নিরক্ষরতাহেতু উহারা বহুদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিল। গৃহযুদ্ধের পরবর্তীকালে নিগ্রো-সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছিল।

গৃহযুদ্ধের পর হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস

আভ্যন্তরীণ নীতি: ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মার্কিন গৃহযুদ্ধের অবসান হইল বটে কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইল না। দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা তীব্র হইয়া দেখা দিল।

দক্ষিণ আমেরিকার বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকার প্রতিশোধ স্পৃহা

১৮৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের পুর্গঠন-আইন (Reconstruction Act) অনুসারে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রসংঘভুক্ত রাজ্যগুলিতে সামরিক শাসন চালু করা হইল। নিগ্রোগণকে লইয়া প্রতিটি রাজ্যে একটি করিয়া শাসন-পরিষদ গঠন করা হইল। এককথায় দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতকায়দের উপর নিগ্রো ও উত্তরাঞ্চলের অত্যাচারমূলক শাসন শুরু হইল। ইহা 'কাল-বিভীষিকা' (Black Terror) নামে খ্যাত। সর্বত্র কুশাসন ও

দক্ষিণ আমেরিকার নিগ্রো-শাসন

সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি চলিল। এই অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতকায়গণ সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপশুরু করিল। ইহারা বহু গুপ্ত-সমিতি গঠন করিয়া নিগ্রোদের মনে ভীতির সঞ্চার করিল এবং উত্তরাঞ্চল হইতে আগত কর্মচারীগণকে বিতাড়িত করিতে লাগিল। এই সকল সমিতির মধ্যে 'কু-ক্লাক্স-ক্লান' (Ku-Klux-Klan), 'হোয়াইট-ব্রাদারহুড' (White Brotherhood) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে ধীরে ধীরে শ্বেতকায়গণ দক্ষিণাঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিল এবং সমাজিক আইন-বিধির প্রবর্তন করিয়া কৃষ্ণকায়গণকে সকল সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিল। রেলপথের সম্প্রসারণের ফলে আমেরিকার উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইল এবং উভয়ের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধের সূচনা হইল।

নিগ্রো ও উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে শ্বেতকায়গণের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে ঐক্যসাধন

মার্কিন গৃহযুদ্ধের পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণ ও আভ্যন্তরীণ উন্নয়নকার্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। পশ্চিমদিকে মিসিসিপি অঞ্চল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারিত হইল। সীমানা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে রেলপথের সম্প্রসারণ চলিল। মিসিসিপি অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারিত হইলে রেড ইণ্ডিয়ানদের সহিত শ্বেতকায়দের সংঘর্ষ শুরু হইল এবং রেড্-ইণ্ডিয়ান-গণ নানাভাবে নির্যাতিত হইতে লাগিল। মিসিসিপি ছাড়াও টেকসাস্, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার বিস্তৃত হইল।

আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন

এদিকে শিল্পোন্নতিও দ্রুত হইতে লাগিল। পশ্চিমাঞ্চলে অধিকার বিস্তারের ফলে সেই অঞ্চলে উত্তরাঞ্চলের শিল্পজাত সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইল। খনিজ তৈল, লৌহ, মোটরগাড়ী প্রভৃতির উৎপাদনে আমেরিকা বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাবাসীদের জীবনধারণের মানও উন্নত হইয়া উঠিল।

পররাষ্ট্রনীতি (উনবিংশ শতাব্দীতে)

স্বাধীনতালাভের পর হইতে গৃহযুদ্ধের সময় পর্যন্ত আমেরিকা ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও জাতীয় সংহতি আনয়নকল্পে এইরূপ নীতির প্রয়োজনও ছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পর বহুদিন পর্যন্ত আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি মনরো-নীতিকে অবলম্বন করিয়াই অনুসৃত হইয়াছিল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধেই মনরো-নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল।

মন্‌রো নীতির প্রয়োগ

মেক্সিকোর ব্যাপারে (১৮৬৪ খৃঃ) ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন হস্তক্ষেপ করিলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মনরো-নীতি প্রয়োগ করার সুযোগ পাইল। আমেরিকা অনতিবিলম্বে মেক্সিকো হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণের দাবি জানাইল এবং নেপোলিয়ন তাহা পালন করিতে বাধ্য হইলেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স

গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক ইংল্যাণ্ডের 'আলাবামা' নামক যুদ্ধজাহাজটি উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল। যুদ্ধ অবসানে নিরপেক্ষতা ভঙ্গের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যাণ্ডের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করিল। ইংল্যাণ্ড তাহা প্রদানে বাধ্য হইল।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ড

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা রাশিয়ার নিকট হইতে আলাস্কা ক্রয় করিল। ইহার ফলে আমেরিকার আর্থিক লাভ হইল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ভেনিজুয়েলার মধ্যে সীমানা সম্পর্কিত বিরোধ উপস্থিত হইলে যুক্তরাষ্ট্র মনরো-নীতির সম্প্রসারণ ও ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপনের সুযোগ পাইল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করিলেন যে আমেরিকা মহাদেশে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চলিবে না। যাহা হউক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইংল্যাণ্ড ও ভেনিজুয়েলার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল এবং আমেরিকার ল্যাটিন রাষ্ট্রগুলির উপর যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের অভিভাবকত্ব স্বীকৃত হইল।

রাশিয়ার নিকট হইতে আলাস্কা ক্রয়

ভেনিজুয়েলার ব্যাপার

অতঃপর যুক্তরাষ্ট্র বহির্জগতে সাম্রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হইল এবং তাহার সুযোগও উপস্থিত হইল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার অন্তর্গত স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত কিউবা স্পেনের কুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। বিদ্রোহীদের উপর স্পেনের দমন-নীতি চলিল। ইহার ফলে কিউবায় ঘোর অরাজকতা ও অশান্তি দেখা দিল। কিউবার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-স্বার্থ জড়িত ছিল। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যাণ্ড কিউবার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার হুমকি দিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের এক রণতরী হ্যাভানা বন্দরে এক দুর্ঘটনার ফলে বিনষ্ট হইলে যুক্তরাষ্ট্র স্পেনকে দায়ী করিল এবং কিউবার স্বাধীনতা দাবি করিল।

যুক্তরাষ্ট্র ও স্পেন

স্পেন ইহাতে অসম্মত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু স্পেন পরাজিত হইল। প্যারিসের সন্ধি (১৮৯৮ খৃঃ) দ্বারা স্পেন পোর্টোরিকো, গুয়াম ও ফিলিপাইন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্পণ করিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণাধীনে কিউবার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল।

প্যারিসের সন্ধি ও যুক্তরাষ্ট্রের লাভ

বিংশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিঃ স্পেনের সহিত যুদ্ধের পর হইতে আমেরিকা ক্রমশঃ সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র হাওয়াই (Hawaii) দ্বীপ দখল করিয়া তথায় একটি নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র সোমায়ান দ্বীপপুঞ্জ দখল করিল। এইভাবে উত্তরোত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা

শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র মন্‌রো-নীতি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বরাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল। এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়াই যুক্তরাষ্ট্র হেগ-সম্মেলনে (১৮৯৯ খৃঃ) যোগদান করিল এবং পরবৎসর চীনের বক্সার-বিদ্রোহের সময় পিকিং-এ একদল সৈন্য প্রেরণ করিল। থিয়োডোর রুজভেল্ট (১৯০১-০৯) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর হইতেই আমেরিকার বিশ্বরাজনীতি সক্রিয় হইয়া উঠিল।

হেগ্‌ সম্মেলনে যোগদান, চীনে হস্তক্ষেপ

কানাডা ও আলাস্কার মধ্যে সীমানা লইয়া বিবাদের সৃষ্টি হইলে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হস্তক্ষেপ করিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থানুকূলে বিবাদের মীমাংসা করিলেন (১৯০৩ খৃঃ)।

কানাডা ও আলাস্কার মধ্যে বিরোধের যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

আতলান্তিক ও প্রশান্তমহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে পানামা খালের উপর যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে 'হে-পাউন্সফোট' সন্ধি (Hay-Pouncefote Treaty) অনুসারে ইংল্যাণ্ড পানামা খালের উপর উহার বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ করিল। পানামা ছিল কলোম্বিয়ার অন্তর্গত একটি প্রদেশ। কলোম্বিয়া গভর্ণমেণ্ট হে-পাউন্সফোট-সন্ধির বিরোধিতা করিল। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত পানামার স্বাধীনতা কলোম্বিয়ার নিকট হইতে আদায় করা হইল এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে খালের খননকার্য সম্পন্ন হইল। পানামা খাল হস্তগত হওয়ায় ক্যারিবিয়ান সাগর ও মধ্য আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উহার প্রতিপত্তি বিস্তারেব পথ সহজ হইল।

পানামা খালের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন

ইহার গুরুত্ব

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল রুশ-জাপানের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা (১৯০৫ খৃঃ)। রুশ-জাপানের যুদ্ধ অচল অবস্থায় আসিয়া পৌছিলে রুজভেল্ট উহাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করিয়া শান্তি স্থাপন করেন।

রুশ-জাপানের যুদ্ধে রুজভেল্টের মধ্যস্থতা

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মরক্কোর ব্যাপার লইয়া ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হইলে যুক্তরাষ্ট্র উহাতে মধ্যস্থতা করিয়া শান্তি স্থাপন করিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিল যদিও মিত্র-শক্তিকে প্রচুর ঋণদান করিয়া তাহাদিগকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতেছিল। কিন্তু জার্মানী আমেরিকার কয়েকটি বাণিজ্য জাহাজ সাবমেরিন দ্বারা বিধ্বস্ত করিলে আমেরিকা মনরো-নীতি পরিত্যাগ করিল এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যভাবে বিশ্ব রাজনীতিতে অবতীর্ণ হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যোগদান

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁহার প্রস্তাব অনুসারেই লীগ-অফ-নেশনস্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটি স্থাপিত হয়। কিন্তু ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানীর প্রতি ঘোরতর অবিচার, যুদ্ধকালে আমেরিকা কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ-পরিশোধ করিতে ইওরোপীয় দেশগুলির অসম্মতি এবং ইওরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক উইলসনের ইওরোপীয়-নীতি গ্রহণে অসম্মতি প্রভৃতি কারণে যুক্তরাষ্ট্র লীগ-অফ-নেশনস্-এ যোগদান করিল না এবং ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাই শ্রেয় মনে করিল।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান

ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি গ্রহণ

দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাস (South America)

দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের উপনিবেশ ঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকার আবিষ্কারের সহিত ভাস্কো-ডা-গামা, ব্যালবোয়া, ফ্রান্সিস্কো ও কার্টের্জ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে জড়িত। পর্তুগীজগণ অ্যামাজন নদী ও ব্রেজিল দেশটি আবিষ্কার করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকার অবশিষ্ট অংশে স্পেন এক বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইওরোপীয়দের বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার বিনাশ ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে ইওরোপীয় সভ্যতার বিস্তার ঘটে। দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনিগুলি স্পেনীয়দের হস্তগত হওয়ায় সেই যুগে স্পেন সর্বাধিক সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকায় স্বাধীনতা আন্দোলন ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে। ইহার মূলে কয়েকটি কারণ ছিল যথা উত্তর আমেরিকাস্থ ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভ ও ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আদর্শ স্পেনীয় উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন স্পেনীয় উপনিবেশগুলির উপর স্পেনের অত্যাচারী শাসন স্পেনীয় ঔপনিবেশিক-গণকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল।

স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন, কারণ

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে পেরু উপনিবেশ সর্বপ্রথম বিদ্রোহী হইল। ইহার পর ভেনিজুয়েলা, চিলি, মেক্সিকো প্রভৃতি উপনিবেশগুলিও বিদ্রোহী হইয়া ভেনিজুয়েলা কন্‌ফেডারেশন (Venezuela Confederation) নামে একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিল (১৮১০ খৃঃ)। প্রথমদিকে স্পেন এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করিতে সমর্থ হইল বটে কিন্তু ১৮২০ খৃষ্টাব্দে স্পেনের গণ-অভ্যুত্থানের সুযোগ লইয়া স্পেনীয় উপনিবেশগুলি পুনরায় বিদ্রোহী হইল। একে একে পেরু, চিলি, ভেনিজুয়েলা ও মেক্সিকো স্বাধীন হইয়া গেল।

পর্তুগীজ উপনিবেশ ব্রেজিলের স্বাধীনতা লাভ (১৮২৬)

স্পেনীয় উপনিবেশগুলির ন্যায় দক্ষিণ আমেরিকার পর্তুগীজ উপনিবেশ ব্রেজিলেও স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভ এবং ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে ব্রেজিলবাসীও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন পর্তুগাল আক্রমণ করিলে উহার রাজা ষষ্ঠ জন্ পলায়ন করিয়া ব্রেজিলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার অধীনে ব্রেজিল একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা লাভ করিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ জন তাঁহার পুত্র পেড্রোকে ব্রেজিলে রখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। পর্তুগালের পার্লামেণ্ট ব্রেজিলকে পুনরায় উপনিবেশ বলিয়া ঘোষণা করিলে ব্রেজিলবাসী বিদ্রোহী হইল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পর্তুগাল ব্রেজিলের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। ব্রেজিলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল।

দক্ষিণ আমেরিকার পরবর্তী ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী): স্বাধীনতা লাভের পর স্পেনীয় উপনিবেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা চলিল। এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন সাইমন বলিভার। তাঁহার চেষ্টায় কয়েকটি উপনিবেশকে সম্মিলিত করিয়া কলম্বিয়া নামক যুক্তরাষ্ট্রটি গঠন করা হইল। কিন্তু পারস্পরিক ঈর্ষা ও স্বার্থ

দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র-গুলিকে সংঘবদ্ধ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা

সংঘাতের ফলে উপনিবেশগুলিকে সংঘবদ্ধ রাখা সম্ভব হইল না। শীঘ্রই কলম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অবসান ঘটিল এবং প্রতিটি রাষ্ট্র স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে উপনিবেশগুলিতে সামরিক এক-নায়কতন্ত্রের (Military Dictatorship) উদ্ভব হইল। সামরিক শাসকবর্গের সেচ্ছাচারিতার ফলে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র এক দারুণ অশান্তির উদ্ভব হইল। এই পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকায় রাজ্যবিস্তারে

দক্ষিণ আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তার

উদ্যোগী হইল এবং মেক্সিকো যুদ্ধের (১৮৪৬-৪৮ খৃঃ) ফলে মেক্সিকোর এক বৃহৎ অংশ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তগত হইল। এই সময় হইতেই দক্ষিণ আমেরিকার উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারলাভ করিতে থাকে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'নিখিল আমেরিকা সম্মেলনে (Pan American Conference) প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইল।

ইহার পর হইতে দক্ষিণ আমেরিকার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়িল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা (America after the First World War) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া মিত্রপক্ষের জয়লাভ সহজ করিয়াছিল। আমেরিকার পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ভালই হইয়াছিল এবং উহার আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দদফা শর্ত যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া শান্তির পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। উইলসনের প্রস্তাব অনুসারেই লীগ-অফ-নেশনস্‌ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইওরোপ উইলসনের শান্তির প্রস্তাব মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা অগ্রাহ্য করিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে উইলসনের মৃত্যুর পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হার্ডিং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন। মার্কিন সেনেট ভার্সাই সন্ধি ও লীগ-চুক্তিপত্র বর্জন করিল। মার্কিন সরকার অন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি গ্রহণ করিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভার্সাই সন্ধি ও লীগ চুক্তিপত্র বর্জনের কারণ

সরকারীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর সদস্যপদ গ্রহণ না করিলেও বে-সরকারীভাবে মার্কিন সরকার লীগের সহিত সহযোগিতা করিয়া যাইতে থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ কর্তৃক আহূত সকল নিরস্ত্রীকরণ ও অর্থনৈতিক সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দর্শক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লীগের সহিত সহযোগিতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সুদূর প্রাচ্যে জাপানের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক প্রতিযোগিতা শুরু হইলে আমেরিকা আশঙ্কিত হইয়া উঠিল। সুদূর প্রাচ্যে আমেরিকার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার এবং বিশ্বে-শান্তি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে একটি সম্মেলন আহ্বান করিল। এই সম্মেলনে নয়টি রাষ্ট্র যোগদান করিল যথা ব্রিটেন ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী, জাপান, চীন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও পর্তুগাল। এই সম্মেলনে তিনটি পৃথক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল—যথা পঞ্চশক্তি-চুক্তি, নবম-শক্তি চুক্তি ও চতুঃশক্তি চুক্তি। এই চুক্তিপত্রগুলি বিশ্বের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববাসীর মনে এই চুক্তিপত্রগুলি শান্তির আশা বলবতী করিয়াছিল এবং সাময়িক ভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়াছিল।

ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১)

সম্মেলনের গুরুত্ব

সংক্ষিপ্তসার

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমেরিকার ইতিহাস (আভ্যন্তরীণ) : স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক। জাতীয় ঋণের পরিমাণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা হইবার ফলে এক দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার সহিত রাজনৈতিক সমস্যাও জটিল

হইয়া উঠিয়াছিল। আঞ্চলিক বিবাদ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলির অবিশ্বাসের ফলে রাজনৈতিক সংহতি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। এই সমস্যার সমাধানকল্পে এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি নুতন শাসনতন্ত্র রচিত হইল। ইহার দ্বারা কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইল এবং গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উন্নয়ণ সাধন করা হইল। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইল।

পররাষ্ট্রনীতি : ফরাসী বিপ্লবের প্রতি আমেরিকাবাসীর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। আমেরিকা-বাসা ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্য করার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন উহার বিরোধিতা করিয়া ইওরোপের ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেন। সাময়িকভাবে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বিরোধের উদ্ভব হইলে 'জে-র সন্ধি দ্বারা উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু নেপোলিয়নের কণ্টিনেণ্টাল-সিস্টেম' বা অবরোধ-নীতি ঘোষিত হইলে ইংল্যাণ্ড উহার প্রত্যুত্তরে ফ্রান্সের সহিত বিশ্বের নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিল। ফলে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলে আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮১২)। ঘেণ্ট-এর সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হইল। ইহার পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত আমেরিকা ইওরোপের রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিল। এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট মান্‌রো-র বিখ্যাত ঘোষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা মান্‌রো-নীতি নামে পরিচিত। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার ব্যাপারে ইওরোপের রাষ্ট্রবর্গকে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে না দেওয়া। ইহার ফলে ইওরোপের রাজনৈতিক জটিলতা হইতে দূরে থাকিয়া যুক্তরাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের সুযোগ পাইল।

মার্কিন গৃহযুদ্ধ : কারণ (১) উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে শুল্ক সংক্রান্ত বিরোধ, (২) উভয় অঞ্চলের মধ্যে দাসত্বপ্রথা সম্পর্কিত বিরোধ, (৩) যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে দক্ষিণ আমেরিকার প্রচেষ্টা।

ফলাফল : (১) আমেরিকা মহাদেশের অখণ্ডতা রক্ষা এবং বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ, (২) আমেরিকা মহাদেশ হইতে দাসত্বপ্রথার বিলুপ্তি, (৩) দক্ষিণ আমেরিকায় শিল্পের প্রসার এবং (৪) নিগ্রো সমস্যার উদ্ভব।

গৃহযুদ্ধের পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দীতে) আভ্যন্তরীণ : এই সময়ের প্রধান প্রধান আভ্যন্তরীণ ঘটনা হইল (১) দক্ষিণ আমেরিকায় নিগ্রো ও উত্তরাঞ্চলের অত্যাচারী শাসন। আত্মরক্ষার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতকায়গণ সর্বত্র সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ শুরু করিল। ইহার ফলে দক্ষিণাঞ্চলে শ্বেতকায়দের আধিপত্য স্থাপিত হইল এবং ক্রমশঃ উত্তরাঞ্চলের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইল। (২) যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নমূলক কার্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাবাসীদের জীবনধারণের মানও উন্নত হইয়া উঠিল।

পররাষ্ট্রনীতি : (১) গৃহযুদ্ধের পর বিশ্বরাজনীতিতে নির্লিপ্ত থাকার নীতি পরিত্যক্ত হইল এবং বলিষ্ঠ পরারষ্ট্র-নীতি গৃহীত হইল, (২) মেক্সিকোর ব্যাপারে ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করিলে মন্‌রো-নীতির দোহাই দিয়া যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে মেক্সিকো হইতে সৈন্য অপসারণ করিয়া লইতে বাধ্য করিল। (৩) রাশিয়ার নিকট হইতে আলাস্কা ক্রয় করা হইল, (৪) 'আলাবামা-ঘটনাকে' উপলক্ষ্য করিয়া আমেরিকা ইংল্যাণ্ডকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করিল, (৫) ইংল্যাণ্ড ও ভেনিজুয়েলার মধ্যে বিবাদের সুযোগ লইয়া আমেরিকা ল্যাটিন রাষ্ট্রগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইল, (৬) স্পেনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পোর্টে-রিকো, গুয়াম ও ফিলিপাইন যুক্তরাষ্ট্র লাভ করিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণাধীনে কিউবার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল।

বিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি : স্পেনের সহিত যুদ্ধের পর হইতে (১৮৫৭) আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিল। আমেরিকা বিশ্বরাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পররাষ্ট্র ব্যাপারে প্রধান প্রধান ঘটনা হইল (১) হাওয়াই ও সাময়ান দ্বীপপুঞ্জ দখল ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপত্তি বিস্তার, (২) হেগ-সম্মেলনে যোগদান এবং বক্সার বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে পিকিং-এ সেনাবাহিনী প্রেরণ, (৩) কানাডা ও আলাস্কার মধ্যে বিরোধে হস্তক্ষেপকরণ, (৪) পানামা খালের উপর যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্থাপন এবং (৫) রুশ-জাপানের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া উহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন।

প্রশ্নমালা

১। অন্তর্যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আমেরিকার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।
[Describe the history of America till the outbreak of the Civil War.]
উঃ ১৭৫-১৭৯ পৃঃ দেখ

২। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি বর্ণনা কর।
[Give an account of the foreign policy of America till mid-19th century,]
উঃ ১৭৭-১৭৯ পৃঃ দেখ

৩। আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।
[Review the career and achievements of Abraham Lincoln.]
উঃ ১৭৯-১৮১ পৃঃ দেখ

৪। মার্কিন গৃহযুদ্ধের করণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
[Describe the causes and results of the American Civil War,]
উঃ ১৮১-১৮২ পৃঃ দেখ

৫। অন্তর্যুদ্ধের পর হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
[Describe in short the history of the United States from the end of the Civil War to the First World War,] উঃ ১৮২-১৮৬ পৃঃ দেখ

৬। দক্ষিণ-আমেরিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা কর।
[Give a short account of the history of South America,] উঃ ১৮৬-১৮৮ পৃঃ দেখ

দশম অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী যুগ

(The First World War and After)

সূচনা : উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে উহাদের মধ্যে যে স্বার্থসংঘাত চলিতেছিল তাহার চরম পরিণতি হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর মধ্যে সম্পাদিত 'ত্রি-শক্তি-চুক্তি' (Triple Alliance) এবং ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত 'ত্রি-শক্তি-মৈত্রী' (Triple Entente) ইওরোপীয় শক্তিগুলিকে দুইটি পরস্পর-বিরোধী সামরিক শিবিরে পরিণত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে (১৮৭০ খৃঃ) পরাজয়ের ফলে জার্মানীর

বিরুদ্ধে ফ্রান্সের প্রবল প্রতিশোধ স্পৃহা, বল্কান অঞ্চলের প্রভুত্ব লইয়া রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ এবং বল্কান অঞ্চলের পুনর্গঠন ব্যাপারে অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ এক বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা প্রস্তুত করিতেছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করিলে প্রত্যেকেই সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইতেছিল। এইরূপ সমর-সজ্জা চলিতে থাকাকালীন সেরাজিভোর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধও আরম্ভ হইল।

সংক্ষেপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহ

পরোক্ষ কারণ

(১) **জাতীয়তাবাদ :** ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরম সাফল্য হইল জার্মানী ও ইটালীর জাতীয় ঐক্য সম্পাদন। মধ্য ও পশ্চিম-ইওরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রই জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি যেমন রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও তুরস্ক—বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতিগোষ্ঠী লইয়াই গঠিত ছিল। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্ক সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক দমন করা হইতেছিল। এই দুই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যের দাবি ইওরোপের শান্তি বিপজ্জনক করিয়া তুলিতেছিল। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত পূর্ব-ইওরোপের বিভিন্ন জাতিগুলি যে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিত সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

১৮৭০ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ—এই সময়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদ সংগ্রামশীল হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানী ও ইটালীতে এই সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এযাবৎ যে প্রতিপত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিল নব্য-জার্মানী ও নব্য-ইটালী উহা লাভ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেছিল। অপর দিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ পদানত জাতিগুলি স্বাতন্ত্র্যলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং জাতীয়তাবাদ বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

(২) **গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তি :** ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের সাফল্য লাভ ঘটিয়াছিল বটে কিন্তু রাশিয়ার জারতন্ত্র ও জার্মানীর কাইজার-তন্ত্র ইহার ঘোর বিরোধী ছিল। জারতন্ত্রের শক্তি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত রুশ গণবিপ্লব দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অপরদিকে কাইজারতন্ত্র জারতন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী ছিল। সুতরাং রাশিয়া ও জার্মানীর গণতন্ত্র-বিরোধী মনোভাব ইওরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল।

গণতন্ত্র-বিরোধী কাইজারতন্ত্র ও জারতন্ত্র

(৩) **ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ :** উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইওরোপের বহির্ভাগস্থ ভূখণ্ড ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে প্রায় বণ্টন হইয়া গিয়াছিল। জার্মানী ও ইটালীর জন্য সামান্য অংশই অবশিষ্ট ছিল। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই জার্মানী ও ইটালী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারে যত্নবান হইলে সর্বত্রই উহাদের ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। আফ্রিকার অন্তর্গত মরক্কোর উপর আধিপত্যের প্রশ্ন লইয়া জার্মানী ও ফ্রান্স এবং টিউনিস-এর উপর আধিপত্যের প্রশ্ন লইয়া ফ্রান্স ও ইটালীর বিরোধ এক সংকটের উদ্ভব করিয়াছিল। আফ্রিকা ও ইওরোপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জার্মানী বল্কান অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিলে রাশিয়া ও সার্বিয়া জার্মানীর বিরোধিতা করিল। সুতরাং জার্মানী ও ইটালীর অতৃপ্ত সাম্রাজ্যিক আকাঙ্ক্ষা বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল।*

জার্মানী ও ইটালীর অতৃপ্ত সাম্রাজ্যিক আকাঙ্ক্ষা

(৪) **ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা :** ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হইতে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ হইল অর্থনৈতিক ও সামরিক। শিল্প-প্রতিযোগিতায় জার্মানী অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলে ইংল্যাণ্ডের আশঙ্কার কারণ হইল। এতদ্ভিন্ন, জার্মানীর নৌশক্তি বৃদ্ধিতে ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। সুতরাং অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয় রাষ্ট্রকে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।†

(৫) **বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থসংঘাত :** ইওরোপের কতকগুলি অঞ্চলের অধিকার লইয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের (১৮৭০ খৃঃ) ফলে ফ্রান্সের আলসাস-লোরেন প্রদেশদ্বয় জার্মানীর কবলিত হইয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স ইহার পুনরুদ্ধারের আশা কখনও পরিত্যাগ করে নাই। অষ্ট্রিয়া-অধিকৃত ইটালীর অঞ্চল হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করিয়া জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ করিতে ইটালী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। বল্কান অঞ্চলে জার্মানীর সমর্থনপুষ্ট অষ্ট্রিয়ার এবং রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট সার্বিয়ার মধ্যে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার ব্যাপার লইয়া বিরোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইন্ধন যোগাইয়াছিল।

(৬) **আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রজোট :** আন্তর্জাতিক শান্তি অব্যাহত রাখার জন্য মিত্রতামূলক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ সমর্থ হয় নাই।

---

*"There began a mad race force colonies which revived old hostilities, intensified national hatreds and roused new ambitions that, more than once, brought the world to the verge of war".—Schapiro (*European History*).

† "Jealousy bred suspicion and suspicion hatred, with the result that the English and Germans, friends for centuries, became deadly enemies".—Schapiro,

একমাত্র যুদ্ধই জাতীয় নীতির যন্ত্ররূপে বিবেচিত হইত। বিশ্বযুদ্ধের প্রাকালে সমগ্র ইওরোপ দুইটি সামরিক শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—একদিকে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া, বা ত্রি-শক্তি মৈত্রী; অপরদিকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া বা ত্রি-শক্তি আঁতাত। এই সকল রাষ্ট্রজোটের মূল কারণ হইল পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ঈর্ষা।

প্রত্যক্ষ কারণ

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন এইরূপ পারস্পরিক সন্দেহ, বিদ্বেষ ও যুদ্ধকামনায় আচ্ছন্ন সেই সময় (১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন) অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ড সস্ত্রীক বোসনিয়ার সেরাজিভো নগরে প্রকাশ্য দিবালোকে এক আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন।

সেরাজিভোর হত্যাকাণ্ড

আততায়ী ও তাহার সহকর্মীগণ অষ্ট্রিয়ার প্রজা হইলেও জাতিতে ছিল শ্লাভ। এই অজুহাতে অষ্ট্রিয়া সার্বিয়াকে হত্যাপরাধে দায়ী সাব্যস্ত করিয়া সার্বিয়া সরকারের নিকট কতকগুলি শর্তসম্বলিত একটি চরমপত্র প্রেরণ করিল।

সার্বিয়াকে দায়ী সাব্যস্ত ও অষ্ট্রিয়ার চরমপত্র

সার্বিয়ার প্রতি অষ্ট্রিয়ার আক্রমণাত্মক মনোভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া রাশিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। রাশিয়া সার্বিয়াকে সমর্থন করিয়া এক আন্তর্জাতিক বৈঠকের প্রস্তাব করিল। কিন্তু জার্মানীর সমর্থন লাভ করিয়া অষ্ট্রিয়া এই ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ মানিয়া লইতে অসম্মত হইল। ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড গ্রে জার্মানী, ইংল্যাণ্ড ও ইটালীর এক সম্মিলিত বৈঠকে এই বিবাদ মীমাংসার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়া ও জার্মানী ইহাতে অসম্মত হইল।

আন্তর্জাতিক বৈঠকের প্রস্তাব

২৮শে জুলাই (১৯১৪ খৃঃ) অষ্ট্রিয়া বাহিনী সার্বিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলে রাশিয়াও সৈন্য সমাবেশ করিতে ত্রুটি করিল না। স্মরণ রাখা দরকার যে এই সময় রাশিয়া ও জার্মানীতে যুদ্ধস্পৃহা তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। ২৮শে জুলাই অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ত্রি-শক্তি মৈত্রীর (Triple Alliance) শর্তানুসারে জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। অপরদিকে দ্বি-শক্তি মৈত্রীর (Dual Alliance) শর্তানুসারে ফ্রান্স রাশিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হইল। জার্মানী ইংল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা লাভের চেষ্টা করিল। কিন্তু বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া জার্মানবাহিনী ফ্রান্স আক্রমণের জন্য বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া সৈন্য পরিচালনা করিলে ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।* প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল।

অষ্ট্রিয়ার সৈন্যচালনা

জার্মানী কর্তৃক বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ ও ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ ঘোষণা

* ইংল্যাণ্ডের দায়িত্ব আলোচনা: নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের অবসানের পর হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইওরোপের অন্তর্জাতিক সকল ব্যাপার হইতে ইংল্যাণ্ড নিজেকে মুক্ত রাখিয়া আসিতেছিল।

এই যুদ্ধে একদিকে রহিল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া। এই মৈত্রী মিত্রশক্তি (Allies) নামে পরিচিত। অপর পক্ষে রহিল জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক, মণ্টিনিগ্রো। ইহারা কেন্দ্রীয়-শক্তি (Central Powers) নামে পরিচিত। ইটালী ও রুমানিয়া প্রথম দিকে নিরপেক্ষ থাকিলেও পরে অষ্ট্রিয়া-অধিকৃত ইটালীর অঞ্চল এবং হাঙ্গেরীর কিছু অংশ পাইবার আশায় উভয় রাষ্ট্র মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। প্রথমদিকে জার্মানীর সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া বুলগেরিয়া কেন্দ্রীয় পক্ষে যোগদান করিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পর্তুগাল মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে জার্মানী সাবমেরিন দ্বারা আমেরিকার বাণিজ্যতরী বিনষ্ট করিতে থাকিলে অগত্যা আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগদান করিল (১৯১৭ খৃঃ)। পরে জাপানও মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়াছিল।*

মিত্রশক্তি বনাম কেন্দ্রীয় শক্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

১৯১৪ঃ পূর্ব হইতে প্রস্তুত না থাকায় মিত্রপক্ষ জার্মানীকে বাধা প্রদান করিতে পারে নাই। বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করিল। মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপতি ফচ (Foch)-এর পরিচালনাধীনে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী মার্ন নদীর দক্ষিণে জার্মানীর অগ্রগতি রোধ করিল। জার্মানীর ফ্রান্স অধিকার করার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল।

জার্মানীর ফ্রান্স অধিকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ

ইতিমধ্যে জার্মানবাহিনী বেলজিয়ামের অধিকাংশ স্থান দখল করিল।

একমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাহেতু ইংল্যাণ্ড ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬) যোগদান করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক ব্যাপার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণ ছিল ব্রিটেনের জটিল আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি। কিন্তু আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হইলে এবং জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানীর নৌশক্তি বৃদ্ধি করিয়া বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হইলে ইংল্যাণ্ড নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। উপরন্তু জার্মানীর বাগদাদ রেলওয়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ও পারস্য সাগরে জার্মানীর নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টা ইংল্যাণ্ডকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি ইংল্যাণ্ড ইওরোপের শান্তি রক্ষার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। সেরাজিভোর হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে যে তিক্ততার উদ্ভব হইয়াছিল ইংল্যাণ্ড তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু জার্মানী কর্তৃক বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হইলে এবং জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে অগত্যা ইংল্যাণ্ডকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়।

* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতিঃ প্রথমতঃ, যুদ্ধে যোগদানকারী রাষ্ট্রবর্গের সংখ্যা, যুদ্ধ ক্ষেত্রের ব্যাপকতা, অর্থ ও নরনারীর প্রাণনাশ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাকে বিশ্বযুদ্ধ বলাই সঙ্গত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধে শুধু বেতনভুক সৈনিকগণই অংশ গ্রহণ করে নাই, ইওরোপের জনসাধারণও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। তৃতীয়তঃ, এই যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার হইয়াছিল। সাবমেরিন, ব্যোমযান, বিষাক্তগ্যাস, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই।

১৯১৫ঃ এই সীমান্তে রুশবাহিনী জার্মানীর নিকট পরাজিত হইল। ট্যালেনবার্গ-এর যুদ্ধে রুশবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হইয়া জার্মান সীমানা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

পূর্ব সীমান্তিক যুদ্ধ
রাশিয়ার পরাজয়

ইতিমধ্যে রাশিয়ার নিকট অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইল। রুশবাহিনী গ্যালিশিয়া দখল করিয়া হাঙ্গেরীর নিরাপত্তা বিপজ্জনক করিয়া তুলিলে জার্মানবাহিনী অষ্ট্রিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়া রুশবাহিনীকে পরাস্ত করিল।

অষ্ট্রিয়ার পরাজয়

এই বৎসর ইটালী নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। ইটালীর উদ্দেশ্য ছিল মিত্রপক্ষের সাহায্যে অষ্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত ইটালীর প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধার করা।

মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জাপান জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। সুদূর প্রাচ্যে জার্মানীর অধিকারভুক্ত কিয়াও-চাও বন্দর ও সাংটুং অঞ্চল জাপান দখল করিল।

নিরপেক্ষ ইটালী ও
জাপানের যোগদান

যুদ্ধের প্রথম বৎসর সার্বিয়া বীরত্বের সহিত অষ্ট্রিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বুলগেরিয়া ও অষ্ট্রো-জার্মান বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে সার্বিয়া পরাজিত হইল।

সার্বিয়ার পতন

পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ জার্মান-বেষ্টনী ভেদ করার চেষ্টা করিলে ইপ্রিস-এ উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে জার্মানী সর্বপ্রথম বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে। মিত্রপক্ষ পরাজিত হইল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মিত্রপক্ষ প্রায় সর্বত্রই পরাজয় স্বীকার করিল।

ইপ্রিস-এর যুদ্ধ

১৯১৬ঃ এই বৎসর পশ্চিম সীমান্তে ভার্দুন ও সোমিতে জার্মানী ও মিত্রপক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। ভার্দুন রক্ষা পাইল এবং সোমিতে মিত্রপক্ষ শহর পুনরুদ্ধার করিল।

ভার্দুন ও সোমি রণাঙ্গনে যুদ্ধ

এই বৎসরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হইল জুটল্যাণ্ড (Battle of Jutland)-এর যুদ্ধ। ইংরাজ নৌবহর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জার্মান নৌবহর উত্তর সাগরের সীমানা হইতে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া কিয়েল বন্দরে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল। সমুদ্রপথে ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রহিল।

জুটল্যাণ্ডের নৌ-যুদ্ধ

১৯১৭ঃ এই বৎসরের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল রাশিয়ার বলশেভিক বিদ্রোহ ও মিত্রপক্ষে আমেরিকার যোগদান। রাশিয়ার বলশেভিকদল জার্মানীর সহিত ব্রেস্ট-লিটোভস্ক-এর সন্ধি স্থাপন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথম হইতে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু জার্মানী শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সাবমেরিনের যুদ্ধ আরম্ভ করিলে আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগদান করিতে বাধ্য হইল। আমেরিকার যোগদানের পর হইতে যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূল হইয়া উঠিতে থাকে।

রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ
আমেরিকার মিত্রপক্ষে
যোগদান

১৯১৮ঃ রাশিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে জার্মানী পশ্চিম সীমান্তে জোর আক্রমণ চালাইল। জার্মান বাহিনী ইপ্রিস আক্রমণ করিয়া প্যারিসের প্রায় চল্লিশ মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মিত্রপক্ষীয় সেনাপতি ফচ-এর অধিনায়কত্বে মিত্রপক্ষ একের পর এক সাফল্য অর্জন করিয়া চলিল। তুরস্ক, বুলগেরিয়া, অষ্ট্রিয়া, একে একে পরাস্ত হইয়া মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। ইতিমধ্যে জার্মানীতে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব দেখা দিল। জার্মান নৌবাহিনী বিদ্রোহ করিল। ৯ই নভেম্বর (১৯১৮ খৃঃ) কাইজার হল্যাণ্ডে পলায়ন করিলে জার্মানীতে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইল। ১১ই নভেম্বর জর্মানী যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিল।

জার্মানীর উপর্যুপরি পরাজয়

যুদ্ধবিরতি, ১১ই নভেম্বর

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন ও ভার্সাই সন্ধি

(Treaty of Versailles—1919)

১৯১৯ সালে যুদ্ধে যোগদানকারী ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ স্থায়ী সন্ধির শর্তাদি রচনা করার উদ্দেশ্যে প্যারিসে মিলিত হইলেন। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবিদগণ এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং স্থায়ী ব্যবস্থাদি করিতে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। প্রায় সমগ্র বিশ্বই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সহজ ছিল না। বিধ্বস্ত বিশ্বের পুনর্গঠন করা, পরাজিত রাষ্ট্রগুলিকে শক্তিহীন করা, নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা এবং বিশ্বে স্থায়ী শান্তি বজায় রাখা প্রভৃতি বিবিধ সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজন ছিল।

প্যারিস সম্মেলনের সম্মুখে বিবিধ জটিল সমস্যা

সম্মেলনের প্রকৃত কার্য কেবলমাত্র চারিটি শক্তিশালী দেশের প্রতিনিধিদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল—ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেনশো, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ এবং ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্লাণ্ডো।* ইহারা 'প্রধান চারিজন' (Big Four) নামে খ্যাত। ক্লিমেনশো সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

'প্রধান চারিজন'
(Big Four)

---

* 'প্রধান চারিজন' (Big Four): (১) ক্লিমেনশো: অশীতিপর ক্লিমেনশো ফ্রাঙ্কো-প্রশিয়ান যুদ্ধের সময় প্যারিসের একজন মেয়র ছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের জনপ্রিয় নেতা এবং ফরাসীবাসী তাঁহাকে 'বাঘ' আখ্যা দিয়াছিল। প্রধান-চারিজনের মধ্যে ইওরোপের সমস্যা সম্পর্কে ক্লিমেনশোর জ্ঞান ছিল গভীর এবং তিনটি ভাষায় (ফরাসী, ইংরাজী ও ইটালীয়ান) তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর। তিনি মোটেই আদর্শবাদী ছিলেন না। জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

(২) উড্রো উইলসন: আমেরিকার কোনরূপ সংকীর্ণ স্বার্থ ছিল না সুতরাং নিরাপত্তা সম্পর্কেও আমেরিকার কোনরূপ আশঙ্কা ছিল না। সকলের প্রতি সুবিচার করিয়া দীর্ঘকাল শান্তি স্থাপন করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হইবার পূর্বে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

সন্ধির শর্তাদি নির্ধারণ করা অপেক্ষা শান্তির আদর্শ নিরূপণ করিতেই উড্রো উইলসন অধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন। বিশ্বে দীর্ঘকাল শান্তির ভিত্তি হিসাবে উড্রো উইলসন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ-দফা' (Fourteen Points) নীতির বিশ্লেষণ করেন। এই সকল নীতির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল নিরস্ত্রীকরণ, অবাধ-বাণিজ্য, গোপন কূটনীতির পরিবর্তে খোলাখুলিভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপন, এবং সমুদ্রের উপর সকল রাষ্ট্রের সমান অধিকার। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (League of Nations) স্থাপনের প্রস্তাবও করেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট উইলসনের চৌদ্দ-দফা শর্ত-সম্বলিত পরিকল্পনা ফ্রান্স, ইটালী ও ইংল্যাণ্ড অগ্রাহ্য না করিলেও তাহাদের পক্ষে উহা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ যুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত একাধিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই চুক্তিগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে বিধ্বস্ত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করা। এতদ্ভিন্ন জার্মানীর নিকট হইতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করার ইচ্ছাও কোন কোন রাষ্ট্রের ছিল। সুতরাং প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে দুইটি পরস্পরবিরোধী আদর্শবাদের সংঘাত শুরু হয়।

সম্মেলনের সম্মুখে পরস্পর-বিরোধী আদর্শবাদ

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে জার্মানীর সহিত ভার্সাই-এর সন্ধি (Treaty of Versailles); অষ্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট জার্মেইন-এর সন্ধি (Treaty of St. Germain); হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়াননের-এর সন্ধি (Treaty of Trianon); বুলগেরিয়ার সহিত নিউলর-সন্ধি (Treaty of Neully) এবং তুরস্কের

শান্তি সম্মেলনে পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষর

অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল এবং আমরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাষ্ট্রের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতে এবং নীতি ও আইন রচনা করিতে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু সমকক্ষদের বিরুদ্ধে আদর্শ বা নীতি কার্যকরী করার মতো উপযুক্ত ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ইওরোপীয় রাজনীতির জটিলতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ।

(৩) লয়েড জর্জ: লয়েড জর্জ যুদ্ধ শেষ হইবার দুই বৎসর পূর্ব হইতে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন কর্মী পুরুষ। আদর্শবাদে তিনি বিশেষ বিশ্বাসী ছিলেন না। উদার-নীতির বশবর্তী হইয়া তিনি স্বদেশের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-আফ্রিকার ডাচ-সাধারণতন্ত্রীগণকে এক সময় সমর্থন করিয়াছিলেন এবং উইলসনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি অবশ্য ছিল। কিন্তু শান্তি-সম্মেলনের ঠিক পূর্বে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ-নির্বাচনের সময় তিনি জার্মানীর বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রতিশ্রুতি ইংল্যাণ্ডবাসীকে দিয়াছিলেন। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও জার্মানীর বিরুদ্ধে কঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রস্তাবে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইয়াছিল।

(৪) অর্লাণ্ডো: একমাত্র অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধেই ইটালী অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। সুতরাং জার্মনীর ব্যাপারে অর্লাণ্ডোর তেমন আগ্রহ ছিল না। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে যতটা সম্ভব অঞ্চল অধিকার করা। এই ব্যাপারে অবশ্য তাঁহাকে উইলসন ও ক্লিমেন্সোর তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

সহিত সেভরে-এর সন্ধি (Treaty of Sevres)—এই পাঁচটি সন্ধি সম্পাদিত হইলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে।

(১) ইওরোপের পুনর্বণ্টন সম্পর্কিত শর্তাদি

ভার্সাই সন্ধি অনুসারে

জার্মানী : ইওরোপে জার্মানী (১) ফ্রান্সকে আলসাস্-লোরেন প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইল; (২) বেলজিয়ামকে মরেসনেট, ইউপেন ও মেলমেডি প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত এই তিনটি জিলা ছাড়িয়া দিতে হইল, (৩) লিথুয়ানিয়াকে মেমেল বন্দর প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইল; (৪) পোল্যাণ্ডকে পোসেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া ছাড়িয়া দিতে হইল; (৫) চীনে জার্মান-অধিকৃত অঞ্চলসমূহ জাপানকে প্রদান করিতে হইল এবং (৬) জার্মানীর আফ্রিকাস্থ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য লীগ-অফ-নেশনস্-এর পরিচালনাধীনে রাখার ব্যবস্থা হইল। এতদ্ভিন্ন জার্মানীর শিল্প ও খনিজ প্রধান সার উপত্যকা (Saar Valley) পনেরো বৎসরের জন্য এক আন্তর্জাতিক পরিষদের অধীনে রাখা হইল। ইহাও স্থির হইল যে এই পনেরো বৎসরকাল ফ্রান্স সারের কয়লাখনির উপর কর্তৃত্ব করিবে; এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে সার উপত্যকার অধিবাসীদের গণভোট দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যৎ স্থির করা হইবে। [১৯৩৫ সালে গণভোটের মাধ্যমে সার অঞ্চলের অধিবাসীগণ জার্মানী সহিত সংযুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তাহা কর্যকরী করা হইয়াছিল।] ডানজিগ্ উন্মুক্ত বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইল।

সেণ্ট জার্মেইন সন্ধি অনুসারে

অষ্ট্রিয়া : সেণ্ট জার্মেইন ও সেণ্ট ট্রিয়ানন-এর সন্ধি অনুসারে পূর্বতন অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যকে খণ্ডিত করা হইল এবং দুইটি নূতন রাষ্ট্রের (যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া) সৃষ্টি করা হইল। সেণ্ট জার্মেইন-এর সন্ধি অনুসারে অষ্ট্রিয়ার দক্ষিণ টাইরল, ট্রেনটিনো' ট্রিয়েস্ট, ইষ্ট্রিয়া ও ডালমেশিয়া ইটালীকে প্রদান করা হইল; বোহেমিয়া, মোরাভিয়া এবং শ্লোভাকিয়া প্রভৃতি অঞ্চল একত্রিত করিয়া চেকোশোভাকিয়া নামে একটি নূতন রাজ্য গঠন করা হইল। শ্লাভ-অধ্যুষিত বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা সার্বিয়াকে প্রদান করা হইল। অতঃপর সার্বিয়ার নূতন নামকরণ হইল যুগোশ্লাভিয়া। এতদ্ভিন্ন আষ্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত গ্যালিশিয়া পোল্যাণ্ডকে এবং ট্রানসিলভানিয়া ও বকুভিনা রুমানিয়াকে প্রদান করা হইল। এইভাবে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুগ্ম সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল। জার্মানীর ন্যায় অষ্ট্রিয়াকেও ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা মিত্রপক্ষকে প্রদান করিতে বাধ্য করা হইয়াছেল। ভিয়েনা ও দানিয়ুবের কিছু অংশ লইয়া অষ্ট্রিয়া রাজ্যের ...ত্ব বজায় রাখা হইল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে (১৯১৯খ্রীঃ)
জার্মানি
০ ৮০ ১৬০
মাইল
উত্তর সাগর
ডেনমার্ক
সুইডেন
বাল টিক সাগর
শ্লেজভিগ
গণভোট সাপেক্ষ
মিত্রশক্তিকে
স্বাধীনশহর বলিয়া স্বীকৃত
নিয়েমেন নং
পূর্ব প্রাশিয়া
ড্যানজিগ
হ্যামবার্গ
স্টেটিন
ব্রিমেন
বার্লিন
পোল্যান্ডকে
ভিশ্চুলা নং
পোল্যান্ড
ওডার নং
হ্যানোভার
বেলজিয়ামকে
গণভোট সাপেক্ষ
বেলজিয়াম
কোলোন
চেকোস্লোভাকিয়াকে
ড্রেসডেন
সাইলেশিয়া
ফ্রাঙ্কফার্ট
চেকোস্লোভাকিয়া
সার অঞ্চল
ফ্রান্সকে
(১৫ বৎসরের জন্য)
দানিয়ুব নং
ফ্রান্স
আলসেস লোরেন
ফ্রান্সকে
মিউনিক
অস্ট্রিয়া
সুইট্জারল্যাণ্ড
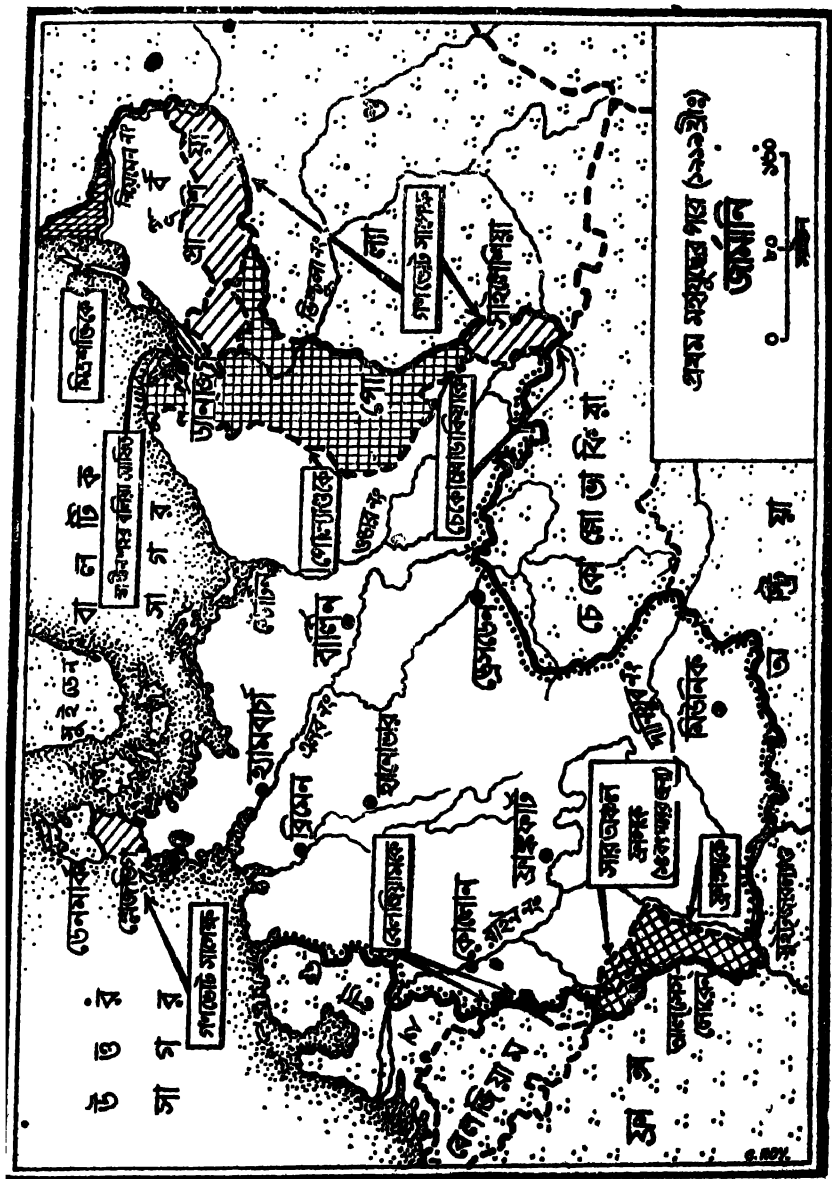
হাঙ্গেরী : সেন্ট ট্রিয়াননন-এর সন্ধি অনুসারে হাঙ্গেরীকে অষ্ট্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। হাঙ্গেরী রুমানিয়াকে ট্রানসিলভানিয়া, যুগোশ্লাভিয়াকে ক্রোশিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে শ্লোভাক প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

সেণ্ট ট্রিয়ানান সন্ধি অনুসারে

বুলগেরিয়া : নিউলি-এর সন্ধি অনুসারে বুলগেরিয়া সমগ্র ঈজিয়ান উপকূল গ্রীসকে এবং বুলগেরিয়ার পশ্চিম অংশের কয়েকটি স্থান যুগোশ্লাভিয়াকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

নিউরিল সন্ধি অনুসারে

তুরস্ক : সেভরে-এর সন্ধি অনুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এশিয়া মাইনর, থ্রেস, আদ্রিয়ানোপল এবং গ্যালিপলি গ্রীসকে সমর্পণ করা হইল। বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের আয়তন এইভাবে ক্ষুদ্র করিয়া এশিয়া মাইনরের মধ্যবর্তী অঞ্চলেই ইহাকে সীমাবদ্ধ রাখা হইল।

সেভরে-এর সন্ধি অনুসারে

কিন্তু কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী দল এই সন্ধি স্বীকার করিতে অসম্মত হইল। সুলতানকে বাদ দিয়াই তুরস্কের জাতীয়তাবাদী দল এ্যাঙ্গোরায় (Angora) একটি নূতন গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিল। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সমর্থন লাভ করিয়া গ্রীস তুরস্কের জাতীয়তাবাদ দমন করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কামাল পাশার নিকট পরাস্ত হইলে সেভরে-এর সন্ধি পুনর্বিবেচিত হইল। অতঃপর লুসান-এর সন্ধি* অনুসারে তুরস্ক হৃতরাজ্যের কিছু অংশ ফিরিয়া পাইল।

(২) অর্থনৈতিক ও সামরিক শর্তাদি

(১) জার্মানীকে আফ্রিকাস্থ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং চীন, শ্যাম, মিশর প্রভৃতি স্থানের সকল প্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করিতে হইল।

---

* লুসান-এর সন্ধির শর্তাদি : (১) কনস্টান্টিনোপল, পূর্ব-থ্রেস, গ্যালিপলি, এ্যানটোলিয়া ও সিলিসিয়া তুরস্কের অধীনে রহিল, (২) উভয় রাষ্ট্রে জনসংখ্যার বিনিময় হইল, যেমন তুরস্কের গ্রীক প্রজাবর্গ গ্রীসে এবং গ্রীসের তুর্কী প্রজাবর্গকে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত করা হইল, (৩) তুরস্ক সাম্রাজ্যের মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সমতা স্থাপন করা হইল, (৪) সিরিয়া মেসোপটেমিয়া ও প্যালেস্টাইনকে যথাক্রমে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের রক্ষণাধীনে রাখার ব্যবস্থা হইল।

† যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সমস্যা : মিত্রশক্তি রাষ্ট্রবর্গের নাগরিকদের ধনসম্পত্তি ও প্রাণনাশের জন্য কোন্ রাষ্ট্রকে কি পরিমাণে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদান করিবে তাহা স্থির করার জন্য একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন (Reparation Commission) নিয়োগ করা হইয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কমিশন অন্তর্বর্তীকালের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মানীর উপর একশত কোটি পাউণ্ড ধার্য করে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কমিশন ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ছয় শত কোটি পাউণ্ড জার্মানীর উপর ধার্য করে। কিন্তু তৎকালীন অবস্থায় জার্মানীর পক্ষে এই অঙ্কের কিয়দংশ পর্যন্ত পরিশোধ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং মিত্রপক্ষ তিন কিস্তিতে মোট অঙ্ক পরিশোধ করার সুবিধা জার্মানীকে দিল। কিন্তু আর্থিক বিপর্যয় হেতু জার্মানী ক্ষতিপূরণ বাবদ মাত্র পাঁচকোটি পাউণ্ড পরিশোধ করার পর অবশিষ্টাংশ পরিশোধ করিতে পারিল না। ফলে ১৯২৩ সালে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ব্রিটেনের সমর্থন লাভ করিয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়াম যুগ্মভাবে জার্মানীর রাঢ় (Ruhr) অঞ্চল দখল করিয়া লইল। যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত জার্মানী কোনমতেই ক্ষতিপূরণের দেয় অর্থ পরিশোধ করিতে পারে নাই।

(২) ফ্রান্স, ইটালী ও বেলজিয়ামকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা প্রদান করিতে জার্মানীকে বাধ্য করা হইল, (৩) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর পরিমাণে অর্থ জার্মানীর উপর ধার্য করা হইল। [একটি কমিশন নিয়োগ করিয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ স্থির করা হয়। ইহা স্থির করার জন্য ১৯২০ হইতে ১৯২৪ সালের মধ্যে কুড়িটি বৈঠক আহূত হইয়াছিল]। (৪) জার্মানীকে এই সকল শর্তাদি পালন করিতে বাধ্য করার জন্য রাইন নদীর বাম তীরবর্তী অঞ্চল পনোরা বৎসরের জন্য মিত্রশক্তির অধীনের রাখা হইল।

অর্থ নৈতিক শর্তাদি

(১) জার্মানীকে মাত্র এক লক্ষ সৈন্য রাখার অনুমতি দেওয়া হইল এবং তথায় বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহের রীতি বন্ধ করা হইল; (২) জার্মানী সমগ্র যুদ্ধোপকরণ মিত্রপক্ষকে সমর্পণ করিল; (৩) রাইন নদীর বাম তীরে সৈন্য সমাবেশ বা দুর্গাদি নির্মাণ করার অধিকার হইতে জার্মানীকে বঞ্চিত করা হইল এবং (৪) জার্মানীর কামান ও যুদ্ধজাহাজের আকার ক্ষুদ্র করা হইল।

সামরিক শর্তাদি: জার্মানী

অনুরূপভাবে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যাও মাত্র ৩০,০০০-এ সীমাবদ্ধ করা হইল। ভবিষ্যতে সৈন্য সংগ্রহ স্থগিত রাখা হইল। যুদ্ধোপকরণ এবং যুদ্ধ-জাহাজগুলির সংখ্যা হ্রাস করা হইল।

সামরিক শর্তাদি: অষ্ট্রিয়া

হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়াকেও অনুরূপ শর্তাধীনে রাখা হইল। হাঙ্গেরীর সৈন্যসংখ্যা ৩৫,০০০ ও বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা ২০,০০০-এ সীমাবদ্ধ করা হইল।

সামরিক শর্তাদি: হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া

(৩) লীগ-অফ-নেশনস্ ও অছি-প্রথা শর্তাদি

বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের লীগ-অফ-নেশনস্ বা রাষ্ট্র-সংঘ গঠনের পরিকল্পনা প্যারিস বৈঠকের সদস্যগণ কর্তৃক সমর্থিত হয় এবং ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলীর মধ্যে লীগ-অফ-নেশনস্ শর্তটি গৃহীত হয়।

ভার্সাই সন্ধির শর্তানুযায়ী জার্মানী ও তুরস্কের নিকট হইতে ইওরোপের বাহিরে যে সকল স্থান কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল সেগুলির শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অছি-প্রথা বা Mandatory System-এর ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রথানুযায়ী ঐ সকল অঞ্চলের শাসনভার রাষ্ট্র-সংঘের সদস্যরাষ্ট্রের উপর অর্পিত হইল। প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া, জার্মান পূর্ব-আফ্রিকা ও টোগোল্যাণ্ডের শাসনভার ইংল্যাণ্ডের উপর অর্পিত হইল। ফ্রান্সকে সিরিয়ার কর্তৃত্ব, জাপানকে কিয়াও-চাও দ্বীপের কর্তৃত্ব, এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় জার্মান দ্বীপপুঞ্জের কর্তৃত্ব দেওয়া হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল
(Results of First World War)

দূরপ্রসারী ফলাফলের দিক দিয়া বিচার করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ["The Gre t War was more than an international conflict, it was a revolution."] যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপকতা, যুদ্ধে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলির সংখ্যা, বিবিধ মারণাস্ত্রের ব্যবহার, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল—সকল দিক দিয়া বিচার করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে একটি পরিবর্তনকারী বিপ্লব বলা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

(১) **বিশ্বের নূতন মানচিত্র :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে চারিটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল—যেমন অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক, রুশ এবং জার্মানী। রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে বহু নূতন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল—যেমন চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, নূতন-পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ইত্যাদি। ফলে ইওরোপের মানচিত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিল। বৃহৎ কতকগুলি রাষ্ট্রের পরিবর্তে বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লইয়া ইওরোপ পুনর্গঠিত হইল।

(২) **জাতীয়তাবাদের সাফল্য :** যুদ্ধের একটি প্রধানতম ফল হইল জাতীয়তাবাদের সাফল্য। জনগণের স্বার্থ-বিরোধী বহু ভাষাভাষী ও জাতিগোষ্ঠী সমন্বয়ে গঠিত সাম্রাজ্যগুলির অবসান হইল এবং এক ভাষাভাষী ও এক জাতিগোষ্ঠীর ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্গঠন হইল। যেমন জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পূর্বতন রুশ সাম্রাজ্য হইতে চারিটি নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হইল—ফিনল্যাণ্ড, এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া। রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার কিছু অংশ লইয়া নূতন পোল্যাণ্ডের জন্ম হইল।

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নূতন রাষ্ট্রের উৎপত্তি

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পূর্বতন অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য হইতে কয়েকটি নূতন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল—যেমন চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং রুমানিয়া।

(৩) **গণতন্ত্রের প্রসার :** জাতীয়তাবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রবাদও প্রসারলাভ করিল। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রে গণতন্ত্রসম্মত শাসনতন্ত্র গৃহীত হইল। একমাত্র রাশিয়াতেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিশেষে সাম্যবাদে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের নিকট পরাজিত হইলে গ্রীসে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে প্রায় সকল রাষ্ট্রেই (একমাত্র ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেন ছাড়া) নারীদের ভোটাধিকার এবং পুরুষদের সম-অধিকার স্বীকৃত হয়।

(৪) **সামাজিক সংস্কার :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইওরোপের সামাজিক জীবনেও এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছিল। এই যুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণী এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাহারা অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিল। বহু রাষ্ট্রে শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন বিধিবদ্ধ

শ্রমিক আইন

হইল। শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতিকল্পে এবং ব্যাধি, দুর্ঘটনা, বার্ধক্যজনিত দুরবস্থা হইতে তাহাদিগকে রক্ষাকল্পে ফ্রান্স ও জার্মানীতে আইন বিধিবদ্ধ হইল। সর্বত্র ট্রেড-ইউনিয়ন গঠিত হইল এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তাহা স্বীকৃত হইল। বিশ্বের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য লীগ-অফ-নেশনস্ কর্তৃক একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ (International Labour Bureau) স্থাপিত হয়।

যুদ্ধের ফলে শ্রমিক অপেক্ষা কৃষককুলই অধিকতর লাভবান হইয়াছিল। জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায়, ফলে কৃষকদের লাভের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। যে সকল দেশে কৃষক মালিকানা (Peasant Proprietorship) প্রচলিত ছিল (যেমন ফ্রান্সে)—সে সকল দেশে কৃষকদের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ার অভিজাতদের ভূ-সম্পত্তি সোভিয়েট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাহা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং রুমানিয়াতেও অভিজাতদের জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

কৃষক কুলের উন্নতি ও কৃষক মালিকানা

(৫) আন্তর্জাতিকতা বৃদ্ধি: এই যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিকতাবোধ (Internationalism) বৃদ্ধি পাইল। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের চৌদ-দফা শর্তাদির উপর ভিত্তি করিয়া লীগ-অফ নেশনস্ নামক এক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘ গড়িয়া উঠিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সংঘের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত না হইলেও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(৬) বিশ্বে আমেরিকার অর্থনৈতিক আধিপত্য: বিশ্বযুদ্ধের ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কোন রাজ্যলাভ করে নাই। মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার জন্য কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাইয়াছিল মাত্র। কিন্তু যুদ্ধের পর আর্থিক পুনর্গঠন ব্যাপারে ইওরোপকে আমেরিকার নিকট দ্বারস্থ হইতে হয়। ফলে বিশ্বে আমেরিকার অর্থ-নৈতিক আধিপত্য স্থাপিত হয়।

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা

(১) ভার্সাই সন্ধির রচয়িতাগণের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনুদার এবং প্রতিশোধাত্মক মনোভাবই ছিল তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রবল। জার্মানীকে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদান করাই বিজয়ী নেতৃবর্গের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিজয়ী নেতৃবর্গের এইরূপ মনোভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী শান্তি স্থাপনের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে নাই।

বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রতি-শোধাত্মক মনোভাব

(২) জার্মানীর উপনিবেশগুলি অন্যায়ভাবে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। এক বিশাল পরিমাণ ঋণের বোঝা জার্মানীর স্কন্ধে চাপাইয়া জার্মানীর আর্থিক বিপর্যয় অনিবার্য করা হইয়াছিল। সামরিক দিক দিয়া জর্মানীকে পঙ্গু করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই কারণেই জার্মানী ১৯৩৬ সালে ভার্সাই সন্ধির সামরিক শর্তাদি উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল। জার্মানীর শিল্প-

জার্মানীর প্রতি অবিচার

প্রধান অঞ্চলগুলি কাড়িয়া লইয়া জার্মানীর আর্থিক স্বচ্ছলতা বিনষ্ট করা হইয়াছিল। জার্মানী এইরূপ অপমান ভুলিতে পারে নাই। ইহা স্বীকার্য যে জার্মানীর প্রতিশোধাত্মক মনোভাবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

জাতীয়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রয়োগের ত্রুটি

(৩) জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—এই দুইটি নীতির ভিত্তির উপর ইওরোপের পুনর্গঠন করা হইয়াছিল। অর্থাৎ এক ভাষা-ভাষী ও এক জাতিগোষ্ঠীর জনগণকে পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এই নীতি দুইটি সমানভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। যেমন বোহেমিয়াতে শ্লাভদের অধীনে বহু জার্মান এবং ডালমেশিয়াতে বহু শ্লাভ ইটালীর অধীনে রহিয়া যায়। ফলে অনেক দেশেই সংখ্যালঘু সমস্যার উদ্ভব হয়।

অছি ব্যবস্থার ত্রুটি

(৪) ইওরোপের বাহিরে অছি-প্রথা জাতীয়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতির বিরোধী প্রমাণিত হয়। যে সকল রাষ্ট্রের উপর জার্মানীর উপনিবেশগুলির শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল তাহারা কোন ক্ষেত্রেই জার্মানী অপেক্ষা উন্নততর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারে নাই।

নূতন রাষ্ট্র

(New Nations)

হ্যাপসবার্গ রাজবংশের অবসান

অষ্ট্রিয়া: অষ্ট্রিয়া মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে পূর্বতন হ্যাপসবার্গ রাজবংশের অবসান ঘটিল। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল এবং সম্রাট চার্লস দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

সাধারণতন্ত্রী সরকার

নূতন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে একটি জাতীয়-পরিষদ (National Assembly) গঠিত হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অষ্ট্রিয়াকে 'ফেডারেল রিপাবলিক' বলিয়া ঘোষণা করা হইল। একজন প্রেসিডেণ্ট ও দুইটি কক্ষ (Upper House and Lower House) লইয়া নূতন সরকার গঠিত হইল। কার্যনির্বাহক ক্ষমতা (Executive Power) পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল ক্যাবিনেটের উপর অর্পিত হইল।

যুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়ার অবস্থা

যুদ্ধের পর বহুদিন পর্যন্ত অষ্ট্রিয়ায় এক দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট অব্যাহত ছিল। উহার ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল একরূপ বন্ধ। শিল্প-প্রতিষ্ঠান-গুলির অবস্থা ছিল বিধ্বস্ত এবং জনসাধারণ ছিল খাদ্যা-ভাবে প্রপীড়িত। সৌন্দর্য ও বিলাসের কেন্দ্র ভিয়েনা নগরী বহুদিন পর্যন্ত ছিল দুর্ভিক্ষের কবলিত। লীগ-অফ-নেশনস্-এর প্রচেষ্টায় অষ্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক দুরবস্থার অবসান ঘটে।

পররাষ্ট্র ব্যাপারে অষ্ট্রিয়া-জার্মানী-ইটালী ও ফ্রান্স এই তিনটি শক্তি কূটনীতির মঞ্চে পরিণত হইয়াছিল। জার্মানীর লক্ষ্য ছিল জার্মানীর সহিত অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তিসাধন করিয়া হৃত সাম্রাজ্যের ক্ষতিপূরণ করা। জার্মানীর এই প্রচেষ্টা সফল হইলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র জার্মানী শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এই আশঙ্কায় ইটালীর নেতা মুসোলিনী জার্মানীর বিরোধিতা করিলেন। বৃহত্তর জার্মানীর সৃষ্টি হইলে চেকোশ্লোভাকিয়ার নিরাপত্তা বিপজ্জনক হইতে পারে এই আশঙ্কায় ফ্রান্স জার্মানীর পরিকল্পনায় বাধা প্রদান করিল।

অষ্ট্রিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কূটনীতির ক্ষেত্রে পরিণত

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে জার্মানীতে নাৎসীদল সাফল্য অর্জন করিলে জার্মান-অষ্ট্রিয়া সংযুক্ত আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিল। অষ্ট্রিয়ার নাৎসী, সমাজতন্ত্রী ও খ্রীষ্টান সমাজতন্ত্রী দলগুলি যথাক্রমে জার্মানী, ফ্রান্স ও ইটালীর সমর্থনপুষ্ট হইয়া পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইল। ইহাদের মধ্যে খ্রীষ্টান সমাজতন্ত্রীগণই ছিল অধিক শক্তিশালী এবং ইহাদের নেতা ডলফাস (Dollfuss) ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন।

অষ্ট্রো-জার্মান সংযুক্তি আন্দোলনের তীব্রতা

ইতিমধ্যে হিটলার জার্মানীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া জার্মানীর সহিত অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তিনীতি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন। অষ্ট্রো-জার্মানীর সংযুক্তির ব্যাপারে অষ্ট্রিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ গণভোটের প্রশ্ন তুলিলে জার্মানীর সমর্থনপুষ্ট অষ্ট্রিয়ার নাৎসীদল ইহার বিরোধিতা করিল। অবশেষে নাৎসীদলের জয়লাভ হইল এবং তাহাদের নেতা ইনকোয়ার্ট মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াই জার্মানীকে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী পাঠাইবার আহ্বান জানাইলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানবাহিনী অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করিল এবং হিটলার অষ্ট্রো-জার্মান সংযুক্তির কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করিলেন। স্বাধীন রাষ্ট্রহিসাবে অষ্ট্রিয়ার বিলুপ্তি ঘটিল।

[জ]ার্মানী কর্তৃক অ[...]
[গ্র]াস, (১৯৩৮)

চেকোশ্লোভাকিয়া : অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইতে চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও শ্লোভাকিয়ার সমন্বয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া গঠিত হইয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অনুকরণে একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইল এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইল। থোমাস মাসারিক (Thomas Masaryk) হইলেন নূতন রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট।

নূতন সরকারের সম্মুখে দুইটি সমস্যা দেখা দিল—(১) অর্থনৈতিক সমস্যা ও (২) সংখ্যালঘু সমস্যা। চেকোশ্লোভাকিয়ার অর্থ নৈতিক অবস্থা মোটের উপর ভালই ছিল। কৃষি ও শিল্প উন্নত হইতে থাকে। পূর্বতন অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীয়ান অভিজাতদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ফলে রাষ্ট্রে কৃষক-মালিকানার (Peasant Proprietorship) উদ্ভব হয়।

[দু]ইটি সমস্যা

কিন্তু সংখ্যালঘু সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতে থাকে। রাষ্ট্রে চেকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও অপরাপর ভাষাভাষী জনগণ যেমন স্লোভাক, হাঙ্গেরীয়ান, জার্মান, রুমানিয়ান—ইহাদের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। চেক সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি ক্রমশঃ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। জার্মানগণ জার্মানীর সহিত এবং হাঙ্গেরীয়ানগণ নূতন হাঙ্গেরীর সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। স্লোভাকগণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবি করিল। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ড প্রভৃতি শক্তিশালী শত্রুরাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় চেকো-স্লোভাকিয়া স্বীয় নিরাপত্তার জন্য রুমানিয়া ও যুগো-শ্লাভিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল এবং রাশিয়া ও ফ্রান্সের সহিতও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিল।

সংখ্যালঘু সমস্যা

সংখ্যালঘুদের দাবি

চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপন

জার্মানীতে নাৎসীদল ক্ষমতা পাইলে চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থা জটিল হইয়া উঠিল। অষ্ট্রিয়ার ন্যায় চেকোশ্লোভাকিয়াতেও নাৎসীদল চেকোশ্লোভাকিয়া সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিল। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে এক আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পররাজ্য লোভী হিটলার পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া অক্টোবর মাসে (১৯৩৮ খৃঃ) চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করিয়া উহা দখল করিলেন। স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার বিলুপ্তি ঘটিল।

জার্মানী কর্তৃক চেকোশ্লো-ভাকিয়ার বিলুপ্তি সাধন (১৯৩৮)

হাঙ্গেরী: অষ্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ রাজতন্ত্রের অবসান হইলে হাঙ্গেরী এক স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্মলাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের নিকট অষ্ট্রিয়া আত্মসমর্পণ করিলে হাঙ্গেরীতে এক বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং তথায় এক সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। মাইকেল কারোলাই (Karolyi) সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। কারোলাই অভিজাত বংশোদ্ভূত হইলেও তিনি ছিলেন উদারপন্থী। তিনি হাঙ্গেরীর অ-ম্যাগীয়ার জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদানে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু উহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে।

হাঙ্গেরীতে সাধাণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

কারোলাই-কে দুইটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল—(১) হাঙ্গেরীর ভৌমিক নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং (২) কমিউনিস্ট আন্দোলন দমন করা। কিন্তু হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ জটিলতা দূর করিতে অসমর্থ হইয়া কারোলাই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করিলেন এবং বেলা কুন (Bela Kun)-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্টগণ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

কারোলাই-এর পতন

হাঙ্গেরীতে কমিউনিস্টদের সাফল্য মিত্রপক্ষের আশঙ্কার কারণ হইল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের প্ররোচনায় রুমানিয়ান বাহিনী হাঙ্গেরী আক্রমণ করিয়া রাজধানী বুদাপেস্টে প্রবেশ করিল এবং হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরে এ্যাডমিরাল হোরথির (Horthy) নেতৃত্বে এক কমিউনিস্ট-বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হইল। কয়েক মাস পর হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটিল।

কমিউনিস্ট হাঙ্গেরী

১৯২০ খৃষ্টাব্দে একটি জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসিল এবং হোরথির অভিভাবকত্বে ও জনগণের সমর্থনে তথায় একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। যুদ্ধ এবং বিপ্লবের ফলে হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে লীগ-অফ-নেশনস্ হস্তক্ষেপ করিল এবং উহার প্রচেষ্টায় বহুবিধ অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করা হইল।

লীগ-অফ-নেশনস্-এর অর্থনৈতিক সংস্কার

পোল্যাণ্ড: ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়া, জার্মানী ও রাশিয়ার নিকট হইতে কিছু অংশ লাভ করিয়া নূতন পোল্যাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল।

কিন্তু এক ভাষাভাষী ও জাতিগোষ্ঠী লইয়া পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রগঠন সম্ভব হয় নাই। রুথেনিয়ান, ইহুদী, জার্মানী, লিথুয়ানিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সংখ্যালঘুতে পরিণত হইল। মিত্রপক্ষের সহিত 'সংখ্যালঘু-সন্ধি' রচিত হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ পোলগণ সংখ্যালঘুদের সহিত বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিতে লাগিল।

সংখ্যালঘু সমস্যা

বিশ্বযুদ্ধের পর জেনারেল জেবাসফ পিল্‌সুডিস্‌কির (Pilsudiski) নেতৃত্বে পোল্যাণ্ডে সামরিক সরকার স্থাপিত হইয়াছিল। পরে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অনুকরণে তথায় নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল। কিন্তু পার্লামেণ্টারী শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইল না। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পিল্‌সুডিস্‌কি পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া পোল্যাণ্ডে একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) স্থাপন করিলেন। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইল। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এক নূতন পার্লামেণ্ট নির্বাচিত হইল এবং গণভোটের দ্বারা নির্বাচিত এক প্রেসিডেণ্টের হস্তে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইল।

১৯২১ সালের শাসনতন্ত্র

১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র

একদিকে রাশিয়া ও অপরদিকে জার্মানী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তা সর্বদাই বিপজ্জনক ছিল। এই কারণে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। ফ্রান্সের মিত্রতা হইতে পোল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হিটলার পোল্যাণ্ডের সহিত দশ বৎসরের জন্য একটি সন্ধি স্বাক্ষর

জার্মানী ও রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন

করিলেন। পর বৎসর পোল্যাণ্ড রাশিয়ার সহিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি (Non-Aggression Pact) সম্পাদন করিল। পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া ও জার্মানীর সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলা।

কিন্তু হিটলার কর্তৃক জার্মানীর সহিত অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্তি সম্পন্ন হইলে পর পোল্যাণ্ডের পালা আসিল। বিপদ আশঙ্কা করিয়া পোল্যাণ্ড ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিল। হিটলার পোল্যাণ্ডের নিকট ডাঁনজিগ্ বন্দরের প্রত্যর্পণ এবং পূর্ব রাশিয়ার সহিত জর্মানীর যোগাযোগের জন্য একখণ্ড সংযোগ-ভূমি দাবি করিলেন। পোল্যাণ্ড ইহাতে অসম্মত হইলে ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ খৃঃ) জার্মানবাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও হইল।

হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ, (১৯৩৯)

যুগোশ্লাভিয়া : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ক্ষুদ্র সার্বিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হইল এবং এই নূতন রাষ্ট্রের নামকরণ হইল যুগোশ্লাভিয়া। সার্ব, ক্রোট এবং শ্লোভান এই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী লইয়া নূতন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে একটি পার্লামেণ্ট ও একটি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

নূতন সরকার স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। ক্রোট ও শ্লোভানদের অধিকাংশই ছিল রোমান ক্যাথলিক এবং পশ্চিম ইওরোপীয় সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত। অপরদিকে সার্বদের অধিকাংশই ছিল গ্রীক চার্চের অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্ব ইওরোপীয় সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর বিবাদ ও সংঘর্ষের ফলে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স আলেকজাণ্ডার তথায় একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের একনায়কতন্ত্র ক্রোটদের মনঃপুত হইল না এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি একজন ক্রোট আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

আভ্যন্তরীণ অবস্থার ন্যায় যুগোশ্লাভিয়ার বৈদেশিক পরিস্থিতিও জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। ইটালী কর্তৃক যুগোশ্লাভিয়ার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার উপক্রম হইলে যুগোশ্লাভিয়া ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। বল্কান রাষ্ট্র হিসাবে যুগোশ্লাভিয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীস, তুরস্ক ও রুমানিয়ার সহিত বল্কান-চুক্তি সম্পাদন করিল। প্রিন্স আলেকজাণ্ডার ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারীর অভিভাবক প্রিন্স পল নাৎসী জার্মনীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বুলগেরিয়া ও ইটালীর সহিতও মিত্রতা স্থাপন করিলেন। ইটালী আলবেনিয়া দখল করিলে যুগোশ্লাভিয়ার পরিস্থিতি জটিল হইয়া উঠিল। একদিকে জার্মনী ও অপরদিকে ইটালী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়ায় এই দুই ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের নীতি অনুসরণ করিয়া চলা ছাড়া যুগোশ্লাভিয়ার উপায়ান্তর ছিল না।

যুগোশ্লাভিয়ার পররাষ্ট্রনীতি

সংক্ষিপ্তসার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা : (১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইওরোপ দুইটি পরস্পর-বিরোধী শক্তি-শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়ে—একদিকে জার্মানী, ইটালী ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে ত্রি-শক্তি চুক্তি এবং অপর দিকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রি-শক্তি মৈত্রী। (২) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত—যেমন ফ্রান্স-জার্মানী সংঘর্ষ, অষ্ট্রিয়া-রাশিয়া সংঘর্ষ, অষ্ট্রিয়া-সার্বিয়া সংঘর্ষ,—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছিল। (৩) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত তীব্র হইয়া উঠিলে উহাদের মধ্যে সামরিক প্রস্তুতি চলিতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহ : (১) পূর্ব-ইওরোপীয় দেশগুলির ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইওরোপে যুদ্ধানুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। জার্মানী ও ইটালীর সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ (Militant nationalism) বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ। (২) রাশিয়া ও জার্মানীর গণতন্ত্র-বিরোধী মনোভাব ইওরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলির মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধানুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মানী ও ইটালীর অপরিতৃপ্ত সাম্রাজ্যিক আকাঙ্ক্ষা বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। (৪) ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয় রাষ্ট্রকে পরস্পরের ঘোর শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। (৫) ফ্রান্স-জার্মানী, ইটালী-অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়া-জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থসংঘাত বিশ্বযুদ্ধে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। (৬) বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সমগ্র ইওরোপ দুইটি সামরিক শিবিরে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ঈর্ষার মনোভাব লইয়া বৃহত্তর সংকটের প্রতিক্ষা করিতেছিল। (৭) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন এইরূপ পারস্পরিক সন্দেহ, বিদ্বেষ ও যুদ্ধকামনায় আচ্ছন্ন—সেই সময় অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ সস্ত্রীক সেরাজিভো নগরে এক আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন : ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জার্মানী পরাজিত হইয়া যুদ্ধ-বিরতি প্রার্থনা করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইল। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে জার্মানীর সহিত ভার্সাই-এর সন্ধি, অষ্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট-জার্মেইন-এর সন্ধি, হাঙ্গেরীর সহিত সেণ্ট-ট্রিয়ানন-এর সন্ধি, বুলগেরিয়ার সহিত নিউলি-র সন্ধি এবং তুরস্কের সহিত সেভরে-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

(১) **ইওরোপের পুনর্বণ্টন সম্পর্কিত শর্তাদি :** ভার্সাই সন্ধি অনুসারে জার্মানীর অঙ্গচ্ছেদ করা হইল; জার্মানীর বহু অঞ্চল মিত্রপক্ষের মধ্যে বণ্টন করা হইল এবং জার্মানীর আফ্রিকাস্থ উপনিবেশগুলি লীগ-অফ-নেশনস্-এর পরিচালনাধীনে রাখা হইল।

সেণ্ট-জার্মেইন সন্ধি অনুসারে : পূর্বতন অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যকে খণ্ডিত করা হইল। এই সাম্রাজ্যের কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া নামক দুইটি নূতন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হইল। অষ্ট্রিয়ার কিছু অংশ ইটালী, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়াকে প্রদান করা হইল। অষ্ট্রিয়ার আয়তন ক্ষুদ্র করা হইল।

সেণ্ট-ট্রিয়ানন সন্ধি অনুসারে : হাঙ্গেরীর বৃহৎ অংশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হইল।

নিউলি-এর সন্ধি অনুসারে : বুলগেরিয়ার কিছু অংশ গ্রীস ও যুগোশ্লা[illegible] প্রদান করা হইল।

সেভ্রে-এর সন্ধি অনুসারে : তুরস্কের কিছু অংশ গ্রীসকে প্রদান করা হইল এবং তুরস্কের আয়তন ক্ষুদ্র করা হইল।

(২) অর্থনৈতিক ও সামরিক শর্তাদি : (১) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর পরিমাণ অর্থ জার্মানার উপর ধার্য করা হইল, জার্মানীকে আফ্রিকাস্থ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও সকল প্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করিতে হইল ; (২) জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করা হইল, উহার সমগ্র যুদ্ধোপকরণ মিত্রপক্ষকে সমর্পণ করিতে হইল , জার্মানীর কামান ও যুদ্ধজাহাজগুলির আকার ক্ষুদ্র করা হইল , (৩) অষ্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যাও সীমাবদ্ধ করা হইল ; (৪) হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়াকেও অনুরূপ শর্তাধীনে বাধা হইল।

(৩) লীগ-অফ্-নেশনস্ : বিশ্ব-শান্তি অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে লীগ-অব-নেশনস্ নামক এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল : (১) যুদ্ধের ফলে চারিটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল এবং বহু নূতন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল।

(২) যুদ্ধের অপর প্রধানতম ফল হইল জাতীয়তাবাদের সাফল্য। এক ভাষাভাষী ও এক জাতি-গোষ্ঠীর ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্বণ্টন হইল।

(৩) জাতীয়তাবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রবাদও প্রসার লাভ করিল।

(৪) ইওরোপের সামাজিক জীবনের এক বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছিল। বহু রাষ্ট্রে কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতি হইল ও কৃষক মালিকানাস্বত্ব স্বীকৃত হইল।

(৫) যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিকতাবোধ অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(৬) যুদ্ধের পর বিশ্বের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ইওরোপের অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন ব্যাপারে আমেরিকার অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্নমালা

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

[Give an account of the international situation on the eve of the World War I.]

উঃ ১৯০-১৯১ পৃঃ দেখ

২। সংক্ষেপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর।

[Describe in short the causes of the First World War.] উঃ ১৯১-১৯৪ পৃঃ দেখ

৩। ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি সংক্ষেপে লিখ।

[Describe shortly the provisions of the Treaty of Versailles] উঃ ১৯৬-২০১ পৃঃ দেখ

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[Describe the results of the First World War] উঃ ২০২-২০৩ পৃঃ দেখ

একাদশ অধ্যায়

লীগ-অফ্-নেশনস্ (League of Nations)

উৎপত্তি (Origin): রাষ্ট্রসংঘ বা লীগ-অফ্-নেশনস্-এর আদর্শ নূতন কিছু নহে। মীমাংসার দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি ও শান্তি স্থাপন করার চেষ্টা বহু পূর্ব হইতেই হইয়া আসিতেছে এবং ইতিহাসে ইহার নজিরও আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব একটি বিশিষ্ট রাষ্ট্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিপ্লবে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে যুদ্ধ পরিহার করিয়া ইওরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের জাতিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করার চেষ্টাও হইয়াছিল। এই যুগের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই লীগ-অফ-নেশনস্-এর সৃষ্টি হয়। ("The organisation of the League of Nations comes therefore as the logical result of this period."—*Grant and Temperley*) ইওরোপের খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিস্থাপন ও উহাদের পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে রুশ-জার প্রথম আলেকজাণ্ডার কর্তৃক পবিত্রসংঘ (Holly Alliance) স্থাপিত হইয়াছিল (নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর) 'পবিত্র-সঙ্ঘের' উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইলে পর 'রাষ্ট্র-সমবায়' বা Concert of Europe' স্থাপন করিয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ যুদ্ধের পরিবর্তে সহযোগিতা ও আপোষ-মীমাংসার দ্বারা শান্তি বজায় রাখিতে যত্নবান হইয়াছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্যারিসের বৈঠকে আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার প্রশ্নটি উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছিল। সুতরাং শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করার আকাঙ্ক্ষা হইতেই বিংশ শতাব্দীতে লীগ-অফ নেশনস্-এর উৎপত্তি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ হত্যালীলা, সম্পত্তি-নাশ ও বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের ভয়ঙ্করতা সর্বত্র মানুষের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল। সর্বত্রই শান্তির জন্য এক গভীর ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধাবসানে বিশ্বের রাজনীতিবিদ্‌গণ যুদ্ধোত্তর বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন। উড্রো উইলসন লীগ-অফ্-নেশনস্ বা রাষ্ট্রসংঘ গঠনের পরিকল্পনা উত্থাপন করিলে প্যারিস বৈঠকে যোগদানকারী অধিকাংশ সদস্য উহা সমর্থন করেন। পরিকল্পনাটি বিবেচনা করিবার জন্য প্যারিস সম্মেলন একটি কমিশন গঠন করিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিশন লীগ-অফ-নেশনস্-এর শর্তাদি (covena[nt] ও উহার একটি গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করিল। সামান্য সংশোধনের পর লীগ-চুক্তিপত্র গৃ[হীত] হইল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে লীগ-অফ-নেশনস্-এ

আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের পূর্বচেষ্টা

উড্রো উইলসনের রাষ্ট্রসংঘ গঠনের পরিকল্পনা

প্রতিষ্ঠা হইল। লীগ-চুক্তি পত্রে ২৬টি দফা (article) ছিল। ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলীর মধ্যে লীগ-অফ-নেশনস্ গঠনের শর্তটি গৃহীত হয়।

লীগ-অফ্-নেশনস্-এর উদ্দেশ্য ঃ যুদ্ধের পরিবর্তে আপোষ-মীমাংসা ও পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।* লীগ-অফ-নেশনস্-এর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি অঙ্গীকার করিল যে যুদ্ধের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা উহারা আন্তর্জাতিক শন্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিবে। ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং আন্তর্জাতিক আইনকানুন মানিয়া চলিবে। রাষ্ট্র-সংঘের বিধি-নির্দেশ কোন রাষ্ট্র অগ্রাহ্য করিলে সংঘের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করিবে এবং প্রয়োজনবোধে সামরিক শক্তিও প্রয়োগ করিবে।

লীগের সংগঠন ঃ পঞ্চশক্তির (ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান ও ইটালী)† প্রতিনিধিগণের একটি কাউন্সিল (Council), লীগে যোগদানকারী সকল সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের একটি এসেমব্লী (Assembly) ও একটি স্থায়ী কার্যসংসদ (Secretariat)—এই তিনটি মূল প্রতিষ্ঠান লইয়া রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইল। ইহা ছাড়া আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি আন্তর্জাতিক আদালত (International Court) ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-দপ্তর (I. L. O.) নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। শ্রমিক-দপ্তরের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করা।

কাউন্সিল, এসেমব্লী, কার্য-সংসদ, আন্তর্জাতিক আদালত ও শ্রমিক দপ্তর

এসেমব্লী প্রতিনিধিমূলক সংস্থা হইলেও উহার কার্যকরী ক্ষমতা ও আইন রচনার ক্ষমতা ছিল না। আন্তর্জাতিক যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা ও পরামর্শ দেওয়াই ইহার একমাত্র ক্ষমতা ছিল।

কাউন্সিলের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা ছিল। যেমন নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা, বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে সদস্য-রাষ্ট্রকে রক্ষা করার ব্যপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতা করা।

কার্যসংসদ (Secretariat) একজন স্থায়ী সচিব ও আন্তর্জাতিক কর্মচারীগণ লইয়া গঠিত ছিল। এসেমব্লী ও কাউন্সিলের কর্মসূচী প্রস্তুত করা এবং উহাদের নির্দেশ কার্যকরী করার দায়িত্ব ছিল কার্যসংসদের।

---

*. লীগের উদ্দেশ্য : "To promote international co-operation and to achieve international peace and security by the acceptance of obligations not to resort to war".

† প্রথমে পাঁচটি স্থায়ী ও চারিটি অস্থায়ী সদস্য লইয়া গঠিত হইবার ব্যবস্থা হইলেও আমেরিকা ইহাতে যোগদান না করায় চারিটি সদস্য লইয়াই কাউন্সিল গঠিত হইল। পরে জার্মানী রাষ্ট্র-সংঘে যোগদান করায় কাউন্সিলের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা দাঁড়াইল যথাক্রমে পাঁচ ও নয়।

লীগ-অফ্-নেশনস্-এর প্রকৃতি : লীগ-অফ-নেশনস্-এর গঠনতন্ত্র বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে অতি-রাষ্ট্রিক (supper state) অথবা যুক্তরাষ্ট্র (federation) বলা যায় না। কারণ সার্বভৌম আইন রচনার ক্ষমতা ইহার ছিল না। সদস্যরাষ্ট্র-বর্গের সম্মতির ভিত্তির উপর লীগের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন সদস্যরাষ্ট্র উহার সার্বভৌমত্ব বা স্বাধীনতা লীগের নিকট সমর্পণ করে নাই এবং প্রয়োজন বোধে লীগের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিবার অধিকারও বর্জন করে নাই। প্রকৃত পক্ষে লীগ-অফ-নেশনস্ ছিল কতকগুলি রাষ্ট্রের একটি সংঘ। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য সদস্য রাষ্ট্রবর্গ কতকগুলি ব্যাপারে নিজেদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল মাত্র। লীগ-অফ-নেশনস্‌কে রাষ্ট্র নামেও অভিহিত করা যায় না। কারণ উহার নিজস্ব রাজ্য বা নিজস্ব সমর বাহিনীও ছিল না।

লীগ-অফ্-নেশনস্-এর কার্যাবলী : লীগ-অফ-নেশনস্ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রথমদিকে ইহার আধিপত্য যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করিতে লীগ যে সর্বদা ও সকল ক্ষেত্রে সততা ও ন্যায় নীতি অনুসরণ করিয়াছিল এমন কথা বলা চলে না। নিকারাগুয়া সম্পর্কে মেক্সিকোর অভিযোগ, অসমচুক্তি (Unequal Treaties) সম্পর্কে চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে বিবাদ, ইঙ্গ-মিশর দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ব্যাপারে লীগ অপক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বহুসংখ্যক বিবাদের মীমাংসা করিয়া লীগ একাধিকবার প্রকাশ্য যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রাজনৈতিক কার্যাদি

তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে সীমানা লইয়া সংঘর্ষের সূত্রপাত হইলে লীগ-অফ-নেশনস্-এর মধ্যস্থতায় উহা নিবারিত হয় এবং লীগের সিদ্ধান্ত উভয় রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লয়।

তুরস্ক বনাম ইরাক

ইউপেন ও মেলমেডি ছিল প্রাশিয়া ও বেলজিয়ামের সীমান্তের দুইটি প্রদেশ। ভার্সাই সন্ধি দ্বারা এই প্রদেশ দুইটি বেলজিয়ামকে দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লীগের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত গণভোটের দ্বারা উক্ত প্রদেশ দুইটির হস্তান্তকরণ আইনসিদ্ধ করা হইয়াছিল।

ইউপেন ও মেলমেডি

১৯২০ খৃষ্টাব্দে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে আর্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের কর্তৃত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষ লীগ-কাউন্সিলের শরণাপন্ন হয়। এই দুই রাষ্ট্র লীগের সদস্য ছিল না। কিন্তু লীগ-চুক্তিপত্র অনুসারে লীগের সদস্য ভিন্ন অন্যান্য রাষ্ট্রের পারস্পরিক বিবাদে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না। যা হউক লীগ কাউন্সিল এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেয় এবং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষ মানিয়া লয়।

আর্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ সংক্রান্ত বিরোধ

উচ্চ সাইলেশিয়ার প্রশ্ন লইয়া জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। উচ্চ সাইলেশিয়ার যে সকল অঞ্চলে পোলগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সেই অঞ্চলগুলি পোল্যাণ্ড দাবি করে। জার্মানী এই দাবির বিরোধিতা করিলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এই অবস্থায় লীগ কাউন্সিল হস্তক্ষেপ করিয়া উচ্চ সাইলেশিয়ার অবিভক্ত অঞ্চল জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। জার্মানী ও পোল্যাণ্ড লীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে উভয় পক্ষে শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়।

জার্মানী বনাম পোল্যাণ্ড

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইটালী ও গ্রীসের মধ্যে করফু সংক্রান্ত বিরোধের উদ্ভব হয়। গ্রীসে কতিপয় ইটালীয় সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করা হইলে উহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ইটালী গ্রীসের করফু নামক দ্বীপটি গোলাবর্ষণদ্বারা বিধ্বস্ত করে। গ্রীস ইটালীর বিরুদ্ধে লীগ কাউন্সিলের নিকট অভিযোগ উপস্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত ইটালী করফু পরিত্যাগ করিলে এবং গ্রীস ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলে বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে লীগ কাউন্সিল যুগোশ্লাভিয়ার আক্রমণ হইতে আলবানিয়াকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

ইটালী বনাম গ্রীস

যুগোশ্লাভিয়া বনাম আলবানিয়া

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ উপস্থিত হয়। বুলগেরিয়ার সৈন্য কর্তৃক জনৈক গ্রীক জেনারেল নিহত হইলে গ্রীস বুলগেরিয়া আক্রমণ করে। লীগ কাউন্সিলের হস্তক্ষেপের ফলে উভয়ের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা হইয়া যায়।

গ্রীস বনাম বুলগেরিয়া

জাপান ও চীন উভয়েই ছিল লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্য রাষ্ট্র। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া তথায় 'মাঞ্চুকুয়ো' নামে এক তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করিলে চীন লীগ কাউন্সিলে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। লীগ কাউন্সিল জাপানকে শুধু অভিযুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। লীগ জাপানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হয়।

জাপান বনাম চীন

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়ার সীমান্তে ইটালীয় ও ইথিওপিয় সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হইলে উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইটালী ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) আক্রমণ করিলে ইথিওপিয়া লীগের নিকট আবেদন করে। লীগ কাউন্সিল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ইটালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ মঞ্জুর করিল মাত্র। কোন প্রকার সামরিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নাই। ইটালী লীগের চরম দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া ইথিওপিয়া আক্রমণ করিয়া তাহা দখল করে। এই ব্যাপারে বিশ্বের নিকট লীগ-অফ-নেশনস্-এর অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

ইটালী বনাম ইথিওপিয়া

'-অফ-নেশনস্-এর অন্যান্য কার্যাদি ঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লীগ-অফ-নেশনস্ বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। নিরস্ত্রীকরণ-নীতি প্রয়োগ করিতে বা যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করিতে লীগ সমর্থ হয় নাই বটে কিন্তু সামাজিক ও জনহিতকর কার্যাদির ব্যাপারে লীগ আশাতীত সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

সামাজিক ও জনহিতর কার্যাদি

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা বিশ্বের সর্বত্র রোগ নিবারণ ও তাহা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে লীগ-এ্যাসেমব্লী একটি স্থায়ী স্বাস্থ্য সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করে। এই সংস্থা পূর্ব-ভূমণ্ডলে কলেরা ও প্লেগের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া কমিশন নামে অপর একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছিল।

রোগ প্রতিরোধ

বিশ্বের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চলে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ব্যাপারে লীগ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লীগ একটি অর্থনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিল। এই সম্মেলন সকল দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য দানের ও কৃষির উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছিল।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

ইহা ভিন্ন শ্রমিক সমস্যার সমাধান, ক্রীতদাস ব্যবসার অবসান, নারী সমাজের ও শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি নানা উন্নয়নমূলক বিষয়ে লীগ-অফ-নেশনস্ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

লীগ-অফ-নেশনস্-এর কৃতিত্ব ঃ নানা কারণে লীগ-অফ-নেশনস্ ব্যর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার অবদান একেবারে অস্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ সামাজিক অর্থনৈতিক ও মানবতার ক্ষেত্রে লীগ অভাবনীয় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিকে নানাভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন করিয়া, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার করিয়া এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করিয়া লীগ পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U. N. O.) নিকট এক অভিনব অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া লীগ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের যে প্রচেষ্টা করিয়াছিল তাহা পূর্ববর্তী যুগে দেখা যায় নাই। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার ব্যাপারে লীগের ব্যর্থতার জন্য লীগকে সর্বোতোভাবে দায়ী করা যায় না। ইহার জন্য দায়ী ছিল উহার সদস্য রাষ্ট্রবর্গের মনোভাব।

লীগ-অফ-নেশনস্-এর ব্যর্থতার কারণ ঃ লীগ-অফ-নেশনস্-এর ব্যর্থতার কারণ হইল—(১) লীগ-অফ-নেশনস্-এর আদর্শ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উহার সদস্য রাষ্ট্রবর্গের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া উহার উদ্দেশ্যে সার্থক করিয়া তুলিতে কেহই যত্নবান ছিল না। (২) সর্বসম্মতিক্রমে সি[illegible] গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। এই কা[illegible] সদস্যভুক্ত কোন রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা

লীগের আদর্শ সম্বন্ধে ধারণার অভাব

সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসুবিধা

সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। (৩) বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির প্রতি বিজিত রাষ্ট্রগুলির সন্দেহ এবং জার্মানীর প্রতিশোধাত্মক মনোভাব লীগের কার্যাদি সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। (৪) বৃহত্তর আন্তর্জাতিক স্বার্থের খাতিরে লীগের কোন সদস্যরাষ্ট্র উহার জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এক কথায় লীগের প্রতি সদস্যরাষ্ট্রবর্গের আনুগত্যের অভাব উহার ব্যর্থতার প্রধান কারণ। (৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগে যোগদান না করায় এবং রাশিয়া ও জার্মানী উহাতে যোগদানের অধিকার না পাওয়ায় প্রথম হইতেই লীগের গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। পরে জার্মানী ও রাশিয়াকে লীগের সদস্যভুক্ত করা হইয়াছিল বটে কিন্তু অনতিকাল মধ্যে জার্মানী ও জাপান লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করিলে উহার গুরুত্ব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। (৬) নিজস্ব সৈন্যবাহিনী না থাকায় লীগ-কাউন্সিল আপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিত না। ইহাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক ত্রুটি। (৭) লীগের সদস্য রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও স্বার্থ-সংঘাত উহার ব্যর্থতার অপর প্রধান কারণ।

পরাজিত রাষ্ট্রবর্গের বিরুদ্ধ মনোভাব

লীগের প্রতি আনুগত্যের অভাব

বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের সহযোগিতার অভাব

উপযুক্ত শক্তির অভাব

স্বার্থ সংঘাত

সংক্ষিপ্তসার

উৎপত্তি : মীমাংসার দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধ নিস্পত্তি ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা নূতন নহে। ফরাসী বিপ্লবের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে 'পবিত্র-সংঘ' ও 'রাষ্ট্র-সমবায়' স্থাপিত হইয়াছিল। এই একই উদ্দেশ্য লইয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ-অফ-নেশনস্-এর সৃষ্টি হয়। ইহাদের উদ্যোক্তা ছিলেন উড্রো-উইলসন।

উদ্দেশ্য : যুদ্ধের পরিবর্তে আপোস মীমাংসা ও পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাধান উদ্দেশ্য ছিল।

সংগঠন : একটি কাউন্সিল, এ্যাসেমব্লী, কার্যসংসদ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং শ্রমিক-দপ্তর—এই পাঁচটি সংস্থা লইয়া লীগ-অফ-নেশনস গঠিত ছিল।

কার্যাবলী : অনেক ক্ষেত্রে (যথা—ইঙ্গ-চীন ও ইঙ্গ-মিশর বিবাদ) লীগ অপক্ষপাতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই সত্য কিন্তু ইহাও সত্য যে বহু সংখ্যক বিবাদের (যথা তুরস্ক-ইরাক বিবাদ; যুগোস্লাভিয়া-আলবানিয়া বিবাদ; গ্রীস-বুলগেরিয়া বিবাদ; জার্মানী-পোল্যাণ্ড বিবাদ) মীমাংসা করিয়া একাধিকবার বৃহত্তর যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা ছাড়া লীগ-অফ-নেশনস্ বহু [illegible]কর কাজ করিয়াছিল—যেমন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা, শ্রমিক উন্নয়ন, ক্রীতদাস ব্যবসার অবসান ইত্যাদি।

ব্যর্থতার কারণ : লীগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সদস্য রাষ্ট্রবর্গের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব, সর্ব-[সম্ম]তিক্রমে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে অসুবিধা, সদস্য রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত—[প্র]ভৃতি কারণে লীগের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছিল।

প্রশ্নমালা

লীগ-অফ-নেশেনস্-এর উপৎত্তি ও কাযকলাপ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

[Write what you know of the origin and the activities of the League of Nations.] উঃ ২১১-২১৫ পৃঃ দেখ

লীগ-অফ-নেশেনস্-এর উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

[Describe the origin and the aims of the League-of-Nations.]

উঃ ২১১-২১২ পৃঃ দেখ

লীগ-অফ-নেশনস্-এর কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

[Describe the achievements of the League-of-Nations.] উঃ ২১৫ পৃঃ দেখ

লীগ-অফ-নেশেনস্-এর ব্যর্থতার কারণ কি ?

[What were the causes of the failure of League-of-Nations ?

উঃ ২১৫-২১৬ পৃঃ দেখ

দ্বাদশ অধ্যায়

রুশ বিপ্লব

(Russian Revolution)

জারশাসিত রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সমন্বয়ে গঠিত রুশ সাম্রাজ্য

রুশ সাম্রাজ্যের গঠন ঃ ইওরোপের অর্ধাংশ ও এশিয়ার এক বৃহদংশ এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী লইয়া রুশসাম্রাজ্য গঠিত ছিল। অধিবাসীদের অধিকাংশ হইল শ্লাভজাতিগোষ্ঠীভুক্ত। শ্লাভরুশগণকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) রাজধানী মস্কোকে কেন্দ্র করিয়া মধ্যবর্তী অঞ্চলের রুশগণ (ইহারা 'গ্রেট-রাশিয়ান' নামে পরিচিত), (২) কিয়েভকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের রুশগণ এবং (৩) লিথুয়ানিয়া অঞ্চলের শ্বেতরুশগণ। পোলেরা রুশদের সমগোত্রীয়। ইহারা রুশ-অধিকৃত পোল্যাণ্ড এবং লিথুয়ানিয়া ও ইউক্রেনের অধিবাসী। ইহাদের ভাষা অনেকটা রুশ-ভাষার মত। অবশ্য ইহাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রুশ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হইতে স্বতন্ত্র। পোলেরা রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী, সুতরাং সংস্কারের দিক দিয়া পশ্চিম ইওরোপীয় সংস্কারের প্রভাবাধীন। বাল্টিক অঞ্[illegible]নিয়া, লিভোনিয়া এবং কুরল্যাণ্ডের অধিবাসীগণ 'এস্তম্' ও 'লেট্‌স্' নামে পরিচিত। ইহাদের অধি[illegible] ছিল কৃষিজীবী এবং জার্মান জমিদারদের অধিকারভুক্ত। ক্রিমিয়া অঞ্চলের অধিবাসী-দের মধ্যে অধিকাংশই ছিল তাতার জাতিগোষ্ঠীভুক্ত ও ইসলামধর্মাবলম্বী। সাইবেরিয়া অঞ্চলের অধিবাসীগণ ছিল মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠীভুক্ত। শ্লাভজাতি

বহির্ভূত জাতিগুলির মধ্যে ইহুদীদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অধিকাংশ প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়ার শাসনভুক্ত। পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদের ফলে (অষ্টাদশ শতাব্দীতে) বহু ইহুদী রাশিয়ায় আগমন করিয়াছিল।

রাশিয়ার বিচ্ছিন্নতা: বহু শতাব্দী পর্যন্ত ইওরোপের ইতিহাস হইতে রাশিয়া ছিল বিচ্ছিন্ন। রুশ সাম্রাজ্যের বিশালতা ও পশ্চিম ইওরোপের সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সহিত উহার বৈষম্য বিচার করিলে রাশিয়াকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নয়নের দিক দিয়া রাশিয়া অপরাপর ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা দীর্ঘকাল পর্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইওরোপে যখন জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের প্রথম চেষ্টা চলিতেছিল, রাশিয়া সেই সময় অর্ধসভ্য অবস্থায় পড়িয়াছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইওরোপে যখন সামন্ত-প্রথার বিলুপ্তিসাধন ও জাতীয় রাজতন্ত্রগঠনের চেষ্টা চলিতেছিল, রাশিয়ায় সেই সময় আংশিক রাজতন্ত্র ও আংশিক সামন্ত প্রথা প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যখন পশ্চিম ইওরোপে নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠনের চেষ্টা চলিতেছিল, রাশিয়া সেই সময় ছিল নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রের শাসনাধীন।

অনগ্রসরতার কারণ

রাশিয়ার অনগ্রসরতা ও অনুন্নততার জন্য রুশ জনসাধারণকে দায়ী করা চলে না। যেমন সকল ফরাসীকে প্রগতিপন্থী বলা যায় না সেইরূপ সকল রুশগণকে প্রাচীনপন্থীও বলা যায় না। শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে রুশদের অবদান অকিঞ্চিৎকর নহে। সঙ্গীতে সাইকোডস্কি ও তুর্গেনিভ, সাহিত্যে টলস্টয়, তুর্গেনিভ ও ডসটোভস্কি, বিজ্ঞানে মেণ্ডেলিফ ও ম্যাচনিক প্রভৃতির অবদান কম গৌরবের বিষয় নহে। সুতরাং রাশিয়ার অনগ্রসরতার কারণ ছিল—(১) কখনও পূর্বতন রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত না হওয়ায় রাশিয়া প্রাচীন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিতে পারে নাই, (২) রাশিয়া মধ্যযুগে ক্যাথলিক সভ্যতারও বহির্ভূত ছিল, (৩) তিন শতাব্দী ধরিয়া তাতারগণ রাশিয়াকে সকল দিক দিয়া অনুন্নত রাখিয়াছিল এবং (৪) ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে রেনেসাঁসের প্রভাব রাশিয়ায় প্রবেশ করিতে পারে নাই।

রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবদান: সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রোমানভ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা রাশিয়ার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। জারতন্ত্রের শাসনাধীনে রাশিয়া মধ্যযুগীয় সভ্যতা বর্জন করে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কার গ্রহণ করে এবং কালক্রমে ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। পিটার দি গ্রেট, দ্বিতীয় ক্যাথারিন, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি 'জার' ও 'জারিনা'র (অর্থাৎ রাজা ও রানী) শাসনকালে রাশিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে মর্যাদালাভ করে। কিন্তু জারতন্ত্রের ত্রুটি ও সমাজ-জীবনে অনগ্রসরতার ফলে পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার ও রুশ-বিপ্লব অনিবার্য হইয়া দেখা দিয়াছিল।

জারতন্ত্রের আমলে রাষ্ট্রব্যবস্থাঃ রুশ সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত। রাষ্ট্রের সর্বময় প্রভু ছিলেন জার। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও অধিকারের উৎস ছিলেন জার। অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্রই ছিল প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। জার ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে রাজত্ব করিতেন। দেশে কোন লিপিবদ্ধ আইন ছিল না। জারের হুকুম ও ঘোষণাপত্রই ছিল আইন। সরকারী কর্মচারীগণ একমাত্র জার কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং জারের খেয়ালখুশির উপর কর্মচারীদের চাকুরির মেয়াদ নির্ভর করিত। একাধিক সংস্থা জারকে শাসনকার্যে সাহায্য করিত। এই সকল সংস্থার মধ্যে 'রাজ্য-সমিতি' (Council of Empire) ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্র ছিল এই সমিতি। স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই চলে।

কেন্দ্রীয় শাসন

প্রাদেশিক শাসন

কয়েকটি প্রদেশে সমগ্র সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল। প্রতিটি প্রদেশের শাসনকার্যের ভার একজন গভর্ণর ও একটি সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। গভর্ণর ও সমিতি নিয়োগ করার অধিকার ছিল একমাত্র জারের। কতক অঞ্চলে একজন গভর্ণর-জেনারেল নিয়োগ করার ব্যবস্থাও ছিল—যেমন পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ড। এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের শাসনভার একজন সামরিক গভর্ণরের উপর ন্যস্ত থাকিত। রাষ্ট্রে জনসাধারণের নির্বাচিত কাউন্সিল ছিল বটে কিন্তু সেইগুলির কার্যকরী ক্ষমতা কিছুই ছিল না। গ্রামাঞ্চলে 'মীর' নামে পঞ্চায়েত ছিল। ইহারা বাণিজ্যিক ও কৃষিকার্যের ব্যাপারে কিছু পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা ভোগ করিত। আমলাতন্ত্রই (Bureaucracy) ছিল শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অভিজাত সম্প্রদায় হইতেই উচ্চ সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করা হইত। নিম্নসম্প্রদায় এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল। শাসনযন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ ছিল পুলিস-বাহিনী। ইহাদিগকে জারতন্ত্রের প্রেটোরিয়ান গার্ড (Praetorian Guard) বলা যাইতে পারে। পুলিস বিভাগের ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল প্রবল। যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন সময় বিনা পরওয়ানায় বন্দী করার ক্ষমতা এই বিভাগের ছিল। জনসাধারণের উপর পুলিসের অত্যাচার সর্বজনবিদিত ছিল।

আমলাতন্ত্র

পুলিস-বিভাগ

জারতন্ত্রের আমলে সামাজিক অবস্থাঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার গুরুত্ব যতই বৃদ্ধি হউক না কেন উহার সমাজব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় এবং সমাজ-জীবন দুর্দশাগ্রস্ত। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে এই দেশ—তন্মধ্যে শ্লাভগণই ছিল সংখ্যাগরি[illegible] ও শাসকজাতি। জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ গ্রীক চার্চের অনুগামী খ্রীষ্ট[illegible] ছিল। পোলরা ছিল রোমান ক্যাথলিক, বাল্টিক অঞ্চলের এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া, ফি[illegible] প্রভৃতি রুশ-সাম্রাজ্যভুক্ত দেশের অধিবাসীগণ ছিল প্রটেস্ট্যাণ্ট, রাশিয়ার দক্ষি[illegible] অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল ইসলামধর্মী। অল্পসংখ্যক অধিবাসী ছিল হি[illegible] সম্প্রদায়ভুক্ত।

ধর্ম

অভিজাত ও সার্ফ : এই দুইটি শ্রেণী লইয়া রাশিয়ার সমাজ গঠিত ছিল। সমগ্র রাশিয়ায় প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অভিজাত পরিবার ছিল। ইহারা অধিকাংশই ছিল বিত্তশালী। ঐশ্বর্যের পরিমাণ পরিবারের অধীনস্থ সার্ফ বা অর্ধদাসের সংখ্যা দিয়া নির্ণয় করা হইত। রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা অভিজাতগণের একচেটিয়া ছিল। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায় যেরূপ সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত এবং ইহার পরিবর্তে সকল কর্তব্যপালন হইতে মুক্ত ছিল—রাশিয়াতেও অনুরূপ রীতি প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাশিয়া ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিকার্যের প্রধানতম অঙ্গ ছিল সার্ফ বা অর্ধদাস। অর্ধদাসদের (যাহারা মোট জনসংখ্যার অর্ধেক ছিল) অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। উহাদের অধিকাংশই অভিজাতদের অধীন ছিল এবং অবশিষ্ট অংশ চার্চ ও রাজপরিবারের অধীন ছিল। জমির সহিত অর্ধদাসদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। মালিকদের অনুমতি ভিন্ন ইহারা অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিত না। এমন কি মালিকদের অনুমতি ভিন্ন অর্ধদাসগণ বিবাহ পর্যন্ত করিতে পারিত না। কোনরূপ সামাজিক অধিকার না থাকায় অর্ধদাসদের নিজস্ব জমি ছিল না এবং উহাদের ব্যক্তিগত সকল কিছুই মালিকদের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। সার্ফদের উপর মালিক ও সরকারের অকথ্য অত্যাচার চলিত।

অভিজাত ও সার্ফ

সমাজে সার্ফ বা কৃষকশ্রেণী সংখ্যায় অধিক ছিল। কিন্তু উহাদের দুরবস্থার সীমা ছিল না। রাশিয়ার জারদের মধ্যে একমাত্র দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৫৫-৮১ খৃঃ) ভিন্ন অপর কেহই সমাজ-জীবনের উন্নতির জন্য সংস্কার প্রবর্তনের কোন চেষ্টা করেন নাই। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ ও প্রজাকল্যাণকামী শাসক। তিনি বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শহরগুলি উন্নয়নের জন্য তিনি পৌর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কার হইল সার্ফ-প্রথার বিলোপসাধন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি মুক্তি-নির্দেশ (Edict of Emancipation) নামক আইন পাস করিয়া সার্ফগণকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান ও উহাদের নাগরিক অধিকার দান করিয়াছিলেন। মুক্তিপ্রাপ্ত সার্ফগণ জমিদারদের নিকট হইতে জমি ক্রয় করার অধিকার পাইয়াছিল বটে কিন্তু ক্রয়লব্ধ জমি ব্যক্তিগতভাবে তাহাদিগকে না দিয়া সমষ্টিগতভাবে 'মীর' নামক সমবায় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীনে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 'মীর'-এর আধিপত্য উহাদের মনঃপুত হয় নাই।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সামাজিক সংস্কার

যাহা হউক [illegible] মুক্তি ও অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক [illegible]র প্রয়োজন দেখা দিল। মুক্ত সার্ফগণ কৃষিকার্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রমজীবিতে পরিণত হইল এবং দলে দলে শহরে আসিয়া কলকারখানায় যোগদান করিল। সার্ফদের মুক্তি বিপ্লবী-আন্দোলনের [illegible] প্রশস্ত করিল এবং অবশেষে জারতন্ত্রের অবসান ঘটাইল।

[illegible]-প্রথা বিলোপের [illegible]ফল

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত রাশিয়ায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না। মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভাবহেতু বহুকাল রাশিয়ায় কোন বিপ্লব বা বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নাই। এই শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়ায় শিল্পোন্নতি হইলে সমাজে একটি সমৃদ্ধিশালী মধ্যবিত্ত এবং এক বিরাট শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব হইল। উভয় সম্প্রদায় স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রের ও জমিদারশ্রেণীর ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিতে লাগিল। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দলে দলে কৃষকগণ কলকারখানায় যোগদান করিল এবং ইউনিয়ন গঠন করিয়া সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা কালক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হইতে পারে এই অশঙ্কায় জারসরকার শ্রমিকদের পক্ষে ধর্মঘট করা কিংবা ট্রেড-ইউনিয়ন গঠন করা নিষিদ্ধ করিলেন।

সুতরাং একদিকে কৃষকদের উপর 'মীর'-গুলির অত্যাচার এবং অপরদিকে শ্রমিকদের উপর মালিকদের অত্যাচার সমানভাবে চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার এবং গোর্কি, টলস্টয়, তুর্গেনিভ প্রভৃতি সাহিত্যিকদের রচনা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিল।

বিপ্লবের পথে রাশিয়া

রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত ঃ শিল্প-বিপ্লবের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু জারতন্ত্র এই নূতন পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হইবার পরিবর্তে অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার বিরুদ্ধে এক নূতন বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। শহরগুলিতে গণ-বিক্ষোভ, ধর্মঘট প্রভৃতি দেখা দিতে লাগিল এবং সর্বত্র সংস্কারের দাবি উত্থিত হইল। সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকিলেও বিপ্লবী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং বহু বিপ্লবী-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইল। আন্দোলনকারীদের এক দল 'লিবারেলস' ও অপর দল 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট' নামে পরিচিত ছিল। লিবারেলগণ ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে রাশিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু কার্ল মার্ক্সের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটগণ জারতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের পাক্ষপাতী ছিল।* বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটগণ দুইটি দলে বিভক্তি হইয়া পড়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বল্‌শেভিক (Bolshevik) ও সংখ্যালঘু দল মেনশেভিক, (Menshevik) নামে পরিচিত হইল

* রুশ বিপ্লবের প্রকৃতি সম্পর্কে রুশ সমাজতন্ত্রবাদের জনক প্লেখানভ বলিয়াছিলেন "The Russian Revolution will triumph as a revolution of the working class, otherwise it will not triumph at all".

বিংশ-শতাব্দীতে রাশিয়ার গণ-আন্দোলনের প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিপ্লবী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। জার সরকারও সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া বিপ্লবী অন্দোলন দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সেই সময় জার ছিলেন দ্বিতীয় নিকোলাস। তিনি ছিলেন দুর্বল ও ভীরু এবং শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে রানী আলেকজান্দ্রার প্রভাবাধীন। দুর্বল রাজার অধীনে সরকার অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। ইহুদীদের বিরুদ্ধে বিবিধ আইন রচিত হইল। বুদ্ধিজীবীরাই সকল বিপ্লবী মতবাদের উৎস ও প্রচারক—এই বিশ্বাসে শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের উপর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। রাশিয়ার অভ্যন্তরে সরকারের নির্যাতন যখন এইভাবে চলিতেছিল সেইসময় রুশ-জাপানের যুদ্ধে (১৯০৪-৫ খৃঃ) রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। রাশিয়ায় ইহার প্রতিক্রিয়া ভীষণভাবে দেখা দিল। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী-আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে একদল ধর্মঘটকারী তাহাদের দাবি জানাইবার জন্য জারের প্রাসাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলে জারের সেনাবাহিনী গুলি চালাইয়া বহুলোক হতাহত করিল। এই হত্যাকাণ্ড 'রক্তাক্ত রবিবার' (Bloody Sunday) নামে খ্যাত। এই ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হইলে সর্বত্র জনসাধারণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইল। সমগ্র রাশিয়ায় সাধরাণ ধর্মঘট উদ্‌যাপিত হইল। এই ধরণের ধর্মঘট আধুনিক কালের ইতিহাসে ইহার পূর্বে কোথাও উদ্‌যাপিত হয় নাই। জার নিকোলাস শাসনতন্ত্র সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং 'ডুমা' (Duma) বা জাতীয় পরিষদ গঠন করিলেন। সাময়িকভাবে জার-সরকার গণ-আন্দোলন দমন করিতে সমর্থ হইলেন।*

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব

ভূমিকা

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। একাধারে এই বিপ্লবকে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব বলা যাইতে পারে। ফরাসী বিপ্লবের পর এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব বিশ্বের অন্যত্র সংঘটিত হয় নাই।

জার সরকারের দমন-নীতি

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রথম প্রতিবাদ। সরকার নির্মমভাবে উহা দমন করিলেও জনসাধারণ পুনরায় বিপ্লবের প্রতীক্ষায় রহিল। জার দ্বিতীয় নিকোলাস জনসাধারণের দাবি পূরণ করার কোন চেষ্টা করিলেন না। উপরন্তু তিনি দমন-নীতির সাহায্যে রাজ্যশাসন চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

---

* ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ : (১) সরকারের প্রতি রুশ-সেনাবাহিনীর [illegible]নত্য (২) রাশিয়ার ন্যায় এক বিরাট দেশে আন্দোলন চালাইবার মত উপযোগী প্রতিষ্ঠানের অভাব [illegible] ফ্রান্স, জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া কর্তৃক জার সরকারকে সাহায্য দান এবং (৪) বিপ্লবী নেতৃবর্গের মধ্যে [illegible]তিগত মতভেদ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে রুশবাসী স্বদেশরক্ষার্থে জারতন্ত্রকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিল। কিন্তু ক্রমাগত জার্মানীর নিকট রাশিয়ার পরাজয় ঘটিলে রুশ-সামরিক নেতৃবর্গের অযোগ্যতা ও সরকারের অকর্মণ্যতা রুশবাসীর নিকট ধরা পড়িল। জারিনা (Czarina) ও রাসপুটিনের পরামর্শে জার নিকোলাস জার্মানীর সহিত পৃথক সন্ধি করিলে পরিস্থিতি জটিল হইয়া উঠিল। এই সংবাদে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া রাসপুটিনকে হত্যা করিল। সর্বত্র গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিল—কৃষকগণ বিদ্রোহী হইল, শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিল এবং রুশ-সৈন্য দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সর্বোপরি স্বদেশের খাদ্যাভাব পরিস্থিতিকে আরও সংকটময় করিয়া তুলিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রমিকগণ পেট্রোগ্রাড শহরে ধর্মঘট করিল। সেনাবাহিনী ধর্মঘট-কারীদের সহিত মিলিত হইল। আন্দোলন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য সৈনিক ও শ্রমিকগণ সম্মিলিতভাবে রাজধানীতে একটি সোভিয়েট বা পরিষদ গঠন করিল। জারের সেনাপতি আইভানভ (Ivanov) পেট্রোগ্রাড পুনরধিকার করিতে অসমর্থ হইলে জার নিকোলাস নিরুপায় হইয়া দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু জনসাধারণ দাবি করিল জারের সিংহাসন ত্যাগ। দেশের কোন শক্তিশালী সম্প্রদায় জারের সাহায্যে অগ্রসর হইল না। জারতন্ত্রের প্রধানতম স্তম্ভ সেনাবাহিনী ছিল বিদ্রোহীদের দলভুক্ত। এইরূপ পরিস্থিতিতে জার নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এইভাবে রাশিয়ার সর্বশেষ রাজবংশের (রোমানভ) অবসান ঘটিল। জনৈক রুশ বিপ্লবী নেতার ভাষায়, "History does not know of another government so stupid, so dishonest, so cowardly, so treacherous as the government now overthrown."

পেট্রোগ্রাডের বিদ্রোহ

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের সিংহাসন ত্যাগ

কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-৮৩)

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান উদ্‌গাতা হইলেন কার্লমার্ক্স। তাঁহার সমাজ-তন্ত্রবাদ রুশ বিপ্লবকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

জীবনী ও কার্যকলাপঃ ১৮:[illegible] খৃষ্টাব্দে কার্লমার্ক্স জার্মানীর এক মধ্যবিত্ত ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জার্মানীর [illegible] বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু আইন অপেক্ষা ইতিহাস ও [illegible] দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অধিক। শিক্ষালাভের পর তিনি সমাজ[illegible] বাদী হইয়া উঠেন। অভিজাতবংশীয় জেনি-ভন-ওয়েস্টফ্যালিনকে তিনি বিব[illegible]

করেন। তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে একটি উগ্রপন্থী সংবাদপত্রের সম্পাদনা শুরু করেন, কিন্তু তাঁহার মতবাদ প্রাশিয়া সরকারের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন। মার্ক্স প্রাশিয়া ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে আগমণ করেন। ফ্রান্সে তিনি ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া উঠেন এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্ নামে জার্মানীর এক খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রীর বন্ধুত্বলাভ করেন। ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ফরাসী সরকারের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ফ্রান্স হইতেও বিতাড়িত হন (১৮৪৫ খৃঃ)। মার্ক্স ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া ব্রাসেল্‌স্-এ আগমন করেন। ব্রাসেল্‌স্-এ অবস্থানকালে এঙ্গেল্‌স্-এর সাহায্যে মার্ক্স তাঁহার বিখ্যাত 'কমউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (Communist Manifesto) নামে এক ইস্তাহার রচনা করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংল্যাণ্ড হইতে প্রকাশিত হয়।

মার্ক্সের প্রাশিয়া ত্যাগ ও ফ্রান্সে আগমন

মার্ক্সের 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'

এই ইস্তাহারই আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। ইহাকে "Birth-cry of Modern Socialism" বলা হইয়া থাকে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম কথাই হইল "মনুষ্য সমাজের ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের নামান্তর মাত্র"।* মার্ক্স তাঁহার প্রচারিত 'সমাজতন্ত্রবাদ' (Socialism)-কে 'সাম্যবাদ' (Communism) নামকরণ করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জার্মানীতে ফিরিয়া যান এবং তথায় সাম্যবাদী আন্দোলন শুরু করেন। ফলে তিনি জার্মানী হইতে পুনরায় বিতাড়িত হন এবং লণ্ডনে আগমন করেন। লণ্ডনেই তিনি লেখাপড়ার ভিতর দিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ডাস্-ক্যাপিটাল' (Das Capital) প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মার্ক্স পরলোকগমন করেন।

মার্ক্সের 'ডাস্-ক্যাপিটাল'

মার্ক্সের পূর্বেও ইওরোপে সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদকে কিভাবে কার্যকরী করা যাইতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বতন সমাজতন্ত্রীদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। উপরন্তু উহাদের প্রচারিত সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যাও বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। মার্ক্সই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের দর্শন রচনা করেন। ইহা ছাড়া শ্রমিক উন্নয়ন ব্যাপারে মার্ক্স-এর আদর্শ পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রীদের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

পূর্বগামী সমাজতন্ত্রীগণ হইতে মার্ক্সের পার্থক্য

মার্ক্সের মতবাদ : প্রধানতঃ [illegible] সূত্রের উপর মার্ক্সীয়-মতবাদ (Marxian Communism) [illegible]ত। প্রথমতঃ, ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিয়া মার্ক্স বলিয়াছেন [illegible]মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক এবং ইতিহাস হইল বিভিন্ন শ্রেণীর

* "The history of all hitherto existing society is the history of class struggle".

অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের দ্বন্দ্বমাত্র। মার্ক্সের মতে বিত্তশালী মালিক শ্রেণী ও বিত্তহীন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য এবং ইহার ফলে একটি শ্রেণীহীন সমাজের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্স-এর মতে অর্থ শ্রমিকদের পরিশ্রমের ফল এবং অর্থের মাপকাঠি হইল শ্রমিক। সুতরাং শ্রমের মাপকাঠির দ্বারাই অর্থের বণ্টন হওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ, মার্ক্সবাদের অপর কথা হইল বিশ্বে শ্রমিকরাজ্য স্থাপন। আন্তর্জাতিক আবেদন সাম্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মার্ক্সবাদের প্রসার: মার্ক্সবাদের পূর্ণ প্রয়োগ একমাত্র রাশিয়াতেই দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি ইহার প্রভাব অন্যান্য দেশে বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশগুলিতে বিস্তারলাভ করিয়াছে। রাশিয়ার পর জার্মানীতে সমাজতন্ত্রবাদ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানীর 'সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক' পার্টির অনুকরণে ইওরোপের অন্যান্য দেশে মার্ক্সবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মার্ক্সবাদ জনপ্রিয় হয় নাই বটে কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়াই ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে জনকল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। বিসমার্কের ন্যায় উগ্র সাম্রাজ্যবাদীও জার্মানীতে বহুবিধ শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। চীন, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে স্থানীয় পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মার্ক্সবাদ কার্যকরী করা হইয়াছে।

রাশিয়ার অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ও রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়

জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করিলে 'ডুমা' বা জাতীয় পরিষদ একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছিল। 'প্রোলেটারিয়েট' বা সাধারণলোকের শাসন তখনও স্থাপিত হয় নাই। এই অস্থায়ী সরকারের উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা।

অস্থায়ী সরকারের অসাফল্য

সেই সময় অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করাই ছিল প্রধান প্রয়োজন। অস্থায়ী সরকার ইহা করিতে অসমর্থ হইলে পুনরায় গোলযোগের উদ্ভব হইল। শ্রমিক ও সৈনিকগণ সর্বত্র সোভিয়েট গঠন করিয়া জোর প্রচারকার্য চালাইতে লাগিল। শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিল এবং কৃষকগণ জমিদারদের জমি বলপূর্বক দখল করিল। এই অবস্থায় মেনশেভিক দলের নেতা কেরেনস্কি (Kerensky) শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। কেরেনস্কির উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা এবং জার্মানীর সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া। কিন্তু তাঁহার এই নীতি বলশেভিকদলের নেতৃবর্গ—লেনিন (Lenin) ও ট্রট্স্কির (Trotsky) মনঃপূত হইল না। বলশেভিকদলের উদ্দেশ্য ছিল প্রোলেটারিয়েটদের শাসন প্রবর্তন করা। অবশেষে দেশের অশান্তিময় পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া বলশেভিকদলের নেতা লেনিন ও তাঁহার সহকর্মীদ্বয় ট্রট্স্কি ও স্টালিন (Stalin)

মেনশেভিক দলের সাময়িক সাফল্য

বলশেভিক দল কর্তৃক শাসন-ক্ষমতা হস্তগত (১৯১৯)

শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন (১৯১৯ খৃঃ)। এইভাবে রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পন্ন হইল এবং রাশিয়ায় প্রোলেটারিয়েটদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

সংক্ষেপে রুশ বিপ্লবের কারণসমূহ : (১) ফ্রান্সের ন্যায় রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রও অকর্মণ্য ও অযোগ্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে, জাপানের সহিত যুদ্ধে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার একাধিক সামরিক বিপর্যয় রুশ জনগণের নিকট জারতন্ত্রের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বৈরতন্ত্রের অযোগ্যতা

ফ্রান্সের ন্যায় রাশিয়ার সমাজ-জীবনে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর স্বার্থ সংঘাত রাষ্ট্রীয় জীবনে এক প্রবল সংকটের সৃষ্টি করিয়াছিল। সমাজের নিম্নশ্রেণী সার্ফ বা দাসদের উপর অভিজাতদের অত্যাচার সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সার্ফগণকে মুক্ত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু উহাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে উঠিয়াছিল এবং এই কারণে যে কোনও পরিবর্তনকে উহারা সাদরে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে নাই।

সার্ফগণের অসন্তোষ

রাশিয়ার বিভিন্ন কারখানার লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা সার্ফদের ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। সুতরাং অতি সহজেই সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী প্রচারকার্য উহাদিগকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

শ্রমিক অসন্তোষ

ফ্রান্সের ন্যায় রাশিয়াতেও চিন্তাশীল ও দার্শনিকদের লেখনীর প্রভাব রুশ-বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। ফ্রান্সের ন্যায় পাশ্চাত্য ভাবধারা রুশ সাহিত্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। টলষ্টয়, ডসটিয়ভস্কি, টুর্গোনিভ প্রভৃতি দার্শনিকদের রচনা সর্বত্র স্বৈরাচারী শাসনের প্রতি এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল।

দার্শনিকদের প্রভাব

অর্থনৈতিক সমস্যা জনগণকে সমগ্রভাবে বিপ্লবমুখী করিয়া তুলিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাবনীয় মূল্য বৃদ্ধি, কলকারখানা হইতে শ্রমিক ছাঁটাই, শহর অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের শোচনীয় অভাব প্রভৃতি কারণে রুশ বিপ্লব শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হইয়া দেখা দিয়াছিল।

অর্থনৈতিক সংকট

বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট: [illegible]শিয়ার ইতিহাস (১৯১৯-৩৯)

[illegible]কারের আদর্শঃ এই নব-প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক সরকারের সমস্যাগুলি ছিল—[illegible]থমতঃ, বিপ্লব ও বিপ্লব-প্রসূত পরিবর্তনকে স্থায়ী করা; দ্বিতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ [illegible]ন্নয়নের জন্য বৈদেশিক যুদ্ধের অবসান করা এবং তৃতীয়তঃ, মার্ক্সবাদকে কার্যে [illegible]রিণত করা এবং বিশ্বে তাহা প্রচার করা।

আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া কমিউনিস্ট সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করিলেন। অতঃপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কাহারো কিছু রহিল না। বিনা ক্ষতিপূরণে কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। জারের আমলে কৃত সমস্ত রাষ্ট্রীয় ঋণ বাতিল করা হইল। চার্চকে রাষ্ট্রের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা হইল।

গোঁড়া সাম্যবাদী নীতির প্রয়োগ

কিন্তু এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে রাশিয়ায় এক দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল। কলকারখানার উৎপাদন কমিয়া গেল এবং কৃষকগণ উদ্বৃত্ত শস্য সরকারকে প্রদান করিতে অসম্মত হইল। ফলে শহরগুলিতে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিল। এই অবস্থায় লেনিন এক নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (N.E.P.) গ্রহণ করিলেন। কৃষকগণকে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করা হইল, ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া হইল এবং কয়েক বৎসরের জন্য বৈদেশিক পুঁজিপতিগণকে রাশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ দেওয়া হইল। গোঁড়া সাম্যবাদী নীতি বহুলাংশে ক্ষুন্ন হইলেও এই নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে রাশিয়া অর্থনৈতিক বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইল। শিল্প ও কৃষির উৎপাদন অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইল এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাশিয়ার যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা ফিরিয়া আসিল। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় হইল।

লেনিনের 'নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

ফলাফল

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব লইয়া স্টালিন ও ট্রট্স্কির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। শেষ পর্যন্ত স্টালিনের জয় হইল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্টালিন লেনিন প্রবর্তিত 'নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' চালু রাখিলেন। ইহার পর রাশিয়ায় সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, কয়লা, তৈল, ইস্পাত প্রভৃতি উৎপাদনের উপযোগী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি, উৎপন্ন সামগ্রীর ন্যায্য বণ্টন ইত্যাদি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৮ এবং ১৯৩৮ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছিল। ইহার ফলে কৃষি ও শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি (১৯১৭-৩৯)

১৯১৭ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বলশেভিক সরকারের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ট্রট্স্কি বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিকট একটি নোট পাঠাইয়া রুশ-সরকারের শান্তির প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। মিত্রপক্ষ ট্রট্স্কির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল কিন্তু জার্মানী উহাতে সাড়া দিল। ৩রা মার্চ

জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপন

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বলশেভিক সরকার ও জার্মানীর মধ্যে ব্রেস্ট-লিটভস্ক-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী: (১) রাশিয়া পোল্যাণ্ড, কুরল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়া পরিত্যাগ করিল এবং (২) রাশিয়া জার্মানী ও উহার মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলিতে বলশেভিক প্রচারকার্য না চালাইতে প্রতিশ্রুত হইল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সার্থক করার উদ্দেশ্যেই রাশিয়া এই অপমানজনক সন্ধি স্বীকার করিয়া লইল।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইওরোপের আক্রমণ

কিন্তু রাশিয়ার সাম্যবাদীরাষ্ট্রের উৎপত্তি ধনতান্ত্রিক জগতে উদ্বেগের কারণ হইল। রাশিয়ার শ্রমিক-রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শ্রমিকগণকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে পারে—পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ এইরূপ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। উপরন্তু জার আমলে কৃত রাষ্ট্রীয় ঋণ বলশেভিক সরকার বাতিল করায় পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ অসন্তুষ্ট হইল। সুতরাং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ রাশিয়ার নব-প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক সরকারকে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইল। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল মিত্রপক্ষ ও জার্মানী কর্তৃক অধিকৃত হইল। কিন্তু রুশ-জনসাধারণ যথাসর্বস্ব পণ করিয়া স্বদেশরক্ষার্থে শত্রুকে বাধা প্রদান করিল। অবশেষে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ইওরোপীয় আক্রমণকারীগণ রাশিয়া হইতে স্ব স্ব সেনাবাহিনী অপসারণ করিয়া লইল।

রাশিয়ার সাফল্য

১৯১৯ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সর্বত্র শ্রমিক বিপ্লব সংঘটিত করিয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্যে সোভিয়েট রাশিয়া বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে উহাদের সরকারের বিরুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য করিতে লাগিল। কিন্তু হাঙ্গেরী ও ইটালীর বিপ্লবী-আন্দোলন ব্যর্থ হইলে রাশিয়া উহার কর্মসূচী পরিবর্তন করিল। অতঃপর রাশিয়া পশ্চিম ইওরোপের ধনতন্ত্রবাদের ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে এশিয়ার জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে লাগিল। রাশিয়ার এই নীতি চীনে সাময়িকভাবে সাফল্যলাভ করিল। চীনের কুয়োমিং-তাং (Kuomin-tan) নামক বিপ্লবী-দল রাশিয়ার প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল। কিন্তু চিয়াং-কাইসেক-এর নেতৃত্বে কুয়োমিং-তাং দল ক্ষমতা লাভ করিলে চীন রুশ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করিল এবং চিয়াং-কাইসেক চীন হইতে কমিউনিস্ট প্রভাব দূর করিতে উদ্যোগী হইলেন।

[illegible] রাষ্ট্র নীতি [illegible] (১৯২১-১৯৩৯)

এই অবস্থায় [illegible] পুনরায় নীতির পরিবর্তন করিল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য রাশিয়ায় দ্রুত শিল্পোন্নতির প্রয়োজন ছিল। ইহার জন্য পশ্চিমী-মূলধন ও কারিগরী সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। অপর দিকে এশিয়ায় জাপান এবং ইওরোপে জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং রাশিয়া

পূর্ব-শত্রু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হইল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের আশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে রাশিয়া এই দুই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীকে উত্তেজিত বা প্ররোচিত করিবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত সহযোগিতা করার জন্য রাশিয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে লীগ-অফ-নেশনস্‌-এ যোগদান করিল। কিন্তু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর সহিত মিউনিক-এর চুক্তি সম্পাদন করিলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মনোভাব সম্পর্কে রাশিয়া সন্দিহান হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় নিজ নিরাপত্তার জন্য রাশিয়া জার্মানীর সহিত এক 'অনাক্রমণ-চুক্তি'তে আবদ্ধ হইল। রাশিয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া হিটলার রাজ্যগ্রাসী অভিযান শুরু করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও শুরু হইল। জার্মানীর সহিত রাশিয়ার মিত্রতা অধিকদিন স্থায়ী হইল না। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে হিটলার আকস্মিকভাবে রাশিয়া আক্রমণ করিলে রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করিল।

লীগ-অফ-নেশেসস্‌-এ রাশিয়ার যোগদান

রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে অনাক্রমণ-চুক্তি (১৯৩৯)

মিত্রপক্ষে রাশিয়ার যোগদান

লেনিন (১৯১৭-২৪): ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কাজান প্রদেশে লেনিনের জন্ম হয়। ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানোভ (Vladimir Ilyich Ulyanov)—নামেই তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে এক ছাত্র-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। পরে তিনি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছিলেন। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি মার্ক্সের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে বলশেভিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিপ্লবীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইলে তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হইল। নির্বাসনদণ্ডের অবসানের পর তিনি সুইজারল্যাণ্ডে গমন করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের সময় তিনি পুনরায় রাশিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সুইজারল্যাণ্ড হইতে জার্মানীর সাহায্যে যুদ্ধ বিরোধী বহু প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রাশিয়ায় পাঠাইতেন।

প্রথম জীবন

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের পতন ঘটিলে লেনিন জার্মানীর সাহায্যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। সেই বৎসর নভেম্বর মাসে তিনি জার্মানীর সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিলেন এবং পর বৎসর রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে স্থায়ী সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল।

লেনিন রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে [illegible]লিক করেন। ধনতন্ত্রবাদের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তিনি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। বিশ্বের সর্বত্র ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া প্রোলেটারিয়েটদের শাসন স্থাপন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান আদর্শ ছিল

বলশেভিক-সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া লেনিন সাম্যবাদের মূলনীতি অনুসারে রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করিলেন। কৃষকেরা জমিদারদের ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়া মালিক হইল। শ্রমিকেরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিয়া মালিকানা লাভ করিল। ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল।

কিন্তু এই সকল আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে বলশেভিক সরকারকে এক দারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইল। কৃষকগণ উদ্বৃত্ত ফসল সরকারের হস্তে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইল। সরকার এই সম্পর্কে বলপ্রয়োগ-নীতি গ্রহণ করিলে কৃষকগণ উৎপাদন কমাইয়া দিল। ফলে রাশিয়ায় এক দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিল। অপর দিকে শ্রমিকদের কোনরূপ পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অচল অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল। ফলে শিল্পোৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ অভাবনীয়ভাবে হ্রাস পাইল। সর্বত্র এক দারুণ অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দেখা দিল। উপরন্তু এইরূপ পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া জাপান সাইবেরিয়া আক্রমণ করিল। ইংরাজবাহিনী আর্কেঞ্জেল দখল করিল এবং প্রতিবিপ্লবীগণ মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিতে লাগিল।

আকস্মিক পরিবর্তনের ফলাফল: আভ্যন্তরীণ জটিলতা: প্রতিবিপ্লবীদের তৎপরতা ও বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ

এইরূপ অবস্থায় লেনিন নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। তিনি গোঁড়া সাম্যবাদী নীতির পরিবর্তে এক নূতন অর্থনৈতিক (New Economic Policy) গ্রহণ করিলেন। এই নীতিকে সংক্ষেপে N. E. P. বলা হইয়া থাকে। এই নীতি অনুসারে (১) কৃষকদের নিকট হইতে শস্য আদায় করার পরিবর্তে খাজানা আদায়ের ব্যবস্থা হইল, (২) উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করার অধিকার কৃষকগণকে দেওয়া হইল, (৩) ব্যক্তিগত ভাবে বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হইল এবং (৪) বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক মূলধন গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাম্যবাদী দলের কর্তৃত্ব (Communist Dictatorship) সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

নূতন অর্থনৈতিক নীতি (N. E. P.)

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে লেনিনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। বলশেভিক বিপ্লবের জনক এবং নূতন রাশিয়ার স্রষ্টা হিসাবে বিশ্বের ইতিহাসে লেনিন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

লেনিনের মৃত্যু

পররাষ্ট্রক্ষেত্রেও লেনিন সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সাধনের জন্য তিনি প্রথমে শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে ক্ষতি স্বীকার [illegible] জার্মানীর সহিত সন্ধি (ব্রেস্ট-লিটভস্ক-এর সন্ধি) করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় সাইবেরিয়া ও মধ্য-এশিয়ায় রাশিয়ার কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় এবং ককেশাস পর্বতের অপরদিকে অবস্থিত অঞ্চলগুলির উপর রাশিয়ার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদের বিস্তৃতির সহায়ক হিসাবে তিনি তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল

লেনিনের আ[illegible] [illegible]রাষ্ট্র-নীতি

(Third International)-এর অধিবেশন আহ্বান করেন। লেনিনের শাসন-কালের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্র রাশিয়ার সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করিয়া লয়।

স্টালিন : লেনিনের মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব লইয়া স্টালিন ও ট্রট্স্কির মধ্যে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হইল। অবশেষে ট্রট্স্কি পরাজিত হইয়া মেক্সিকোতে বিতাড়িত হইলেন। তথায় আততায়ীর হস্তে ট্রট্স্কির মৃত্যু ঘটে। স্টালিন রাশিয়ার সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হইলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯৫৩ খৃঃ) তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব লইয়া স্টালিন ও ট্রট্স্কির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

রুশ বিপ্লবে ট্রট্স্কির দান কম গৌরবময় ছিল না। তিনি ছিলেন রাশিয়ার লাল-ফৌজের স্রষ্টা এবং ইহার সংগঠন ও পরিচালনায় তাঁহার কর্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সাম্যবাদে ঘোর বিশ্বাসী এবং আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন অপেক্ষা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ বিস্তারের প্রতি তাঁহার অধিক আগ্রহ ছিল। কিন্তু লেনিন ও স্টালিন আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন।

রুশ বিপ্লবে ট্রট্স্কির দান

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে গোরি নামক শহরে জোসেফ স্টালিনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন কৃষক সম্প্রদায়সম্ভূত। অল্পবয়সে স্টালিন সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলের সদস্য হিসাবে তিনি অল্প বয়সেই সাম্যবাদী কার্যকলাপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি কিছুদিন এক ধর্মপ্রতিষ্ঠানে যাজকপদে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু ধর্ম অপেক্ষা রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি তিনি ছিলেন অধিক মনোযোগী। এই কারণে তিনি ছয়বার নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। জারতন্ত্রের পতনের পর তিনি মুক্তিলাভ করিয়া লেনিনের অন্যতম সহযোগী হন। রাশিয়ার বিপ্লব পরিচালনা ও বলশেভিকদলের সংগঠন ব্যাপারে তাঁহার দান অপরিসীম। তিনি ছিলেন বলশেভিক পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী। রুশ বিপ্লবের সময় তাঁহার সামরিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। স্টালিন বিশ্বাস করিতেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদী বিপ্লব না ঘটিলেও রাশিয়ায় উহা সম্ভব হইতে পারে এবং কৃষিপ্রধান রাশিয়াকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা যাইতে পারে

স্টালিনের প্রথম জীবন

স্টালিনের মত

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর তিনি লেনিন প্রবর্তিত নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিতে যত্নবান হইলেন। [illegible] কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য তিনি দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five [illegible] করিলেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯২৮-৩৩ খৃঃ) দ্বারা কৃষিজাত ও সামগ্রীর উৎপাদন অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩৩-৩৮ খৃঃ) দ্বারা শিল্পক্ষেত্রের উন্নতি সাধন করা হইল। অর্থনৈতিক

উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উন্নয়নের ফলে রাশিয়া বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হইয়াছে।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও স্টালিন সাফল্য অর্জন করেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের আক্রমণাত্মক মনোভাবের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য তিনি তুরস্ক ও জার্মানীর সহিত সন্ধি স্বাক্ষর করেন (১৯২৫, ১৯২৬ খৃঃ)। পরে জার্মানী কমিউনিস্ট-বিরোধী হইয়া উঠিলে রুশ-জার্মান মিত্রতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রুশ-জার্মান সন্ধি ফ্রান্সের মনঃপুত হয় নাই। অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে 'অনাক্রমণ-চুক্তি' (Non-Aggression Pact) স্বাক্ষরিত হয়। বহির্মঙ্গোলিয়া (Outer Mongolia) ও সিং কিয়াং প্রদেশে রাশিয়ার কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের পর হিটলারের অনাক্রমণাত্মক নীতিতে ভীত হইয়া রাশিয়া জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ইহার ফলে পূর্ব-সীমান্তে নিশ্চিন্ত হইয়া হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইয়াছিলেন।

তুরস্ক ও জার্মানীর সহিত সন্ধি

ফ্রান্সের সহিত সন্ধি

রাশিয়ার লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যপদ লাভ এবং জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি

রাশিয়ার বাহিরে রুশ বিপ্লবের প্রভাব

প্রথমদিকে রাশিয়ার বিপ্লব ইওরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির (যেমন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা) মধ্যে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। রুশ-শ্রমিকদের সাফল্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিক সম্প্রদায়কে বিপ্লবী করিয়া তুলিতে পারে, এই আশঙ্কায় পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ নূতন রাশিয়াকে ধ্বংস করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাশিয়া এই বিপদ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। রুশ বিপ্লবকে স্থায়ী করার জন্য লেনিন ও ট্রট্স্কি বিশ্বে সাম্যবাদী বিপ্লব বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ (Third International) গঠিত হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী ও চীন প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদী আন্দোলন জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কোথাও সাম্যবাদী আন্দোলন সফল হয় নাই।

রুশ বিপ্লবের সাফল্যে পশ্চিম ইওরোপের প্রতিক্রিয়া

বহির্বিশ্বে সাম্যবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন বিশ্বের সম্মুখে আশার সঞ্চার করিয়াছে। বহু দেশে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সহযোগিতার দ্বারা আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা চলিয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ে রাশিয়াকে পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে।

মানুষের [illegible] ভ্যন্তরীণ উন্নয়নের আদর্শ

"The I[illegible]

সংক্ষিপ্তসার

জারশাসিত রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা : ইওরোপের অর্ধাংশ ও এশিয়ার এক বৃহদাংশ এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী লইয়া রুশ-সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। বহু শতাব্দী পর্যন্ত ইওরোপের ইতিহাস হইতে রাশিয়া বিচ্ছিন্ন ছিল। রুশ সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত। রাষ্ট্রের সর্বময় প্রভু ছিলেন জার এবং স্বৈরতন্ত্রই ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাষ্ট্রে অভিজাত সম্প্রদায়ের একাধিপত্য ছিল। স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না বলিলেই চলে। শাসনতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ ছিল পুলিস-বিভাগ। রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়। অভিজাত ও সার্ফ এই দুইটি শ্রেণী লইয়া রাশিয়ার সমাজ-জীবন গঠিত ছিল। অভিজাতগণ রাষ্ট্র ও সমাজের সকল সুযোগ সুবিধার একমাত্র অধিকারী ছিল। নিম্ন সম্প্রদায় ছিল উপেক্ষিত ও নিষ্পেষিত। সার্ফ বা অর্ধদাসদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। উহাদের ব্যক্তিগত সব কিছুই মালিকদের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সার্ফ-প্রথার বিলুপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভাবহেতু বহুদিন পর্যন্ত রাশিয়ায় কোন বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই। শিল্প-বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হয়।

বিপ্লবের পথে রাশিয়া : শিল্প-বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার পূর্বতন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সর্বত্র সংস্কারের দাবি উত্থিত হইল। সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিপ্লবী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-জনসাধারণ সংস্কারের দাবি লইয়া জার-প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলে উহাদের উপর গুলি চলিল। ফলে জনসাধারণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইল। শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া শাসনব্যবস্থা বিকল করিয়া তুলিল। জার নিকোলাস 'ডুমা' বা জাতীয়-পরিষদ গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে বিদ্রোহ সাময়িকভাবে প্রশমিত হইল।

রুশ-সরকার নির্মমভাবে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ দমন করিলেও জনসাধারণ পুনরায় বিদ্রোহের প্রতীক্ষায় রহিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ও জার্মানীর সহিত গোপন সন্ধি জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিল এবং সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিল। এই অবস্থায় জার নিকোলাস নিরুপায় হইয়া দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠনে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর সমর্থনে জনসাধারণ জারের সিংহাসন ত্যাগ দাবি করিল। জার নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করিলে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটিল।

রাশিয়ার অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট : দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করিলে একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট শাসনভার গ্রহণ করিল। এই গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য ছিল পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রচলন করা এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করা। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইলে মেনশেভিকদল শাসনক্ষমতা হস্তগত করিল। মেনশেভিক সরকার শেষ পর্যন্ত বিফল হইলে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল শাসনক্ষমতা হস্তগত করিল। রাশিয়ায় প্রোলেটারিয়েটদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

বলশেভিক-গভর্ণমেণ্ট—(১) আভ্যন্তরীণ নীতি : প্রথম দিকে গোঁড়া সাম্যবাদী নীতির প্রয়োগ করিয়া আভ্যন্তরীণ সংস্কারের চেষ্টা চলিল। কিন্তু আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে এক দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের উদ্ভব হইল। এই অবস্থায় বলশেভিক সরকার 'নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' গ্রহণ করিয়া বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় হইল। ১৯২[illegible] খৃষ্টাব্দ হইতে স্টালিনের শাসনকালে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে রাশিয়ার কৃষি ও শিল্পের [illegible] অভাবনীয় উন্নতি হইল এবং রাশিয়া সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত হইল।

পররাষ্ট্রনীতি : আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে রাশিয়ার প[illegible] একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে রাশিয়া জার্মানীর সহিত সন্ধি করিল কিন্তু রাশিয়ায় সাম্যবাদ[illegible] উৎপত্তি পশ্চিম ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির আশঙ্কার কারণ হইল। সুতরাং রাশিয়ার প্রতি ইও[illegible] রাষ্ট্রগুলির আক্রমণ শুরু হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাশিয়া এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে

হইল। ১৯১৯ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতির লক্ষ্য ছিল বিশ্বে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই নীতি সফল হয় নাই। জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য রাশিয়া ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর সদস্যপদ লাভ করিল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করিলে রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করিল।

প্রশ্নমালা

১। রুশ বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র বর্ণনা কর।
[Give a short account of the political and social condition of Russia before the Russian Revolution.] উঃ ২১৭-২২১ পৃঃ দেখ

২। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের কারণগুলি বর্ণনা কর।
[Describe the causes of the Russian Revolution of 1917.] উঃ ২২৬ পৃঃ দেখ

৩। রাশিয়ার বাহিরে রুশ বিপ্লবের প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল।
[What were the consequences of the Russian Revolution outside Russia ?
উঃ ২৩৩ পৃঃ দেখ

৪। ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ার ইতিহাস সংক্ষেপে লিখ।
[Give an account of the history of Russia from 1919 to 1939.]
উঃ ২২৬-২৩০ পৃঃ দেখ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইওরোপ—(১৯১৯-১৯৩৯)

দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ইওরোপের অবস্থা

জার্মানী (১৯১৯-১৯৩৯): প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন জার্মানীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তেমনি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। সামরিক ও নৌ-বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সমাজতন্ত্রীগণ সর্বত্র রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতে লাগিল। আভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও রাজতন্ত্র-বিরোধী প্রচারকার্য তীব্র হইয়া উঠিলে দ্বিতীয় কাইজার পলায়ন করিয়া হল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিক ইবার্টের নেতৃত্বে জার্মানীতে রাজতন্ত্রের অবসান হইল [illegible] সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টা[illegible] জার্মানী আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক [illegible]কার্যে আত্মনিয়োগ করিল।

আভ্যন্তরীণ অরাজকতা

কইজারের পলায়ণ ও সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

[illegible]হ্বিয়ের বার্ট-এর নেতৃত্বে গঠিত সাধারণতন্ত্রের সম্মুখে নানাবিধ সমস্যা ছিল। ভার্সাই [illegible] অপমানজনক শর্তাদি গ্রহণ করায় নূতন সরকারের বিরুদ্ধে এক গভীর

"The
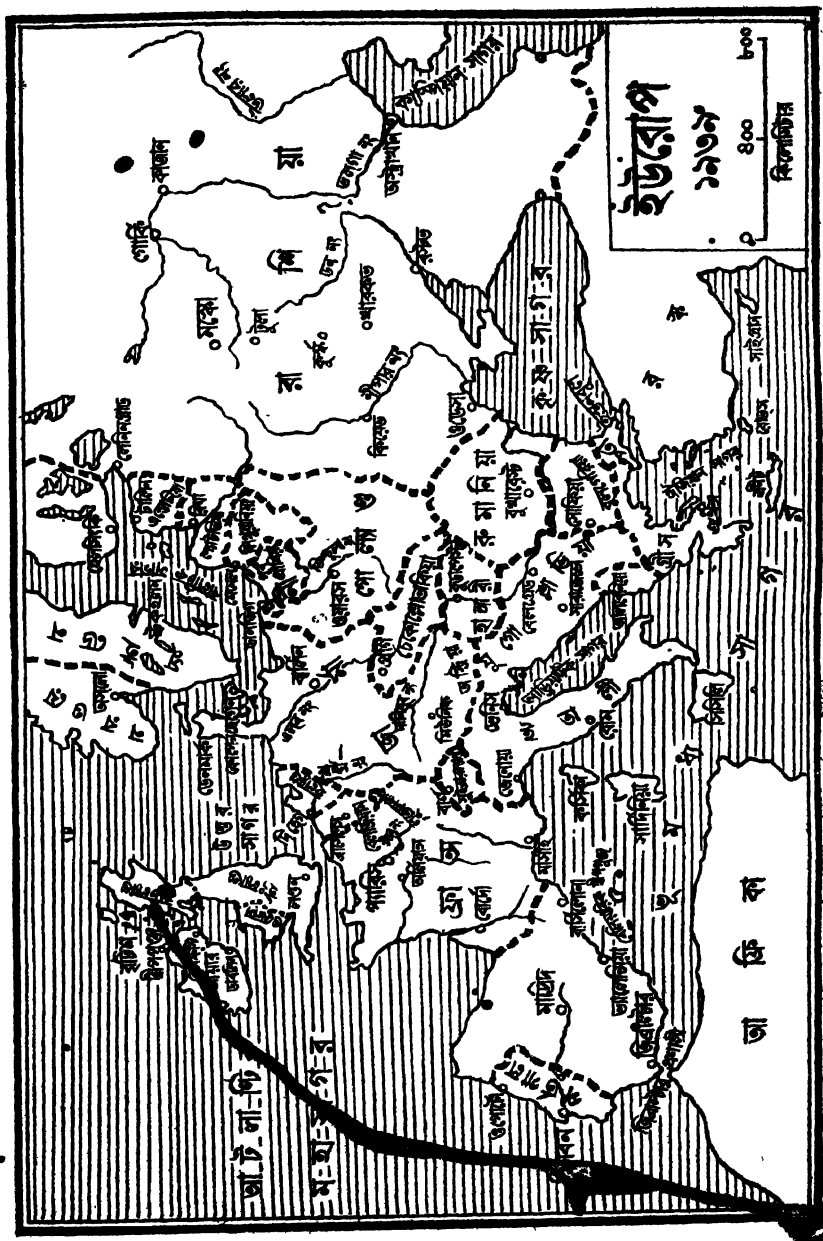
ইউরোপ
১৯৩৯
০ ৪০০ ৮০০
কিলোমিটার
আটলাণ্টিক মহাসাগর
উত্তর সাগর
কৃষ্ণ সাগর
রাশিয়া
মস্কো
গোর্কি
কাজান
টুলা
কুর্স্ক
খারকভ
কিয়েভ
রস্তভ
ওডেসা
লেনিনগ্রাড
হেলসিংকি
অসলো
ডেনমার্ক
বার্লিন
পোলাণ্ড
ওয়ারস
প্রাগ
চেকোশ্লোভাকিয়া
মিউনিক
অষ্ট্রিয়া
হাঙ্গারী
বুডাপেস্ট
রুমানিয়া
বুখারেস্ট
বেলগ্রেড
সোফিয়া
বুলগেরিয়া
ভেনিস
জেনোয়া
রোম
সারাজেভো
আলবেনিয়া
গ্রীস
ক্রীট
রোড্‌স
সাইপ্রাস
ফ্রান্স
প্যারিস
বোর্দো
মার্সাই
মাদ্রিদ
বার্সিলোনা
ভ্যালেন্সিয়া
জিব্রাল্টার
ওপোর্টো
লণ্ডন
ডাবলিন
বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ
কর্সিকা
সার্দিনিয়া
সিসিলি
আফ্রিকা
ভূমধ্য সাগর

অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মানীর বিত্তশালী শিল্পপতিগণ এবং সমর-নীতিতে বিশ্বাসী নেতৃবর্গ নবগঠিত সাধারণতন্ত্রী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। 'স্পার্টাকাস' পন্থী (Spartacist) জার্মানীর কমিউনিস্টগণ সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার বাধার সৃষ্টি করিতে থাকে। সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে জার্মান কমিউনিস্টগণ শ্রমিকদের একনায়কতন্ত্র ঘোষণা করিয়া সর্বত্র সোভিয়েট গঠন করিল। উহারা জার্মানীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণ করার ও বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের উগ্র সমর্থক ছিল। এই উদ্দেশ্যে জার্মান কমিউনিস্টগণ সমগ্র জার্মানীতে সৈনিক ও শ্রমিকগণকে উত্তেজিত করিয়া বিপ্লব সংঘটিত করিতে উদ্যোগী হইল। বার্লিন ও অন্যান্য শহরে কমিউনিস্টদের পরিচালনাধীনে প্রায় পাঁচ লক্ষ ব্যক্তি ধর্মঘট করিল। এক সপ্তাহ ধরিয়া এই ধর্মঘট চলিল ও স্থানে স্থানে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষও চলিল।

নবগঠিত সাধারণতান্ত্রিক সরকারের সমস্যা

কমিউনিস্ট আন্দোলন

জার্মানীতে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইলে ইবার্ট ও তাঁহার সমাজতন্ত্রী সমর্থকগণ কমিউনিস্টগণকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সাধারণতন্ত্রী সরকার এই ব্যাপারে সামরিক কর্মচারী ও অভিজাত শ্রেণীর সাহায্য লাভ করিলেন। অপর দিকে কমিউনিস্ট ও স্বতন্ত্র সমাজতন্ত্রীগণ সম্মিলিতভাবে নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল। ফলে দুইপক্ষে যুদ্ধ শুরু হইল এবং দশদিনের মধ্যে কমিউনিস্টদের আন্দোলন দমন করা হইল। কমিউনিস্টদের পরিচালনাধীনে এক সপ্তাহ ধরিয়া শ্রমিক ধর্মঘট চলিল এবং স্থানে স্থানে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষও চলিল। অবশেষে ইবার্ট-সরকার কঠোর হস্তে কমিউনিস্টদের আন্দোলন দমন করিলেন। একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া জনসাধারণের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে একটি সংবিধান-সভা আহূত হইল। ভাইমার নামক স্থানে জার্মান জাতির প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া জার্মানীর জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করিলেন। ইহা 'ভাইমার শাসনতন্ত্র' নামে পরিচিত। ইবার্ট এই সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে একজন প্রেসিডেণ্ট ও দুই কক্ষযুক্ত (রাইকস্ট্যাগ ও রাইকস্ট্যাডেট) একটি আইনসভার ব্যবস্থা হইল এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হইল।

ভাইমার শাসনতন্ত্র

নূতন সরকারের সম্মুখে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দানের সমস্যা ছিল অন্যতম। বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক বিরাট [illegible] বোঝা জার্মানীর স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া [illegible]য়াছিল। কিন্তু সন্ধির শর্তানুসারে জার্মানী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে ফ্রান্স বেলজিয়ামের সহিত [illegible]বে জার্মানীর খনি-প্রধান রাঢ় (Rubr) অঞ্চল দখল করিল। ইহার প্রত্যুত্তরে [illegible]গণ উক্ত অঞ্চলে ধর্মঘট চালাইয়া সমগ্র দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি

ক্ষতিপূরণ [illegible]

করিল। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য জার্মান সরকার ষ্ট্রেসমান নামক জনৈক সুদক্ষ অর্থনীতিবিদ্‌কে নিযুক্ত করিলেন। জার্মানীর শিল্পসম্পদ বিনষ্ট হইলে জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা অসম্ভব হইবে বিবেচনা করিয়া ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার চেষ্টায় আমেরিকার জনৈক অর্থনীতিবিদ্‌ চার্লস ডাওয়েজ-এর অধীনে একটি কমিটি নিয়োগ করা হইল। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে জার্মানীকে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুযোগ দেওয়া হইল এবং ফ্রান্স ও বেলজিয়াম রাঢ় অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণ করিল। কিন্তু জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিপূরণের বিশাল অঙ্ক পরিশোধ করা সম্ভব না হওয়ায় ইয়ং কমিশন নামে অপর একটি কমিশন নিয়োগ করা হইল। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তিন-চতুর্থাংশ কমাইয়া দেওয়া হইল এবং আমেরিকা কর্তৃক জার্মানীকে অর্থসাহায্যদানের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিলে আমেরিকার পক্ষে জার্মানীকে অর্থ সাহায্য করা সম্ভব হইল না। ফলে জার্মানীও ক্ষতিপূরণ প্রদানে অক্ষমতা জানাইল।

সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যা ও লোকার্নো-চুক্তি

জার্মানীর সাধারণতান্ত্রিক সরকারকে সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যারও সম্মুখীন হইতে হয়। ভার্সাই সন্ধি অনুসারে জার্মানীকে যেভাবে ছেদন করা হইয়াছিল তাহাতে জার্মানী ও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির মধ্য সীমানা লইয়া এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। অবশেষে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইটালীর মধ্যে লোকার্নো-চুক্তি (Locarno Pact) অনুসারে জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত করা হইল। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানী জাতিসংঘে (League of Nations) প্রবেশাধিকার পাইল।

ভাইমার সাধারণতন্ত্রের ব্যর্থতা: হের ষ্ট্রেসম্যানের নেতৃত্বে (১৯২৩ ২৯ খৃঃ) যুদ্ধোত্তর ইওরোপের পুনর্গঠন ব্যাপারে জার্মানী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ডাওয়েজ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছিল এবং জার্মানী লীগ-অফ-নেশনস্‌-এ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল। জার্মানীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হইলেও তখন পর্যন্ত জার্মান সাধারণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। আভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রবর্তনের ব্যাপারে এই সরকার কোন নির্দিষ্ট কার্যসূচী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। উপরন্তু সাধারণতান্ত্রিক সরকারের পররাষ্ট্রনীতি জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। *এই সরকারের পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভার্সাই সন্ধির শর্তাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া জার্মানীর সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ও বিশ্বরাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা।* কিন্তু শেষ পর্যন্ত জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য [illegible] নাই। উপরন্তু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম যুগ্মভাবে রাঢ় অঞ্চল দখল করিলে জার্মানী অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়ে।

হিটলারের অভ্যুদয়: বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসর জার্মানীতে দারুণ আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গকে ক্ষতিপূরণ দি

মুদ্রাস্ফীতি ও কৃষিজাত উৎপন্নের মূল্য হ্রাস—প্রভৃতি কারণে জার্মানীর অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছিল। জার্মানীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অচল অবস্থায় আসিয়া পৌছিলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জার্মানী যখন অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন এবং জনসাধারণের দুর্দশা যখন চরমে উঠিল সেই সময় দেশের দুঃখ-দুর্দশার অবসানের পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়া হের হিটলার ও তাঁহার ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টি (নাৎসী পার্টি) জার্মানীর রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

জার্মানীর আর্থিক বিপর্যয়
হিটলারের অভ্যুদয়

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এ্যাডলফ্ হের হিটলার অষ্ট্রিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন অষ্ট্রিয়ার একজন সাধারণ কর্মচারী। আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু অল্প বয়সেই হিটলারকে স্কুল ত্যাগ করিতে হয়। বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্যাভেরিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া সৈনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। যুদ্ধের পর তিনি 'জাতীয়-সমাজতন্ত্রী জার্মান-শ্রমিক পার্টি' (National Socialist German Workers Party) নামে একটি দল গঠন করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বলপূর্বক ভইমার সাধারণতান্ত্রিক সরকারের অবসান ঘটাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং কারাগারেই তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেই ক্যাম্ফ' (Mein Kamf) রচনা করেন। এই গ্রন্থটিকে 'নাৎসী-বাইবেল' বলা হইয়া থাকে। ইহাতে হিটলারের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও নাৎসীদলের কর্ম-স্থচীর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শীঘ্রই হিটলারের নাৎসীবাদ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং জার্মানীর যুব-সম্প্রদায় ইহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। হিটলার ও তাঁহার নাৎসীদলের কর্মস্থচীতে জার্মানগণ তাহাদের মুক্তির সন্ধান পাইল। নাৎসীদলের কর্মস্থচীতে প্রধান কথাই ছিল সমগ্র জার্মান ভাষাভাষী অধিবাসীগণকে লইয়া এক বৃহৎ জার্মান রাষ্ট্র গঠন করা এবং জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপন করা।

হিটলারের প্রথম জীবন

নাৎসীদলের জনপ্রিয়তা

নাৎসীদলের কর্মস্থচী

কিছুদিন কারাবাস করার পর হিটলার মুক্তি পাইলেন। অতঃপর হিটলার মুসোলিনীর অনুকরণে তাঁহার ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট বা জাতীয় সমাজতন্ত্রীদল নূতন-ভাবে পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। স্বোয়াস্তিক' তাঁহার দলের প্রতীক স্বরূপ গৃহীত হইল। সমগ্র জার্মানীতে দলের নেতৃবৃন্দকে পাঠাইয়া জনসাধারণের সম্মুখে হিটলার তাঁহার দলের কর্মস্থচী জনপ্রিয় করিয়া [illegible] যত্নবান হইলেন। জার্মানীর যুব-সম্প্রদায় হিটলারের [illegible] কর্মস্থচী দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তাঁহার দলে যোগদান করিল। [illegible] জার্মান ব্যবসায়ী শ্রেণী ইহুদী-বণিক ও ইহুদী শিল্পপতিগণের একাধিপত্যে [illegible] হইয়া হিটলারের নাৎসীদলে যোগদান করিল। করভারে প্রপীড়িত কৃষক [illegible]য়ও নাৎসীদলকে অন্তরিক সমর্থন জানাইল। হিটলারের প্রচারকার্যে আশঙ্কিত [illegible] সাধারণতান্ত্রিক সরকার হিটলারকে বন্দী করিলেন। তাঁহার কারাদণ্ড ও

বিচার সমগ্র জার্মানীতে এক গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। অচিরে তাঁহাকে মুক্তি-দান করা হইল এবং ইহার ফলে নাৎসীদল অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিল। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভাইমার শহরে নাৎসীদলের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হইল। ইতিমধ্যে নাৎসীদলের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে নাৎসীদল অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করিল এবং রাইকস্ট্যাগে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিল। ফলে সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গ হিটলারকে চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রীপদে নিয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দলকে দমন করিয়া হিটলার ও নাৎসীদল রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তগত করিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যু হইলে হিটলার জার্মানীর প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলার হইলেন। হিটলার অতঃপর 'ফুহেরার' (Fuhrer) নামে পরিচিত হইলেন।

সাধারণ নির্বাচনে নাৎসী দলের সাফল্য

হিটলার চ্যান্সেলার-পদে নিযুক্ত

হিটলারের আভ্যন্তরীণ নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, (১) জার্মানীতে নাৎসীদলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করা, এবং (২) অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করা। তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল (১) জার্মানী সম্পর্কিত ভার্সাই সন্ধির শর্তাদি ভঙ্গ করা এবং (২) ইওরোপের সমগ্র জার্মানজাতিকে একত্রিত করা।

হিটলারের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি

প্রথমেই হিটলার সাম্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত জার্মানীর ইহুদী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইলেন। হিটলার বিশ্বাস করিতেন যে জার্মানগণ আর্যবংশসম্ভূত, সুতরাং জার্মান রাষ্ট্রে অ-জার্মানদের স্থান নাই। ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা হইল এবং নানাভাবে উহাদের উপর অত্যাচার চলিল। কমিউনিস্ট, সোস্যাল ডেমোক্রাট প্রভৃতি নাৎসী-বিরোধী দলগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে হস্তান্তরিত করা হইল। এইভাবে জার্মানীতে হিটলারের একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হইল।

ইহুদী নির্যাতন : কেন্দ্রীভূত শাসন

কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়া হিটলার আভ্যন্তরীণ উন্নয়নে উদ্যোগী হইলেন। শ্রমিকসংঘ ও মালিকসংঘ প্রভৃতি সংস্থান ভাঙিয়া দেওয়া হইল এবং উহার স্থলে শ্রমিক ও মালিকদের যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় রাখা হইল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইল। কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল, পশম, রবার এবং এমনকি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কার করা হইল।

আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন

হিটলার তথা জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতি : হিটলারের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল (১) ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা, (২) ইওরোপের সমগ্র জার্মান জাতিকে একত্রিত করিয়া একটি বৃহৎ জার্মান

প্রধান উদ্দেশ্য

স্থাপন করা। এই কারণে তিনি শান্তির পরিবর্তে সমর-নীতি গ্রহণ করিলেন।

সামরিক প্রস্তুতি

আভ্যন্তরীণ আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানাপ্রকার সামরিক সামগ্রী উৎপাদন করিয়া জার্মানীকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে যোগদান করিয়া তিনি ফ্রান্সের আক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সামরিক সাজসরঞ্জাম রাখিবার অধিকার দাবি করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই দাবি অপরাপর রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক সমর্থিত না হওয়ায় হিটলার সম্মেলন বর্জন করিলেন। ইহার পর ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের দুর্বলতা ও উহাদের পারস্পরিক বিবাদের

রোম-বার্লিন-টোকিও মৈত্রী

সুযোগ লইয়া হিটলার তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য-সাধনে উদ্যোগী হইলেন। তিনি রাইনল্যাণ্ড দখল করিলেন এবং জার্মানী, জাপান ও ইটালীর মধ্যে একটি মৈত্রীসংঘ (Rome-Berlin-Tokyo Axis) স্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি জার্মানীর বাহিরে সমস্ত জার্মান অধিবাসীগণকে জার্মানভুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। এক এক করিয়া তিনি অষ্ট্রিয়া,

জার্মানী কর্তৃক অষ্ট্রিয়া-সুদেতানল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল

সুদেতানল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিলেন। জার্মানীর সামরিক সাফল্যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া আতঙ্কিত হইল। হিটলারকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স মিউনিক চুক্তির (Munich Pact—1938) দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর জার্মানীর কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইল।

জার্মানী কর্তৃক ডানজিগ দখল ও পোল্যাণ্ড আক্রমণ

অপরদিকে রাশিয়াও হিটলারের সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি (Non-Aggression Pact) সম্পাদন করিল। কিন্তু হিটলারের পররাজ্য-গ্রাস স্পৃহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতঃপর তিনি বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত ডানজিগ শহর দখল করিলেন এবং ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে (১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল।

ইটালী (১৯১৯-৩৯): যুদ্ধোত্তর ইটালীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ফ্যাসিস্ট আন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর নাৎসীদের ন্যায় ইটালীর ফ্যাসিস্টদলও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক কার্যসূচী রচনা করিয়া স্বদেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের মূলে ছিল ইটালীর যুদ্ধোত্তর অবস্থা। রাজ্যলাভের আশায় ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে ইটালী মিত্রপক্ষের নিকট হইতে আশানুরূপ

পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে ইটালী[illegible]

লাভ করে নাই। ভার্সাই সন্ধি ইটালীবাসীদের জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারে নাই। আড্রিয়াটিক উপকূলে ফিউম (Fiume) ও দাবানিয়া প্রাপ্তির ব্যাপারে ইটালীকে নিরাশ হইতে হইয়াছিল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার করার ব্যাপারেও মিত্রপক্ষ ইটালীকে নিরাশ করিয়াছিল।

রাজ্যলাভে নিরাশা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইটালীর জাতীয় অপমান ইটালীবাসীকে মর্মাহত করিয়াছিল। ইটালীর তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর তীব্র অসন্তোষও মিত্রশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দিল। অপরদিকে ইটালীর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও শান্তি ছিল না। ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলির ন্যায় ইটালীকেও এক দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। দেশের সর্বত্র ধর্মঘট ও অরাজকতা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে অসন্তোষের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈনিক, কারখানার শ্রমিক, চাকুরীজীবি সকলেই উপযুক্ত কর্মের অভাবে দেশের বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। কমিউনিস্ট রাশিয়ার বহুসংখ্যক চর ইটালীর জনগণের মধ্যে ধর্মঘট, বলপূর্বক কলকারখানা দখল ও শ্রমিক-একনায়কতন্ত্রের কথা প্রচার করিতেছিল। রুশ-বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত ইটালীর উগ্র সমাজতন্ত্রীগণ রাশিয়ার অনুকরণে স্বদেশে বিপ্লব ঘটাইবার পরিকল্পনা করিতেছিল। গ্রামাঞ্চলে বিশৃঙ্খলা ব্যাপক আকার ধারণ করিল এবং বহু জমিদার নিহত হইল। কারখানা, ডাক-বিভাগ ও রেলবিভাগে ধর্মঘট দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হইল এবং ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ অচল অবস্থায় আসিয়া পৌছিল। সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীগণ আভ্যন্তরীণ অশান্তিতে ইন্ধন যোগাইয়া দেশকে বিপ্লবমুখী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইটালীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনগণ সাম্যবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ অরাজকতা

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এইরূপ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির কবল হইতে দেশকে রক্ষা করিতে ইটালীর তদানীন্তন সরকার ছিলেন সম্পূর্ণ অক্ষম। ক্ষমতালাভের জন্য বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত, নির্বাচন ব্যাপারে উৎকোচ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন, বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অভাব প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্রীয় জীবনে এক ঘোরতর গোলযোগের উদ্ভব হইয়াছিল। পার্লামেন্টের ভিতরে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে স্বার্থসংঘাত ও ষড়যন্ত্র শাসনযন্ত্রকে বিকল করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন মন্ত্রিসভার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে কোনরূপ স্বল্প মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী সংস্কারমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। উগ্রপন্থী সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে ইটালীর মধ্যবিত্তশ্রেণী আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। দেশকে অরাজকতার কবল হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভিতর হইতে এক নূতন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হইল। এই দলের নেতা ছিলেন বেনিটো মুসোলিনী (Benito Mussolini) এবং ইহার মত ফ্যাসিজম্ (Fascism) নামে পরিচিত। ফ্যাসিবাদীগ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইটালীর জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতী ছিল।

আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দূর করিতে সরকারের অক্ষমতা

ফ্যাসীবাদী দলের উৎপত্তি

ইঁহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিল। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইহারা যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল। ইহাদের সহিত জার্মানীর নাৎসীবাদীদের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। ইটালীতে ফ্যাসিবাদীদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনীর পরিচালনাধীনে ফ্যাসিবাদী-বাহিনী রোম অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইহাদের সংখ্যা ও শক্তিতে ভীত হইয়া ইটালীর গভর্ণমেণ্ট পদত্যাগ করিলেন। এক অন্তর্বিপ্লব হইতে দেশকে মুক্ত করার জন্য ইটালীর রাজা ভিক্টর তৃতীয় ইমান্যুয়েল মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালীতে ফ্যাসিস্ট-গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় পর্যন্ত (১৯৪৩ খৃঃ) মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদীদের একনায়কতন্ত্র চলিল।

ফ্যাসীবাদী দলের নীতি

মুসোলিনীর প্রথম জীবন

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ছিলেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। আঠারো বৎসর বয়সে মুসোলিনী এক স্কুলের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। পরে তিনি সুইটজারল্যাণ্ডের লুসান ও জেনেভার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন এবং ট্রেড-ইউনিয়ন গঠন করেন। তিনি ইটালীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার করিতে থাকেন। এই কারণে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে 'বিপজ্জনক বিপ্লবী' বলিয়া তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তিলাভ করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনী সমাজতন্ত্রীদলের মুখপাত্র 'আভান্তি' নামক এক পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে মুসোলিনী ইটালীর নিরপেক্ষতা সমর্থন করেন এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা প্রচার করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য জনমত সৃষ্টি করিতে থাকেন। ইটালী কর্তৃক বিশ্বযুদ্ধে যোগদান মুসোলিনীর মতে ইটালীর জনগণের বিপ্লবী মনোভাবের নিদর্শন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধান্তে যুদ্ধে নিযুক্ত কর্মীগণকে এক সভায় আহ্বান করিয়া তিনি ইটালীর যুদ্ধোত্তর সমস্যা আলোচনা করেন। "দক্ষিণপন্থীদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি ও বামপন্থীদের ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি" হইতে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মুসোলিনী যুব-সমাজকে লইয়া একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ইহা ফ্যাসিস্টদল নামে পরিচিত। ফ্যাসিবাদীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মসূচী প্রকৃতপক্ষে বিপ্লববাদী হইলেও উহারা উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ফ্যাসিস্টদল ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে। বেকার যুবক, কর্মচ্যুত সৈনিক, জমিদার ও মালিকশ্রেণী দলে দলে ইহাতে যোগদান করিতে থাকে। ফ্যাসিবাদীগণ

মুসোলিনী কর্তৃক ফ্যাসিস্ট দল গঠন

ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের জনপ্রিয়তা

কালো পোষাক ব্যবহার করিত এবং সামরিক কুচকাওয়াজ ও নিয়মানুবর্তিতা ফ্যাসিবাদী সংঘের প্রধান অঙ্গ ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে ফ্যাসিবাদীগণ একদল সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী গঠন করে।

মুসোলিনীর রোম অভিযান

পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে মুসোলিনী ক্ষমতালাভে উদ্যোগী হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধান্তে ইটালীর যুব-সমাজ তাঁহার নেতৃত্বে ফ্যাসীবাদীদল গঠন করে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার ফ্যাসিবাদী-বাহিনী লইয়া রোম অভিমুখে অগ্রসর হইলে ইটালীরাজ ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইটালীর পার্লামেণ্ট স্বেচ্ছায় মুসোলিনীর হস্তে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা অর্পণ করে। এইভাবে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালীতে ফ্যাসিবাদীদলের একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হয়।

মুসোলিনী তথা ফ্যাসিবাদী সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতি

অর্থনৈতিক সমস্যাই ফ্যাসিবাদী সরকারের সম্মুখে সর্বাধিক গুরুতর সমস্যা ছিল। জনসংখ্যার বৃদ্ধি হেতু দেশে স্থানাভাব, শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব, কাঁচামালের জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতা, বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়াছিল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য কৃষির উন্নতিসাধন করা হইল, কলকারখানায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ হইল, নৌ-বিভাগের উন্নতি করা হইল এবং বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করা হইল। ইহা ছাড়া সামরিকবাহিনী পুনর্গঠন করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান করা হইল।

পররাষ্ট্রনীতি: জার্মানীর নাৎসী সরকারের ন্যায় ইটালীর ফ্যাসিবাদী সরকারও সমর-নীতির সমর্থক ছিল। মুসোলিনী বিশ্বাস করিতেন যে সাম্রাজ্যবাদ ও সমর-নীতি রাষ্ট্রীয় শক্তির মানদণ্ড। নাৎসীবাদী জার্মানীর ন্যায় ফ্যাসিবাদী ইটালীও ভার্সাই সন্ধির অবিচারমূলক ব্যবস্থাদির প্রতিকার করার পক্ষপাতী ছিল।

সমর-নীতি গ্রহণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের সহিত ইটালীর বিরোধ উপস্থিত হইল। ইটালী, ফরাসী অধিকৃত টিউনিশিয়া, কর্সিকা, স্যাভয়, নীস প্রভৃতি স্থান নিজস্ব বলিয়া মনে করিত। মিত্রপক্ষ এই সকল স্থানের উপর ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্বীকার [illegible] ইটালী ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। [illegible] পর্যন্ত যুদ্ধ ঘটে নাই। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইটালী পূর্ব আফ্রিকার স্বাধীন রাজ্য আবিসিনিয়া দখল করিল। লীগ-অফ-নেশনস্ এই ব্যাপারে ইটালীর বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই।

ফ্রান্সের সহিত মনোমালিন্য

ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া ও আলবানিয়া অধিকার

আবিসিনিয়া অভিযানের পর ইটালী লীগ-অফ-নেশনস্ পরিত্যাগ করিল এবং জার্মানী ও জাপানের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ হইল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে স্পেনের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে জেনারেল ফ্রাঙ্কো (General Franco) তথায় একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। মুসোলিনী ও হিটলার ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইটালী আলবানিয়া আক্রমণ করিয়া দখল করিল। এইভাবে জার্মানীর ন্যায় ইটালীও পররাজ্যগ্রাস-নীতি অনুসরণ করিয়া ইওরোপে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইটালী কর্তৃক জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দান

ফ্রান্স (১৯১৯-৩৯) ঃ বিশ্বযুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। ফ্রান্সের বহু অঞ্চল যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি—একরূপ অচল অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ফ্রান্সের কিছু লাভ হইয়াছিল। আলসাস-লোরেন, আফ্রিকার অন্তর্গত টোগোল্যাণ্ড, ক্যামারুন এবং পশ্চিম ইওরোপে সিরিয়ার কর্তৃত্ব ফ্রান্স লাভ করিয়াছিল। জার্মানীর পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে লইয়া গঠিত 'ন্যাশনাল-ইউনিয়ন' (National Union) ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিল। ইহাদের বিরোধীপক্ষ ছিল সমাজতন্ত্রীগণ। বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে মতানৈক্য থাকার ফলে কোন মন্ত্রিসভা অধিকদিন স্থায়িত্বলাভ করিতে পারিত না। ক্রমাগত মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের ফলে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি নির্দিষ্টভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। মন্ত্রিসভার দ্রুত পরিবর্তন যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের প্রধান সমস্যা ছিল। যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সংকট ফ্রান্সের দ্বিতীয় সমস্যা ছিল। ফ্রান্সের জাতীয় ঋণের মাত্রা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয়সংকুলান, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য রক্ষা এবং বিধ্বস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠন প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যয়ের মাত্রা অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সকে এক দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

পররাষ্ট্রনীতি ঃ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রথমদিকে ফ্রান্স জার্মানীর সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছিল। এই বিষয়ে ফ্রান্স ও জার্মানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্রিয়াঁ ও স্ট্রেসমান ছিলেন অগ্রণী। তাঁহারা ইওরোপে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীবন্ধনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ব্রিয়াঁ অপরাপর ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের জার্মান-ভীতি কতকাংশে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রিয়াঁ ও স্ট্রেসমানের চেষ্টায় লোকার্নো-চুক্তি (Locarno Pact) ও কেলগ-চুক্তি (Kellogg Pact) সম্পাদিত হইয়াছিল।[1] কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতির

---

[1] লোকার্নো-চুক্তি : ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এই চুক্তি দ্বারা (১) ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও জার্মানীর সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়, (২) ফ্রান্স ও জার্মানী যথাক্রমে রাইন অঞ্চল ও আলসাস-লোরেনের দাবি পরিত্যাগ করে এবং (৩) ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও জার্মানী এই রাষ্ট্রত্রয়ের যে কোন রাষ্ট্র চুক্তিভঙ্গ করিলে ইংল্যাণ্ড ও ইটালী অপর দুইটি রাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়।

পরিবর্তন ঘটিল। জার্মানী ও ইটালীর আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং উহাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে ভীত হইয়া ফ্রান্স আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইল এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতি শুরু করিল।

স্পেন (১৯১৯-৩৯) : যুদ্ধের সময় স্পেন নিরপেক্ষ থাকিয়া লাভবান হইয়াছিল। উভয়পক্ষে যুদ্ধাস্ত্র জোগান দেওয়ার ফলে স্পেনের প্রচুর অর্থাগম হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ইওরোপের অন্যত্র যে ধরনের রাজনৈতিক গোলযোগ ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়াছিল—স্পেন তাহা হইতে মুক্ত ছিল। কিন্তু স্পেনের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এক দারুণ গোলযোগ ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল। স্পেনের সর্বত্র শ্রমিক-শ্রেণী দীর্ঘদিন যাবৎ ধর্মঘট চালাইয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বিকল করিয়া তুলিয়াছিল। কোন কোন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীগণ দেশের সংহতি বিপজ্জনক করিয়া তুলিতেছিল।

এইরূপ পরিস্থিতিতে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাজা ত্রয়োদশ আলফানশো (Alphanso XIII)-র সম্মতিক্রমে সেনাপতি প্রাইমো-ডি-রিভেরা (Primo de Rivera) শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। স্পেনের পার্লিয়ামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং প্রচলিত শাসনতন্ত্র রদ করা হইল। রিভেরা পরিচালিত একনায়কতন্ত্রের বিরোধীদলগুলিকে কঠোর হস্তে দমন করা হইল। শীঘ্রই রিভেরার শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হইল। শ্রমিক ও ছাত্রসমাজ বিদ্রোহী হইল। এমন কি সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিপ্লব সংক্রামিত লইল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা আলফানশো রিভেরাকে পদচ্যুত করিলেন। কিন্তু পর বৎসর রাজধানীতে এক সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান ঘটিলে রাজা সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হইল এবং স্পেনে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইল।

ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় স্পেনীয় বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন। বিপ্লব-পূর্ব ফ্রান্সের ন্যায় স্পেনেও মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সামন্তপ্রথা, চার্চের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা ছিল স্পেনের সেই সময়কার অবস্থা। জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র ও নিরক্ষর। দেশের শিল্প ও উৎকৃষ্ট জমিগুলি অভিজাতদের ভোগদখলে ছিল। কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। সুতরাং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের স্পেনীয় বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ছিল 'পূর্বতন-শাসনব্যবস্থার' (Old Regime) সম্পূর্ণ বিলুপ্তিসাধান করিয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে স্পেনে প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠিত হইল এবং উহার প্রথম প্রেসিডেন্ট হইলেন নিমেটো জামারো। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে

স্পেনের নূতন শাসনতন্ত্র

(১) রাজা আলফানশোকে দেশদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল, (২) অভিজাতদের সকল সুযোগ-সুবিধা অস্বীকার করা হইল এবং উহাদের বহু

কেলগ-চুক্তি : ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্রিয়াঁ ও আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী কেলগের চেষ্টায় এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করিতে সম্মত হয়।

ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল, (৩) কৃষকদের মধ্যে জমি নূতন করিয়া বণ্টন করা হইল, (৩) প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইল এবং (৫) চার্চকে রাষ্ট্রের অধীন করা হইল।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বহাল রহিল। কিন্তু শীঘ্রই ইহার বিরুদ্ধে এক দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। অভিজাত, ধর্মযাজক, ও নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীগণ বিপ্লবী শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা শুরু করিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হইল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হইল। জেনারেল ফ্রাঙ্কো (Franco) বিরোধীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ইওরোপের প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলি স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে সমর্থন করিল। কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনী জেনারেল ফ্রাঙ্কো ও বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিরপেক্ষ রহিল। প্রায় তিন বৎসর গৃহযুদ্ধ চলিবার পর জেনারেল ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করিয়া স্পেনে একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিলেন (১৯৩৯ খৃঃ)।

[ইওরোপের অপরাপর দেশগুলির আলোচনা দশম অধ্যায়ে করা হইয়াছে।]

গ্রেট ব্রিটেন ঃ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন ব্রিটেনে উদারনৈতিক (Liberals), রক্ষণশীল (Conservatives) ও শ্রমিক (Laborites) —এই তিনটি রাজনৈতিক দলের একটি সংযুক্ত সরকার গঠিত হয় এবং লয়েড জর্জ সংযুক্ত মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। যুদ্ধের কারণে পার্লামেণ্টের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, নির্বাচনী প্রথায় সংস্কার প্রবর্তন করা হয় এবং ত্রিশ বৎসরের উর্ধ্ববয়স্কা নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়।

যুদ্ধের পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রমিক দল পার্লামেণ্টে দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করে। লয়েড জর্জ উদারপন্থী দলের নেতা হিসাবে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্যারিসে শান্তি চুক্তিগুলিতে স্বাক্ষর সম্পন্ন করিয়া তিনি স্বদেশে অর্থনৈতিক সংকটের প্রতি মনোযোগী হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পরে ব্রিটেনে এক দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব হয়। ইহার প্রধান কারণ ছিল জার্মানী ও রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন এবং এশিয়া, আমেরিকা ও জাপানের প্রাধান্য বিস্তার। ইওরোপের নূতন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলি শুল্ক-প্রাচীরের সৃষ্টি করিলে ব্রিটেনের রপ্তানী ব্যবসা অভাবনীয়ভাবে হ্রাস পায়। ইহা ভিন্ন যুদ্ধ প্রসূত ক্ষতি ব্রিটেনের জাতীয় অর্থসংকটের অপর কারণ ছিল। এই সংকটের প্রতিরোধকল্পে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনের বেকার নর-নারীগণকে ভাতা দানের ব্যবস্থা করিলেন এবং বহু কর্মহীন শ্রমিককে কানাডায় স্থানান্তরিত করিলেন। সেই সঙ্গে ব্রিটেনের শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবারও চেষ্টা চলিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন রাশিয়ার সহিত একটি বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করিল এবং শিল্প-সংরক্ষণ আইন বিধিবদ্ধ হইল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে র‍্যামসে-ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে ব্রিটেনে সর্বপ্রথম শ্রমিক সরকার গঠিত হইল। শ্রমিক সরকারের সম্মুখে নানাবিধ সমস্যা ছিল। শ্রমিক

সরকার বিপ্লবী-সংস্কার প্রবর্তন করিবেন—এই আশঙ্কায় পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণ সরকারের বিরোধী হইয়া উঠিল এবং কিছুসংখ্যক মার্কিন পুঁজিপতি তাহাদের মূলধন ব্রিটেন হইতে সরাইয়া লইল। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক সরকার ব্রিটেনের শ্রমিকগণের আশা-আকাজ্ঞা চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। ব্রিটেনে বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে শ্রমিক সরকারের জনপ্রিয়তা বিনষ্ট হইল এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে বল্ডউইন (Boldwin)-এর নেতৃত্বে ব্রিটেনে রক্ষণশীল মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিলেও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। ব্রিটেনে শিল্প-সংকটের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। উচ্চ হারে শুল্ক, কতকগুলি নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং বৈদেশিক ব্যবসায়ী সংঘকে সরকার কর্তৃক সাহায্য দান প্রভৃতি সত্ত্বেও শিল্পক্ষেত্রে কোনরূপ উন্নতি ঘটে নাই। বেকারত্ব ও শ্রমিক-সংকট পূর্ববৎ চলিতে থাকে। ১৯২৪ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। অবশেষে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে রক্ষণশীল, জাতীয় উদারনৈতিক (National Liberals) ও জাতীয় শ্রমিক (National Laborites)—এই তিনটি দলের একটি সংযুক্ত সরকার গঠিত হইল। ইহা 'জাতীয়-সরকার' (National Government) নামে পরিচিত। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সরকার ক্ষমতায় আসীন থাকেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন রুশ-বিপ্লব সংঘটিত হয়। ব্রিটেন পশ্চিম ইওরোপের অন্যান্য শক্তির সহিত সম্মিলিতভাবে রুশ-বিপ্লব ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের উদারনৈতিক সরকার ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত এক বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং পরবর্তী শ্রমিক সরকার সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করিয়া লন। উদারনৈতিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ পরাজিত জার্মানীর প্রতি অত্যন্ত কঠোর মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে জার্মানীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা জার্মানীর প্রতি উদার মনোভাব প্রদর্শন করেন। ব্রিটেন জার্মানী সম্পর্কে ডাওয়েজ পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং লীগ-অফ-ন্বেশনস্-এ জার্মানীর প্রবেশ সমর্থন করে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্রিটেন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত লোকার্ণো-চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইটালী ও ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ-ঋণ-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় ব্রিটেন-বিরোধী কার্যকলাপের প্রসার ঘটিলে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত ব্রিটেনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। অবশ্য পরবর্তী শ্রমিক সরকার রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের পর ইটালী, জাপান ও জার্মানীর আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ ব্রিটেনকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতি তোষণনীতি গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে

পররাষ্ট্রনীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটেন তোষণনীতি অনুসরণ করিয়া চলে। জার্মানী ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

সংক্ষিপ্তসার

দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ইওরোপের অবস্থা: জার্মানী: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আভ্যন্তরীণ অরাজকতার ফলে সম্রাট কাইজার উইলিয়াম পলায়ন করিলে জার্মানীতে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। সমর-নীতিতে বিশ্বাসী নেতৃবর্গ, বিত্তশালী শিল্পপতিগণ ও কমিউনিস্টদের বিরোধিতা এক দারুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল। শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দমন করিয়া সাধারণতন্ত্রী সরকার এক নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিল। সাধারণতন্ত্রী সরকারের সম্মুখে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যা ছিল জটিল। কিন্তু জার্মানী ও ইওরোপের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা সম্ভব হইল না। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইটালীর মধ্যে সম্পাদিত লোকার্নো-চুক্তি অনুসারে সীমানা সম্পর্কিত সমস্যার মীমাংসা করা হইল।

ইতিমধ্যে জার্মানীর আর্থিক বিপর্যয় ও সমরবাদী নেতৃবর্গের অসন্তুষ্টির সুযোগ লইয়া হিটলার ও তাঁহার নাৎসী দল জার্মানীর রাজনীতিতে প্রবেশ করিল। নাৎসী দলের কর্মসূচী জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া নাৎসী দল ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইল। জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে সামরিক এক নায়কতন্ত্র (Military Dictatorship) স্থাপিত হইল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হিটলারের লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ও সামরিক পুনর্গঠন এবং পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে তাঁহার লক্ষ্য ছিল ভার্সাই সন্ধির শর্তাদি ভঙ্গ করা ও ইওরোপের সমগ্র জার্মানজাতিকে একত্রিত করিয়া এক বৃহৎ জার্মান রাষ্ট্র গঠন করা। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও নাৎসী-বিরোধী দলগুলিকে দমন করিয়া নাৎসী দলের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া হিটলার রাইনল্যাণ্ড দখল করিলেন; জার্মানী, জাপান ও ইটালীর মধ্যে এক মৈত্রী-সংঘ স্থাপন করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে অস্ট্রিয়া, সুদেতানল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিলেন। অতঃপর তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল।

ইটালী: ভার্সাই সন্ধি ইটালীবাসীর জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারে নাই। রাজ্যলাভে নিরাশা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইটালীর জাতীয় অপমান ও আর্থিক বিপর্যয় প্রভৃতি কারণে ইটালীর তদানীন্তন সরকার ও মিত্রশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ইটালীতে এক দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হইল। উগ্রপন্থী সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে ইটালীর মধ্যবিত্ত শ্রেণী আতঙ্কিত হইল। দেশকে অরাজকতার কবল হইতে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী দলের উদ্ভব হইল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ফ্যাসিবাদী-বাহিনী রোম অভিমুখে অগ্রসর হইলে ইটালীর রাজা মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইটালীতে ফ্যাসিবাদী দলের একনায়কতন্ত্র চলিল। নানারূপ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক প্রস্তুতিও চলিল। পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে জার্মানীর নাৎসীবাদী দলের ন্যায় ইটালীর ফ্যাসিবাদীদলও সমরনীতিতে বিশ্বাসী ছিল। এই নীতি অনুসরণ করিয়া ইটালী আবিসিনিয়া দখল করিল; মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানী ও জাপানের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইল এবং আলবানিয়া দখল [illegible] এইভাবে জার্মানীর ন্যায় ইটালীও ইওরোপে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল।

ফ্রান্স: বিশ্বযুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের যথেষ্ট ক্ষতি যদিও হইয়াছিল কিন্তু উহার আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ফরাসী ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দ্রুত মন্ত্রিসভার পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক সমস্যা। পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে ফ্রান্স শান্তি স্থাপন ও জার্মানীর সহিত সহযোগিতা স্থাপন

করার পক্ষপাতী ছিল। ফ্রান্স ও জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রিদের চেষ্টায় লোকার্ণো-চুক্তি ও কেলগ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু জার্মানীর আক্রণাত্মক নীতির ফলে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন হইল এবং ফ্রান্স আত্মরক্ষায় সচেতন হইল।

স্পেন : স্পেন বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া লাভবান হইয়াছিল। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ধর্মঘট ও সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের ফলে এক ঘোরতর অরাজকতার উদ্ভব হইয়াছিল। বিপ্লবের হাত হইতে স্পেনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেনাপতি রিভেরা শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন এবং কঠোর হস্তে বিরোধী দলগুলিকে দমন করেন। কিন্তু শীঘ্রই রিভেরার শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহী হইল এবং স্পেনের রাজা পলায়ন করিলে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইল। এক নূতন বিপ্লবী শাসনতন্ত্র রচিত হইল কিন্তু দেশের নরমপন্থীদলগুলি ইহার বিরোধিতা করিলে গৃহযুদ্ধ শুরু হইল। জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিরোধীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করিয়া একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিলেন।

গ্রেটব্রিটেন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনে অর্থনৈতিক সংকট ও দ্রুত মন্ত্রিসভার পরিবর্তন চলিতে থাকে। রুশ-বিপ্লব, জার্মানীর পরাজয় প্রভৃতি কারণে ব্রিটেনের রপ্তানি ব্যবসা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অপরদিকে এশিয়ায় আমেরিকা ও জাপানের সহিত বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। যুদ্ধের অবসানে ব্রিটেনে বহু কলকারখানা বন্ধ হইয়া যায় এবং ইহার ফলে বেকারের সংখ্যা অভাবনীয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের ঢেউ ব্রিটেনেও আসিয়া পড়ে এবং ইহার ফলে ব্রিটেনেও এক দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেনে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্তিত হয় এবং শ্রমিকদলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে ব্রিটেন রাশিয়ার সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করিয়া লয়, জার্মানীর প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা হেতু লোকার্ণো-চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং আমেরিকার সহিত সম্পর্ক উন্নত করে। ইওরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায় যথাক্রমে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ব্রিটেন উপরোক্ত তিনটি রাষ্ট্রের প্রতি তোষণ-নীতি গ্রহণ করে এবং জার্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করিলে ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়।

প্রশ্নমালা

১। ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

[Write a short history of Germany from 1919 to 1939] উঃ ২৩৪-২৩৭ পৃঃ দেখ

২। হিটলারের অধীনে জার্মানীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

[Write a short history of Germany under Hitler.] উঃ ২৩৭-২৩৯ পৃঃ দেখ

৩। মুসোলিনীর অধীনে ইটালীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

[Write a short history of Italy under Mussolini.]

উঃ ২৪১ পৃষ্ঠার শেষাংশ হইতে ২৪৩ পৃঃ দেখ

৪। টীকা লিখ :—(ক) হিটলার, (খ) মুসোলিনী,

[Write notes on—(a) Hitler, (পৃঃ [illegible]-২৩৯ দেখ) (b) Mussolini..(পৃঃ ২৪২-২৪৩ দেখ)]

চতুর্দশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (Second World War)

ভূমিকা ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পুনরায় ইওরোপে বিশ্ব-সংগ্রামের উৎপত্তি হইল। ভার্সাই-এর সন্ধিতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। বিজেতার প্রতি অবিচারমূলক ব্যবহার এবং জাতীয়তাবাদী নীতির প্রয়োগের ত্রুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত করিল।

ভার্সাই সন্ধির পর বিশ্বে কিছুদিন শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু শান্তির অবকাশে শক্তি সঞ্চয় করিয়া অপরিতৃপ্ত রাষ্ট্রগুলি জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার এবং বিশ্ব-রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে পুনরায় সংগ্রামের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ হইতে শুরু করিয়া কতকগুলি আঞ্চলিক সংগ্রাম সংঘটিত হইতে থাকে। স্পেনের অন্তর্বিপ্লব, ইটালী কর্তৃক ইথিওপিয়া আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনা একের পর এক ঘটিতে থাকে। নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট-ইটালী প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে একের পর এক গ্রাস করিতে থাকে। অপরদিকে কমিউনিস্ট রাশিয়া স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানী ও জাপানের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সামরিক প্রস্তুতি আরম্ভ করিল। যথার্থভাবে বলিতে গেলে রাশিয়াও প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া বিশ্বরাষ্ট্রের মর্যাদা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং বিশ্বের নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন ও আঞ্চলিক যুদ্ধ-বিগ্রহাদির ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রস্তুত হইতেছিল।

আঞ্চলিক যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রস্তুত করিতেছিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদ ঃ ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানীর প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল জার্মানী তাহা বিস্মৃত হয় নাই। জার্মানীর উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। জার্মানীর স্কন্ধে এক বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; জার্মানীর সামরিক শক্তি হ্রাস করা হইয়াছিল; জার্মানীর শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলি কাড়িয়া উহার আর্থিক স্বচ্ছলতা বিনষ্ট করা হইয়াছিল। সুতরাং ভার্সাই সন্ধির অবিচার জার্মানীর নাৎসীবাদী আন্দোলন শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। উপরন্তু জার্মানীর ভিতর দিয়া পোলিশ করিডরের সৃষ্টি করিয়া জার্মানীকে দ্বিখণ্ডিত করা এবং জার্মানীর সার অঞ্চলের উপর ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্থাপন করা প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা জার্মানীর জাতীয় মর্যাদা যেভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল তাহাও জার্মানগণ কোনক্রমেই বরদাস্ত করিতে পারে নাই।

জার্মানীর প্রতিশোধাত্মক মনোভাবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ। উগ্র জাতীয়তা-বোধের প্রভাবেই জার্মানী অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের জার্মান ভাষাভাষী অধিবাসীগণকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। বস্তুতঃ জার্মানী কর্তৃক অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস (১৯৩৮ খৃঃ) এবং পোল্যাণ্ড আক্রমণ (১৯৩৯ খৃঃ) জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবোধের সাক্ষ্য বহন করে।

জার্মানী, ইটালী, রাশিয়া ও জাপানের পররাজ্য-গ্রাস লিপ্সা: যুদ্ধের অপর প্রধান কারণ হইল জার্মানী, ইটালী, রাশিয়া ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদ নীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী, ইটালী ও জাপান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। জার্মানীর উপনিবেশগুলি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছিল। অপরদিকে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের ব্যবস্থা অনুযায়ী ইটালী ও জাপানকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে উহারা সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইটালী ও জাপান ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। এই কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে জার্মানী, ইটালী ও জাপান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হইল। জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া তথায় এক তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করিল। ইটালী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়া দখল করিল। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীও সাম্রাজ্যবাদের পথে অগ্রসর হইল। সোভিয়েট রাশিয়া এবং ক্ষুদ্র বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিও দক্ষিণ ফিনল্যাণ্ড দখল করার এবং বল্কানের ভিতর দিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

সুতরাং বিশ্বের কয়েকটি অপরিতৃপ্ত রাষ্ট্রের উগ্র সাম্রাজ্যবাদ নীতির চরম পরিণতি হইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

একাধিক রাষ্ট্রজোটের উদ্ভব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে যেরূপ একাধিক রাষ্ট্রজোটের (Political Alliances) উদ্ভব হইয়া সমগ্র বিশ্বকে দুইটি সামরিক শিবিরে বিভক্ত করিয়াছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালেও সেইরূপ অবস্থার ব্যতিক্রম হয় নাই।

জার্মানী, ইটালী ও জাপানের মধ্যে 'রোম-বার্লিন-টোকিও মৈত্রী' (১৯৩৬)

বিশ্বের তিনটি অপরিতৃপ্ত রাষ্ট্র—জার্মানী, ইটালী ও জাপান—১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মাঞ্চুরিয়া দখল করার জন্য জার্মানী ইওরোপের সহানুভূতি হারাইয়াছিল। সুতরাং এইরূপ অবস্থার অবসানকল্পে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে এক মৈত্রী স্থাপিত হইল। কিন্তু হিটলার ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সোভিয়েট রাশিয়া তথা সাম্যবাদের গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সেই বৎসর জাপানের সহিত একটি চুক্তিতে (Anti-Comintern

Pact) আবদ্ধ হইলেন। পর বৎসর ইটালী এই চুক্তিবন্ধনে যোগদান করিলে 'রোম-বার্লিন-টোকিও মৈত্রী' স্থাপিত হইল।

রোম-বার্লিন-টোকিও চুক্তি সম্পন্ন হইলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স প্রমাদ গণিল। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন জার্মানীকে 'তুষ্ট করার নীতি' (Policy of Appeasement) পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক মৈত্রী স্থাপন করিলেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যে মুহূর্তে জার্মানীর বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিল প্রকৃতপক্ষে সেই মুহূর্তেই বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইল। এইভাবে বিশ্বে পুনরায় দুইটি পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রজোটের উদ্ভব হইল।

জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের আত্মরক্ষামূলক মৈত্রী স্থাপন

আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনে লীগ-অফ-নেশনস্-এর ব্যর্থতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সকল রাষ্ট্রই যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধের আপোষ-মীমাংসা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু কার্যতঃ তাহা পালন করিতে কেহই যত্নবান ছিল না। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল, জার্মানী কর্তৃক রাইন অঞ্চলে সামরিক প্রস্তুতি, ইটালী কর্তৃক ইথিওপিয়া এবং আবিসিনিয়া বলপূর্বক দখল প্রভৃতি ব্যাপারে লীগ-অফ-নেশনস্-এর নীরবতা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে লীগ-অফ-নেশনস্-এর অকর্মণ্যতা বিশ্বে আন্তর্জাতিক সংকটের সৃষ্টি করিয়াছিল।

জার্মানী, ইটালী ও জাপানের আক্রমণাত্মক কার্যাদির বিরুদ্ধে লীগ-অফ-নেশনস্-এর অকর্মণ্যতা

জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল। পূর্বেই ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিল। সুতরাং জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ঘোষণা করিলেন "আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল জার্মানীর আক্রমণ হইতে ইওরোপের জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষা করা।" যুদ্ধের প্রথমদিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ-আফ্রিকা অস্ত্রধারণ করিল। ইটালী ও রাশিয়া নিরপেক্ষ ছিল।

জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলী

পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক অঞ্চলে যুদ্ধ : জার্মানীর চারিটি বাহিনী বিভিন্ন দিক হইতে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। পোল্যাণ্ড অতি সহজেই জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইল। ইতিমধ্যে রাশিয়া পোল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চল আক্রমণ করিয়া দখল করিল। তিন সপ্তাহের মধ্যে পোল্যাণ্ডের বিনাশসাধন হইল এবং জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ড বণ্টিত হইল।

জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ডের বণ্টন

পোল্যাণ্ড ভাগ করার পর রাশিয়া বাল্টিক অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করিয়া রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত সুদৃঢ় করিতে অগ্রসর হইল। রাশিয়ার আক্রমণে ভীত হইয়া এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি রাশিয়ার সহিত পরস্পর আত্মরক্ষামূলক সন্ধিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইল। এই সকল রাষ্ট্রে রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হইল। ইহার পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া উহা দখল করিল। তিন মাস পর সন্ধির শর্তাদি ভঙ্গ করার অজুহাতে রাশিয়া উপরোক্ত বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি একের পর এক দখল করিল।

বাল্টিক অঞ্চলে রাশিয়ার অগ্রগতি

পোল্যাণ্ড অধিকার করার পর হিটলার ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের নিকট একটি শান্তির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মিত্রপক্ষ জার্মানীর শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জার্মানী ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করিল। ডেনমার্ক ও নরওয়ে অধিকৃত হইলে উত্তর-সাগরে জার্মানীর নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের সুবিধা হইল।

হিটলারের শান্তি-প্রস্তাব

জার্মানী কর্তৃক ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল (১৯৪০)

সেই বৎসর কোনরূপ যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই জার্মানী লাক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিল। কিন্তু জার্মানীর শক্তিশালী বিমানবহর ও পঞ্চম-বাহিনীর (Fifth Column) দক্ষতার ফলে জার্মানীর বিরুদ্ধে সকল প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থ হইল। নেদারল্যাণ্ডের রানী উইলহেলমিনা ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বেলজিয়ামরাজ লিওপোল্ড আত্মসমর্পণ করিলেন।

জার্মানী কর্তৃক লাক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড দখল (১৯৪০)

ইহার পর জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করিল। ফ্রান্সের অনিবার্য পতন উপলব্ধি করিয়া ইটালী জার্মানীর সহিত যোগদান করিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জার্মানবাহিনী প্যারিস নগরীতে বিনাবাধায় প্রবেশ করিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যে রেলওয়ে কামরায় জার্মানী মিত্রপক্ষের নিকট যুদ্ধ-বিরতি প্রার্থনা করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল সেই রেলওয়ে কামরায় ফরাসী সরকার জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া যুদ্ধ-বিরতি প্রার্থনা

ফ্রান্সের পতন (১৯৪০)

করিলেন। ফ্রান্সের সামরিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটিল। ফ্রান্সে জার্মানীর এক তাঁবেদার সরকার গঠিত হইল। কিন্তু ফ্রান্সের বাহিরে ফরাসীগণ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল।

জার্মানী কর্তৃক ব্রিটেন আক্রমণ ও জার্মানীর পরাজয় (১৯৪০)

পশ্চিম ইওরোপে আধিপত্য স্থাপন করিয়া জার্মানী ব্রিটেন বিধ্বস্ত করিতে অগ্রসর হইল। অবশেষে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'ব্রিটেনের যুদ্ধ' (Battle of Britain) সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধে ব্রিটেন জয়লাভ করিল এবং জার্মানীর বহু বিমানবহর বিনষ্ট হইল। জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে ব্রিটেন রক্ষা পাইল।

বল্কান অঞ্চলে জার্মানীর সাফল্য

গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া জার্মানীর পদানত (১৯৪১)

ইহার পর জার্মানী বল্কানে আধিপত্য স্থাপনে উদ্যোগী হইল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া জার্মানীর পদানত হইল। গ্রীস বীরবিক্রমে জার্মানীকে বাধাপ্রদান করিল। কিন্তু ব্রিটেনের সাহায্যলাভ করিয়াও গ্রীস জার্মানী কর্তৃক অধিকৃত হইল।

পূর্ব-ইওরোপে যুদ্ধ

চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল রাশিয়ার উপর জার্মানীর অতর্কিত আক্রমণ। স্মরণ রাখা দরকার যে পূর্বেই জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে একটি 'অনাক্রমণ-চুক্তি' (Non-Aggression Pact) সম্পাদিত হইয়াছিল। এই চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়াই জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করিল।* ইটালী, রুমানিয়া, শ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরী জার্মানীর সহিত যোগদান করিল। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল রাশিয়াকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও রাশিয়াকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল।

জার্মানীর পরাজয় ও রাশিয়া পরিত্যাগ (১৯৪১)

যুদ্ধের প্রথম পাঁচমাসের মধ্যে জার্মানী লেনিনগ্রাড অবরোধ করিল, ইউক্রেইন দখল করিল এবং মস্কোর নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তুলিল। প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রুশবাহিনী বীরবিক্রমে জার্মানীকে বাধাপ্রদান করিতে লাগিল। 'পোড়ামাটি-নীতি' ('Scorched-earth' Policy) অনুসরণ করিয়া রুশবাহিনী শত্রুর ব্যবহারে আসিতে পারে এমন সবকিছুই পোড়াইয়া দিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে

---

* রাশিয়া আক্রমণ করার ব্যাপারে জার্মানীর যুক্তি : জার্মানীর যুক্তি ছিল (১) জার্মানীর সীমান্তে রাশিয়ার জার্মান-বিরোধী প্রচারকার্য ; (২) রাশিয়ার ধ্বংস সাধন করিয়া সমগ্র বিশ্বে সাম্যবাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে বিধ্বস্ত করিয়া সমগ্র ইওরোপে একাধিপত্য স্থাপন করা ; ইউক্রেইনের খাদ্যশস্য ও বাকু-র পেট্রোলিয়াম হস্তগত করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া।

থাকে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল এবং প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ, খাদ্যাভাব ও সমগ্র রুশ-জনসাধারণের গেরিলা-আক্রমণের ফলে বিপর্যস্ত হইয়া জার্মানবাহিনী রুশ-সীমান্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

আফ্রিকা ও নিকট প্রাচ্যে যুদ্ধ

যে সময় জার্মানী ইওরোপে আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত সেই সময় ইটালী আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ চালাইতেছিল। ইটালী মিশর আক্রমণ করিয়া সুয়েজ খালের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং লাইবিয়া দখল করে। অবশেষে ইংরাজ ও মার্কিন বাহিনীর যুগ্ম প্রতিআক্রমণের ফলে ইটালী পরাজিত হইল এবং ইটালী পূর্ব-আফ্রিকার সাম্রাজ্য হারাইল (১৯৪১ খৃঃ)।

ইটালীর আক্রমণ ও পরাজয় (১৯৪১)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বযুদ্ধ

ইওরোপে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমেরিকা নিরপেক্ষতার নীতি (Policy of Neutrality) গ্রহণ করিয়াছিল। যুদ্ধে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করা বা যুদ্ধরত কোন রাষ্ট্রকে কোনরূপ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সাহায্য করা মার্কিন সরকার নিষিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু 'এক্সিস' শক্তিগুলি (জার্মানী ও উহার মিত্রবর্গ—এই নামে পরিচিত) উত্তরোত্তর জয়লাভ করিতে থাকিলে মার্কিন সরকার নিরপেক্ষতার নীতি কিছু পরিবর্তন করিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মার্কিন সরকার 'এক্সিস' রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষকে যুদ্ধোপকরণ যোগান দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিল. '(Lend-Lease Act'—অনুসারে)। ইহার পরেই জার্মানীর হস্তগত হইতে পারে এই আশঙ্কায় আমেরিকা গ্রীনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড ও ডাচ্ গিয়েনা দখল করিল। এক্সিস রাষ্ট্রগুলির সাবমেরিন, যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদি আক্রমন করার আদেশ জারী করা হইল। এইভাবে আমেরিকা এক্সিস রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিতে লাগিল।

প্রথমে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পরে পরোক্ষভাবে মিত্রপক্ষকে সাহায্যদান

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে উত্তর আতলান্তিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট-এর মধ্যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৈঠক বসিল। যুদ্ধ ও শান্তি-নীতি সম্পর্কে এই বৈঠকে আট দফা সম্বলিত একটি সনদ (Charter) সম্পাদিত হইল। ইহা আতলান্তিক চার্টার* (Atlantic Charter) নামে পরিচিত।

আতলান্তিক চার্টার (১৯৪১)

---

* আতলান্তিক চার্টার-এর শর্তাদি : শর্তাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল (১) কোন দেশ বা রাষ্ট্রকে আমেরিকা ও ব্রিটেন স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিবে না, (২) জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রের সীমানা পরিবর্তন করা চলিবে না, (৩) গভর্ণমেন্ট গঠন করার ব্যাপারে প্রত্যেক দেশের জনসাধারণকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, (৪) সকল দেশের শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা হইবে, (৫) আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলিতে নিরস্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হইবে ইত্যাদি।

দূর প্রাচ্য
(১৯৩৯–১৯৪০)
রাশিয়া
চীন
জাপান
কোরিয়া
টোকিও
ইওকোসুকু
সাংহাই
ওকিনাওয়া
ফরমোসা
হংকং
প্রশান্ত মহাসাগর
বোনিন দ্বীঃপুঃ
মারকাস
মিডওয়ে
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ
পার্ল হারবার
জনসটন
ওয়েক
মেরিয়ানস
সাইপন
জাপানের অনুশাসন
মার্শাল
কেরোলিন দ্বীঃপুঃ
পালাউ
পনেপ
কিংম্যান রিফ
পালমিরা
ক্যানটন
গিলবার্ট দ্বীঃপুঃ
সলোমন দ্বীঃপুঃ
সামোয়া দ্বীঃপুঃ
টুটুইলা
নিউ হেব্রাইডিজ
ফুজি দ্বীঃপুঃ
নিউ ক্যালেডোনিয়া
ভারত
কলিকাতা
বোম্বাই
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ত্রিঙ্কোমালী
কলম্বো
সিংহল
ভারত মহাসাগর
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ
ম্যানিলা
সুমাত্রা
নেদারল্যাণ্ডস
যাভা
অস্ট্রেলিয়া
ব্রিসবেন
বৃটিশের অধীন
জাপান ও জাপান-অধিকৃত অঞ্চল
নৌ-ঘাঁটি ও বিমান ঘাঁটি
আমেরিকা
বৃটিশ
জাপান

সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ

ইওরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জাপানের সাম্রাজ্যবাদ নীতি উগ্র আকার ধারণ করে। জাপান এক্সিসদলে যোগদান করিয়া জার্মানীর নেতৃত্ব স্বীকার করিল। ইহার পরিবর্তে এক্সিসদল সুদূর প্রাচ্যে (Far East) জাপানের একাধিপত্য স্বীকার করিয়া লইল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত আমেরিকার নৌঘাঁটি পার্লহারবার (Pearl Harbour) আক্রমণ করিয়া উহা দখল করিল। ইহার প্রতিবাদে আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ জাপানের কবলিত হইল। চীনের সমগ্র উপকূল অঞ্চলও জাপানের অধিকারে আসিল।

জাপানের এক্সিস্দলে যোগদান (১৯৪১)

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের সাফল্য

রাশিয়ার যুদ্ধ

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় জার্মানী চরম সাফল্য লাভ করিল। ইউক্রেইন, ককেশাস ও ক্রিমিয়া জার্মানীর অধিকারে আসিল। জার্মানী লেনিনগ্রাড অবরোধ করিল। রুশরা সর্বস্ব পণ করিয়া লেনিনগ্রাড রক্ষা করিতে লাগিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ লেনিনগ্রাডের যুদ্ধে রুশদের স্বদেশপ্রেমের চরম পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অবশেষে বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাশিয়া জয়লাভ করিল। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জার্মান সেনাপতি তিন লক্ষ জার্মান সেনাসহ আত্মসমর্পণ করিলেন।

লেনিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্মানদের পরাজয় (১৯৪৩)

ইটালীর পতন

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনী ইটালী আক্রমণ করিয়া সিসিলি দখল করিল। জার্মানীর সাহায্যলাভ করিয়াও ইটালীর পরজায় ঘটিল। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মিত্রপক্ষ কর্তৃক রোম অধিকৃত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসোলিনীর পতন ঘটিল।

ফ্রান্সের যুদ্ধ

ফ্রান্স পুনরুদ্ধার না করিতে পারিলে জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ সহজ হইবে না বিবেচনা করিয়া মিত্রপক্ষ বিভিন্ন দিক হইতে ফ্রান্স আক্রমণ করিল। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগস্ট জার্মানীর কবল হইতে ফ্রান্সকে মুক্ত করা হইল। জার্মানী নিজ সীমান্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

জার্মানীর যুদ্ধ

ইহার পর তিন দিক হইতে জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের অভিযান আরম্ভ হইল। রাশিয়া জার্মানীর সীমান্ত অতিক্রম করিল। অপরদিকে মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী

বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডকে মুক্ত করিয়া জার্মানীতে প্রবেশ করিল। জার্মানী বিপুল-বিক্রমে মিত্রপক্ষকে বাধাপ্রদান করিতে লাগিল। ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকার সেনাবাহিনী যুগ্মভাবে আক্রমণ চালাইয়া জার্মানীকে খণ্ড-বিখণ্ড করিল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রুশাবাহিনী বার্লিনে প্রবেশ করিলে জার্মানী মিত্রপক্ষের নিকট বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করিল।

জার্মানীর পতন (১৯৪৫)

জাপানের পতন

এক্সিস শক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র জাপানই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরের মিডওয়ে-র যুদ্ধে আমেরিকা জয়লাভ করিল এবং হাওয়াই (Hawaii) দ্বীপপুঞ্জ পুনরুদ্ধার করিল। ইহার পর ওকিনোয়া আমেরিকার হস্তগত হইলে জাপানের উপর প্রচণ্ড বিমানহানা ও গোলাবর্ষণ শুরু হইল। সর্বত্র জাপানের প্রতিরোধশক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে ৬ই আগস্ট (১৯৪৫ খৃঃ) এ্যাটমিক বোম্ দ্বারা নাগাসাকি ও হিরোসিমা ধ্বংস করা হইল। ইতিহাসে ইহাই হইল সর্বপ্রথম এ্যাটম বোমের ব্যবহার। ১৫ই আগস্ট জাপান বিনাশর্তে মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইল।

এ্যাটম্ বোমা ব্যবহার ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান (১৯৪৫)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান

(United Nations Organisation)

উৎপত্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, ধনসম্পত্তি ও প্রাণনাশের ব্যাপকতা বিশ্বের জনসাধারণের মনে এক দারুণ উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছিল। সুতরাং এইরূপ বিপর্যয় যাহাতে পুনরায় ঘটিতে না পারে সেইজন্য সানফ্রান্সিস্কোতে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহূত হইল। এই সম্মেলনে উইনস্টন চার্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক গৃহীত আতলান্তিক চার্টার বা সনদ (১৯৪১ খৃঃ) ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক আলোচিত হইল। ভবিষ্যৎ শান্তির ভিত্তি হিসাবে আলতান্তিক চার্টার-এর শর্তাদি (কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া) গৃহীত হইল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। এই প্রতিষ্ঠান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের চেষ্টায় এবং ব্রিটিশ ও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রিদ্বয়ের সহযোগিতায় গঠিত হইয়াছিল। প্রথমে ৫১টি রাষ্ট্র লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়।

আতলান্তিক চার্টার জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল (১) শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, (২) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা বিশ্বের অর্থনৈতিক,

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান করা এবং (৩) জাতি, ধর্ম ও ভাষা নির্বিশেষে বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করা।

প্রতিষ্ঠানের সংগঠন

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি কার্যকরী করার জন্য জাতিপুঞ্জ সনদ (Charter of the United Nations) অনুসারে ছয়টি বিভাগ লইয়া জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল—সাধারণ সভা (General Assembly), স্বস্তি পরিষদ (Security Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অছি পরিষদ (Trusteeship Council), সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ (Social and Economic Council) এবং দপ্তরখানা (Secretariate)।

সাধারণ সভা

যোগদানকারী সকল রাষ্ট্রই সাধারণ সভার সদস্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পাঁচজন প্রতিনিধি সাধারণ সভায় যোগদান করিতে পারেন কিন্তু কোন রাষ্ট্রের একটির বেশী ভোট দেওয়ার ক্ষমতা নাই। আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের আলোচনা করা এবং সেই সম্পর্কে সুপারিশ করার অধিকার সদস্যদের রহিয়াছে। তবে এই সভার কার্যকরী ক্ষমতা কিছু নাই।

স্বস্তি পরিষদ

সর্বাধিক ক্ষমতাশালী বিভাগ হইল স্বস্তি পরিষদ। ইহা এগার জন সদস্য লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীনের পাঁচজন প্রতিনিধি ইহার স্থায়ী সদস্য। এই পরিষদের প্রধান কার্য হইল শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদের সমাধান করা। কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহা ব্যর্থ হইলে বলপ্রয়োগ দ্বারা শান্তি স্থাপনের ক্ষমতা এই পরিষদের আছে। পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের মধ্যে কোন একজন সদস্য অসম্মতি প্রকাশ করিলে এই পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত বলবৎ করা যায় না।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়

সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত পনের জন বিচারক লইয়া এই বিচারালয় গঠিত। আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করাই এই বিচারালয়ের প্রধান কার্য। হল্যাণ্ডের হেগ শহরে ইহা অবস্থিত।

অছি পরিষদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই অছি শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিছু পরিবর্তিত আকারে অছি পরিষদ নূতনভাবে গঠিত হইল। অনগ্রসর ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে অনুপযুক্ত দেশগুলির শাসনভার অছি পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়। স্বস্তি পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্য, অছি শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি ও সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ

এই পরিষদের প্রধান কার্য হইল—সকলদেশের জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত করা, উহাদের জন্য কর্মসংস্থান করা এবং সাধারণভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা।

একজন প্রধান সচিবের অধীনে আটটি বিভাগ দ্বারা দপ্তরখানার কার্য পরিচালনা করা হয়। স্বস্তি পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক প্রধান সচিব (Secretary General) নির্বাচিত হন। দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের উদ্ভব হইলে তাহা স্বস্তি পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করাই প্রধান সচিবের প্রধান কর্তব্য।

দপ্তরখানা।

জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি

(Activities of the United Nations)

জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ যেমন মহান, উহার দায়িত্বও তেমন ব্যাপক ও কঠিন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান করা, মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করা ও বিশ্বের মানব সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ-সাধন করাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যকলাপ

বিগত ১৮ বৎসর ধরিয়া জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান উহার কর্তব্য কার্যাদি সম্পাদনের ব্যাপারে কি করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক চুক্তি অনুসারে ইরাণে সোভিয়েট বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানেও রাশিয়া উহা অপসারণ না করিলে ইরাণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ আনিল (১৯৪৬ খৃঃ)। নিরাপত্তা পরিষদে এই বিবাদের আলোচনা চলিতে থাকাকালীন রাশিয়া ইরাণ হইতে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিলে বিবাদের অবসান হয়।

(১) রুশ-ইরান বিবাদ

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সোভিয়েট রাশিয়া গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে গ্রীসে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অবস্থান ও গ্রীসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপ এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। গ্রীস রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করিল যে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি গ্রীক সরকারের বিরুদ্ধে গ্রীসের সন্ত্রাসবাদীগণকে সাহায্য করিতেছে। গ্রীক সরকার কর্তৃক ব্রিটিশ সৈন্য গ্রীসে আহূত হইয়াছে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিরাপত্তা পরিষদ এই বিবাদের আলোচনা বন্ধ করিল।

(২) গ্রীস-রুশ বিবাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সিরিয়া ও লেবাননে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য মোতায়েন থাকিলে সিরিয়া ও লেবানন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ করিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যবাহিনী অপসারিত হইলে বিবাদের অবসান হইল।

(৩) সিরিয়া ও লেবাননের অভিযোগ

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিল যে উহার সরকার তথায় সংখ্যালঘু ভারতীয়দের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেছেন। কিন্তু জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভা কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হইল।

(৪) দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের অভিযোগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া ছিল হল্যাণ্ডের একটি উপনিবেশ। যুদ্ধাবসানে জাপানের সৈন্যবাহিনী ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করিলে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদীগণ তথায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অস্বীকার করিলে উভয়পক্ষে প্রকাশ্য যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। এই বিবাদের সমাধানের জন্য জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ একটি কমিটি নিযুক্ত করিল। নিরাপত্তা পরিষদ হল্যাণ্ডকে যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ দিল। অবশেষে জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করা হইল।

(৫) ইন্দোনেশিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে জাপান কোরিয়া দখল করিয়াছিল। ১৯৪৩ ও ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে কায়রো ও পোটস্‌ডাম্‌ সম্মেলনে কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী কোরিয়ায় প্রবেশ করিয়া তাহা দখল করে। ফলে কোরিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে কোরিয়ার প্রশ্নটি উপস্থাপিত হইল। জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়া উহার তত্ত্বাবধানে সমগ্র কোরিয়ায় এক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের প্রস্তাব করিল। দক্ষিণ কোরিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল এবং তথায় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইল। ইতিমধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে উত্তর কোরিয়া 'গণতান্ত্রিক জনগণের প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কমিউনিস্ট চীনের সমর্থনপুষ্ট হইয়া উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করিলে কোরিয়ায় এক গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইল। নিরাপত্তা পরিষদের ৯ জন সদস্য উত্তর কোরিয়াকে অভিযুক্ত করিয়া উহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার নির্দেশ দিলেন। জাতিপুঞ্জের ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিল। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রচেষ্টায় ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ায় যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু আজ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান কোরিয়ার দুই অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই।

(৬) কোরিয়া সমস্যা

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত ইউনিয়ন অথবা পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কাশ্মীরের মহারাজা সরকারীভাবে ভারত ইউনিয়নের সহিত যোগদান করেন। কিন্তু ভারত বিভাগের অব্যবহিত পরেই কাশ্মীর দখল করিবার অভিপ্রায়ে

(৭) কাশ্মীর সমস্যা

পাকিস্তানে ষড়যন্ত্র শুরু হইল। পাকিস্তান সরকারের সমর্থনে সাহায্যপুষ্ট হইয়া উপজাতীয় হানাদারদের একাধিক দল কাশ্মীর ও জম্মু আক্রমণ করিল। ভারত সরকারের অনুরোধে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান কাশ্মীর সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিল। জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায় অবশেষে উভয় পক্ষ যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষর করিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান কাশ্মীর সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারে নাই।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কার্যকলাপ

বিশ্বে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তি বজায় রাখাই জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের একমাত্র দায়িত্ব নহে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করাও ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জাতিপুঞ্জের একাধিক সংস্থা রহিয়াছে। যথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.), বিশ্ব কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (F. A. O.), বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank), শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (I. L. O.) ইত্যাদি।

লীগ-অফ-নেশনস্ ও জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান

কার্যকরী ক্ষমতার দিক দিয়া জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান যে লীগ-অফ-নেশনস্ অপেক্ষা অধিক উন্নত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যভুক্ত না থাকায় লীগ প্রথম হইতেই দুর্বল ছিল। কিন্তু জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সদস্য থাকায় ইহার প্রবল শক্তি বিশ্বে শান্তি স্থাপনের সহায়ক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, লীগ-অফ-নেশনস্-এর নিজস্ব সৈন্যবাহিনী না থাকায় উহার কার্যকরী ক্ষমতা একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। অপরদিকে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী রহিয়াছে এবং কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রবর্গের আক্রমণাত্মক কার্যাদির বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতাও ইহার রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, পাঁচটি স্থায়ী সদস্যদের (আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও অ-কমিউনিস্ট চীন) ভিটো ক্ষমতা থাকা সত্বেও জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত বলবৎ করা যায়। কিন্তু লীগ-কাউন্সিলের সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রম ব্যতীত উহার কোন সিদ্ধান্ত বলবৎ করার উপায় ছিল না।

এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে বলা যায় যে আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান অধিক শক্তিশালী ও উন্নত।

বিশ্বশান্তি স্থাপনের জন্য আলোচনা

ইয়াল্টা ও পোটস্ডাম সম্মেলন (১৯৪৫)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন 'এক্সিস' (অর্থাৎ জার্মানী, ইটালী, জাপান ইত্যাদি) শক্তিগুলির সহিত শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থাদি কিরূপ হইবে সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে দুইটি সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল—একটি হইল ইয়াল্টা সম্মেলন (Yalta Conference) ও অপরটি হইল পৌটস্ডাম সম্মেলন

(Potsdam Conference)। ইয়াল্টা সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল জার্মানীর কবল হইতে মধ্য-ইওরোপের মুক্তি সাধন, এক আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপন এবং সুদূর-প্রাচ্যে রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাস সাধন করা। এই সম্মেলন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জোসেফ স্টালিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পোটস্‌ডাম সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল জার্মানী সম্পর্কে শাস্তিমূলক বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং জার্মানীর রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত নীতি গ্রহণ করা। এই সম্মেলন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্টালিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

উভয় সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়

শান্তি-চুক্তি সমূহ

ইটালীর সহিত সন্ধি অনুসারে—(১) ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইটালী যে সকল অঞ্চল দখল করিয়াছিল সেগুলি উহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল, (২) আলবানিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইল ; (৩) ট্রিয়েস্টকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হইল, (৪) ইটালীর পশ্চিম সীমান্তের কতকগুলি অঞ্চল ফ্রান্সকে এবং পূর্ব সীমান্তের কতকগুলি অঞ্চল যুগোশ্লাভিয়াকে দেওয়া হইল এবং (৫) ইটালীর আফ্রিকাস্থ সাম্রাজ্য উহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল।

ইটালীর সহিত সন্ধি

রুমানিয়ার সহিত সন্ধি অনুসারে রুমানিয়া রাশিয়াকে ব্যাসারাবিয়া এবং দক্রুজার দক্ষিণাংশ বুলগেরিয়াকে প্রদান করিল। হাঙ্গেরীর সহিত সন্ধি অনুসারে হাঙ্গেরী রুমানিয়াকে ট্রান্সিলভানিয়ার কিছু অংশ প্রদান করিল। ফিনল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি অনুসারে ফিনল্যাণ্ড ক্যারেলিয়ার কিছু অংশ রাশিয়াকে প্রদান করিল। বুলগেরিয়ার সহিত সন্ধি অনুসারে বুলগেরিয়াকে কিছু নূতন ভূখণ্ড প্রদান করা হইল। এই সকল সন্ধি দ্বারা প্রত্যেকটি পরাজিত রাষ্ট্রকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে এবং স্ব স্ব সৈন্য-বাহিনীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিতে বাধ্য করা হইল।

রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, ফিনল্যাণ্ড ও বুলগেরিয়ার সহিত সন্ধি

জাপানের সহিত এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি অনুসারে (১) জাপান ফরমোসা, কোরিয়া কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ-শাখালিন ও প্যাসকাডোর প্রভৃতি স্থানের উপর সকল অধিকার পরিত্যাগ করিল, (২) চীনে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা জাপানকে ছাড়িতে হইল ; (৩) জাপানের অছি শাসনভুক্ত অঞ্চলগুলি জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অছি শাসনাধীনে রাখা হইল। [কিছুদিন আমেরিকার শাসনাধীনে থাকিবার পর জাপান স্বীয় সার্বভৌমত্বের অধিকার ফিরিয়া পাইয়াছে।]

জাপানের সহিত সন্ধি

পরাজিত 'এক্সিস' শক্তিগুলির মধ্যে জার্মানীর ভাগ্যের সর্বাধিক বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। পোর্টস্ডাম ঘোষণা অনুসারে (১) জার্মানীকে আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে বিভক্ত করা হইল; (২) জার্মানীর সামরিক বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল; (৩) নাৎসীদল বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল ও নাৎসী কর্মচারীগণকে বরখাস্ত করা হইল; (৪) বিভিন্ন দেশের ক্ষতিসাধনের জন্য জার্মানীর উপর প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিপূরণ-বাবদ অর্থ ধার্য করা হইল এবং (৫) যুদ্ধের জন্য দায়ী জার্মান নেতাগণকে শাস্তি দেওয়া হইল।*

জার্মানী সম্পর্কে ব্যবস্থা

সংক্ষিপ্তসার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আঞ্চলিক যুদ্ধবিগ্রহাদি এবং জার্মানী, জাপান ও ইটালীর সাম্রাজ্য-বাদী নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রস্তুত করিতেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলে ছিল—(১) জার্মানীর প্রতি ভার্সাই সন্ধির কঠোরতা, জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবোধ, (২) জার্মানী, জাপান ও ইটালীর পররাজ্য-গ্রাস লিপ্সা, (৩) আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রজোটের উদ্ভব (যেমন জার্মানী, জাপান ও ইটালীর মধ্যে 'রোম-বার্লিন-টোকিও মৈত্রী' এবং এই মৈত্রীর বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আত্মরক্ষামূলক মৈত্রী), (৪) অন্তর্জাতিক শক্তি অব্যাহত রাখিতে লীগ-অফ-নেশনস্-এর ব্যর্থতা এবং (৫) জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ।

যুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলী : জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ডের বণ্টন; জার্মানী কর্তৃক ডেনমার্ক, নরওয়ে, লাক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স দখল; জার্মানী কর্তৃক ব্রিটেন আক্রমণ এবং গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া দখল; জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ; নিকট প্রাচ্যে ইটালীর পরাজয়; জাপান কর্তৃক পার্ল বন্দর আক্রমণ ও আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান; রাশিয়ার যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়; ইটালীর পতন; ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার এবং মিত্রপক্ষ কর্তৃক জার্মানী দখল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইহাই হইল প্রধান ঘটনাবলী। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের পতন হইলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান : আতলান্তিক-সনদ-এর শর্তাদি অবলম্বনে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে ৫১টি রাষ্ট্র লইয়া ইহা গঠিত হয়। শান্তিপূর্ণভাবে ও সহযোগিতার মধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। সাধারণ সভা, স্বস্তি-পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয়, অছি-পরিষদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দপ্তর এবং দপ্তরখানা—এই ছয়টি বিভাগ লইয়া এই সংস্থা গঠিত।

---

* পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা) স্ব স্ব শাসনাধীন জার্মান অঞ্চলগুলিকে সংযুক্ত করিয়া জার্মান রাষ্ট্রগঠনে সম্মত হইলে তথায় জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত এক সংবিধান সভা গঠিত হয়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে পশ্চিম জার্মানীতে 'জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক নামে এক নূতন জার্মান রাষ্ট্র গঠিত হয়। বন (Bonn) নগরী হইল ইহার রাজধানী। অনুরূপভাবে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে 'জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক' নামে আর এক জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বার্লিন ইহার রাজধানী। জার্মানীর প্রশ্ন লইয়া পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ ও রাশিয়ার মধ্যে মতানৈক্যের ফলে আজও জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই।

পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানীতে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি (১৯৪৯)

সাধারণ সভার প্রধান কর্তব্য হইল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের সুপারিশ করা। স্বস্তি-পরিষদের প্রধান কর্তব্য হইল শান্তিপূর্ণভাবে বা প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্তর্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তি করা। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের প্রধান কর্তব্য হইল আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করা। অছি পরিষদের প্রধান কর্তব্য হইল সকল দেশের জনসাধারণের সমাজিক ও অর্থ নৈতিক মান উন্নয়ন করা। দপ্তরখানার প্রধান কর্তব্য হইল স্বস্তি পরিষদের নিকট আন্তর্জাতিক বিবাদগুলি উপস্থাপিত করা।

প্রশ্নমালা

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
[Describe the causes of the Second World War] উঃ ২৫০-২৫১ পৃঃ দেখ

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তিচুক্তির শর্তাদি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
[Describe shortly the Peace Treaties after the Second World War]
উঃ ২৬২-২৬৪ পৃঃ দেখ

৩। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
[Write what you know of the United Nations Organisation]
উঃ ২৫৮-২৬২ পৃঃ দেখ

৪। লীগ-অফ-নেশনস্‌-এর সহিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের তুলনা কর।
Compare the League-of-Nations with the United Nations Organisation]
উঃ ২৬২ পৃঃ দেখ

পঞ্চদশ অধ্যায়

মধ্য-প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি

(Progress of Nationalism in the Middle East and South-East Asia—1919-1949)

ভূমিকা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্য-প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার। ইওরোপীয় শক্তিগুলির শাসন ও প্রভাব হইতে মুক্তিলাভের ও আধুনিকভাবে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবন গড়িয়া তোলাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল।

তুরস্কে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত

তুরস্ক (১৯১৯-'৫০): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের সর্বত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী ও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল। তুরস্কেই সর্বপ্রথম এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বিশ্বযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ তুরস্কের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। মিত্রপক্ষ বলপূর্বক তুরস্কের সুলতানকে সেভ্রে-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু তুরস্কের জাতীয়তাবাদীগণ এই অপমানজনক

সন্ধি স্বীকার করিয়া লয় নাই। জেনারেল মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে এবং তুরস্কের এক নব যুগের সূচনা করে।

মুস্তাফা কামাল: ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মুস্তাফা কামাল সালোনিকায় জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন এবং কামাল নামে পরিচিত হন। তিনি তুর্কী সুলতানের স্বৈরতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং প্রথমে 'তরুণ-তুর্কী' (Young Turks) দলে যোগদান করেন। পরে তিনি 'বতন' (বা পিতৃভূমি) নামে একটি গোপন সমিতি গঠন করেন। কামালের উদ্দেশ্য ছিল অযোগ্য তুর্কী শাসনের অবসান ঘটাইয়া দেশকে নূতনভাবে গড়িয়া তোলা। ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে ইটালী ও বল্কান রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে তুরস্কের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। সেভ্রে-এর সন্ধির প্রতিবাদস্বরূপ কামাল সুলতান চতুর্থ মহম্মদকে মিত্রশক্তির (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও আমেরিকা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু ভীরু মহম্মদ ইহাতে অসম্মত হইলে কামাল তুর্কী সৈন্যবাহিনী হইতে পদত্যাগ করেন।

কামালের প্রথম জীবন ও রাজনৈতিক আদর্শ

অতঃপর কামাল এক জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তুর্কী পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচনে কামালের জাতীয়তাবাদী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পার্লামেন্টে এই দলের দাবি ছিল—(১) সেভ্রে-এর সন্ধির পুনর্বিবেচনা এবং (২) তুরস্ক হইতে বিদেশী সৈন্য-বাহিনীর অপসারণ। মিত্রশক্তির চাপে তুরস্কের সুলতান পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহার প্রত্যুত্তরে জাতীয়তাবাদীগণ আন্কারায় এক জাতীয় পরিষদ আহ্বান করে এবং এক সাময়িক সরকার গঠন করে। কামাল এই সরকারের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি নির্বাচিত হইয়াই কামাল ইটালীর সৈন্যবাহিনীকে দক্ষিণ আনাটলিয়া ও ফরাসী বাহিনীকে সিলিসিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

কামালের জাতীয়তাবাদী দল

সেভ্রে-এর সন্ধি দ্বারা গ্রীস যথেষ্ট লাভবান হইয়াছিল। কিন্তু তুরস্কের জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন গ্রীসের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করে। সুতরাং এই আন্দোলন সমূলে বিনষ্ট করার অভিপ্রায়ে গ্রীকগণ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক আক্রমণ করে। কিন্তু কামালের জাতীয় বাহিনীর নিকট গ্রীকগণ পরাজিত হয় এবং এশিয়া মাইনর হইতে গ্রীকগণ বিতাড়িত হয়।

গ্রীকদের সহিত যুদ্ধ

গ্রীকদের বিরুদ্ধে সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের জাতীয় পরিষদ রাজতন্ত্রের অবসান করিয়া প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। কামাল এই প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মিত্রশক্তি কর্তৃক সেভ্রে-এর সন্ধি পুনর্বিবেচিত হয় এবং বহুলাংশে তুরস্কের দাবি স্বীকৃত হইলে লুসান-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

তুরস্কে প্রজাতন্ত্র স্থাপন (১৯২৩)

মুস্তাফা কামাল কর্তৃক সংস্কার প্রবর্তন
(Reforms of Kemal)

কামাল বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া তুরস্ককে নূতন করিয়া ও আধুনিকভাবে গড়িয়া তুলিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইল। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে এককক্ষযুক্ত একটি পার্লামেণ্ট গঠিত হইল। রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা (Executive Power) একজন প্রেসিডেণ্ট ও পার্লামেণ্ট মনোনীত একটি মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত করা হইল।

ধর্ম-সংস্কার

ধর্ম-ব্যাপারে সংস্কার প্রবর্তিত হইল। তুর্কী-খিলাফতের অবসান ঘোষিত হইল। ইসলাম তুরস্কবাসীদের প্রথম ধর্ম রহিল কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সকল ধর্মের সম-অধিকার স্বীকৃত হইল।

সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কার

সামাজিক জীবনে বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তিত হইল। বহু-বিবাহ প্রথা বিলুপ্ত হইল। পাশ্চাত্য পোষাকের ব্যবহার প্রচলিত হইল এবং ফেজ্ টুপির ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল। শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারেও কামাল অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল এবং সতেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইল। সকল নাগরিককে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল।

অর্থ নৈতিক সংস্কার

পাশ্চাত্যের অনুকরণে কামাল তুরস্কের অর্থ নৈতিক জীবন উন্নততর করিতে যত্নবান ছিলেন। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে কয়েকটি বিশেষ বিভাগের প্রতিষ্ঠা করা হইল। শুল্ক-প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়া তুরস্কের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইল। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হইল।

পররাষ্ট্রনীতি : ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক গ্রীসের সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক প্রতিবেশী বল্কান রাষ্ট্রগুলির সহিত (যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, রুমানিয়া) বল্কান-চুক্তি সম্পাদন করিল। অতঃপর মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে কামাল ইরাক, ইরান ও আফগানিস্থানের সহিত আত্মরক্ষামূলক এক সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তিনি প্রথমে রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে রাশিয়ার সাম্যবাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে কামাল লীগ-অফ নেশনস্-এ যোগদান করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রপক্ষে (ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি) যোগদান করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। যুদ্ধের সময় 'Lend-Lease'—নীতি অনুসারে তুরস্ক আমেরিকার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ-সাহায্য লাভ করিল। ইহার ফলে তুরস্ক এক দারুণ অর্থ নৈতিক সংকট হইতে রক্ষা পাইল

এবং তুরস্ক পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ তথা আমেরিকার প্রতি উত্তরোত্তর অনুগত হইয়া উঠিল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত তুরস্কের সহযোগিতার প্রধান কারণই ছিল তুরস্কের রুশ ভীতি। তুরস্কে রুশ আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা তুরস্ককে সামরিক সাহায্যদানের নীতি গ্রহণ করিল এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তুরস্কে আমেরিকার যুদ্ধোপকরণ আসিতে শুরু হইল।

তুরস্কের সাফল্য

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংস্কার: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের আভ্যন্তরীণ-ক্ষেত্রেও পরিবর্তন চলিতেছিল। দুই-দলীয় শাসনব্যবস্থা কয়েকবার প্রচলন করিবার পর তাহা পরিত্যক্ত হইল। তথায় কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং দুইবার সমাজতন্ত্রী দল গঠনের প্রচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করা হইল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সরকারের বিরোধীতা সত্ত্বেও তথায় একটি গণতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠা হইল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে গণতান্ত্রিক দল জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল।

আরব জাতীয়তাবাদ (Arab Nationalism)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্য-প্রাচ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অপর কেন্দ্র হইল আরব অঞ্চল। আরব জাতির বাসভূমি আরাবিয়া, ইরাক, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন বহুদিন পর্যন্ত তুরস্কের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু আরবগণ সর্বদাই তুর্কী শাসনের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিল। তুর্কী সুলতান কর্তৃক 'খালিফা' উপাধি গ্রহণ আরবগণ কখনই স্বীকার করিয়া লয় নাই এবং উহারা মক্কার প্রধান 'সরিফ' হুসেনকেই এই পদের একমাত্র অধিকারী বলিয়া মনে করিত।

আরবগণের তুর্কী-বিরোধী মনোভাব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সুয়েজ খাল হইতে তুর্কীগণ ইংরাজবাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হইলে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। আরবগণ তুর্কী শাসনের অবসান করিয়া স্বাধীনতা অর্জনে যত্নবান হয়। ভূমধ্যসাগর হইতে পারস্য হ্রদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র গঠনকল্পে হুসেন এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নিকট-প্রাচ্যে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে ইংল্যাণ্ড তুর্কীর বিরুদ্ধে আরবগণকে উত্তেজিত করিতে থাকে। ইংরাজ-সরকার অর্থ ও যুদ্ধাস্ত্র দিয়া হুসেনকে সাহায্য করিতে সম্মত হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে হুসেন হাজ্জাজে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন এবং আরব জাতির স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। ইহার ফলে সমগ্র মধ্য-প্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করিল। হুসেনের পুত্র ফাইজাল ও ইংরাজ সেনাপতি লরেন্সের অধিনায়কত্বে আরববাহিনী সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস দখল করিল (১৯১৮ খৃঃ)। আরব জাতীয়তাবাদের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি হইল। কিন্তু

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত

আরবগণ কর্তৃক ইংল্যাণ্ডের সমর্থনলাভ

আরবদের প্রথম সাফল্য

ভার্সাই সন্ধি দ্বারা আরব জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইল।* ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আরব প্রদেশগুলির বণ্টন স্বাধীনতাকামী আরবগণকে মর্মাহত করিল।

প্যালেস্টাইন, ইরাক ও ট্রান্সজোরডানের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ব্রিটেন আরবগণকে সন্তুষ্ট করিতে যত্নবান হইল। এই উদ্দেশ্যে হাজ্জাজের শাসনকর্তা হুসেনের পুত্রদ্বয় ফাইজাল ও আবদুল্লাহ্‌কে যথাক্রমে ইরাক ও ট্রান্সজোরডানের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুগ্মভাবে ইরাকের স্বাধীনতায় প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। কিন্তু তাহা পালন করার পরিবর্তে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইরাকে ব্রিটেনের অছি শাসন স্থাপিত হইল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইরাকী জাতীয়তাবাদীগণ পার্লামেণ্টারী শাসনে সন্তুষ্ট না থাকিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করিল। ফলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত ইঙ্গ-ইরাকী সন্ধি অনুসারে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল এবং ইরাক লীগ-অফ-নেশনস্-এর সদস্যপদ লাভ করিল।

ব্রিটেন কর্তৃক ইরাকের স্বাধীনতার স্বীকৃতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটেন ও ইরাকের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইলে ইটালী ও জার্মানীর প্ররোচনায় ইরাকী জাতীয়তাবাদীগণ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরাক জার্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিল এবং ব্রিটেনের সমর্থনে তথায় একটি নূতন সরকার গঠিত হইল। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ইরাক জার্মানী ও ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ইরাক আরব-লীগ চুক্তি স্বাক্ষর করিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইরাকী সরকার ইরাকে ব্রিটেনের প্রতিপত্তির অবসান ঘটাইতে উদ্যোগী হইলে ব্রিটেনের সহিত পুনরায় বিবাদের সূত্রপাত হইল। কিন্তু কমিউনিস্ট প্রভাবের প্রসারের আশঙ্কায় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ইরাক পুনরায় ব্রিটেনের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইল।

হাজ্জাজের রাজা হুসেন ছিলেন আরব জাতীয়তাবাদের জনক। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিল। ব্রিটেনের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এবং 'খালিফা' উপাধি গ্রহণ করায় আরবগণ তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিল। এই সুযোগে 'ওহাবি' (Wahabi) দলের নেতা ইবন্ সাউদ একদল সৈন্য লইয়া হুসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হুসেন পরাজিত হইয়া জেরুজালেমে পলায়ন করেন।

হাজ্জাজ

---

* আরব অঞ্চল সম্পর্কে ভার্সাই-এর বন্দোবস্ত: ভার্সাই সন্ধি অনুসারে আরব অঞ্চলকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং পৃথক শাসনাধীনে রাখিবার ব্যবস্থা হয়। আরব অঞ্চলগুলির শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'ম্যাণ্ডেটরী' বা অছি প্রথার ব্যবস্থা হয়। এই নীতি অনুসারে (১) ফ্রান্সের হস্তে সিরিয়ার শাসনভার অর্পিত হয়, (২) ইংল্যাণ্ডের হস্তে ইরাক, প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজোরডানের শাসনভার অর্পিত হয়, (৩) লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত হাজ্জাজ হুসেনের অধীনে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত হয় এবং (৪) অবশিষ্ট আরব দেশগুলিকে তুরস্কের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

সাউদি আরাবিয়া রাজ্যটি উত্তরে জোরডান ও ইরাক, পূর্বে পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর ও দক্ষিণে মরুভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইবন্ সাউদ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন সাউদি আরাবিয়া ও হার্জাজের উপর ইবন্ সাউদের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে সাউদি আরাবিয়া মিত্রপক্ষের অনুকূলে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করে। যুদ্ধের সময় আমেরিকা সাউদি আরাবিয়াকে প্রচুর অর্থসাহায্য দান করে। যুদ্ধের পর সাউদি আরাবিয়া আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

সাউদি আরাবিয়া

অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় সিরিয়ায় আরব জাতীয়তাবাদ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ভার্সাই-এর বন্দোবস্ত অনুসারে সিরিয়ার শাসনভার ফ্রান্সের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল। সুতরাং ফ্রান্স সিরিয়াকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া সিরিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিনষ্ট করিতে উদ্যোগী হয়। স্বদেশ খণ্ডিত হওয়ায় সিরিয়ার আরবগণ বিদ্রোহী হইল। ফরাসী সরকার দমন নীতি দ্বারা গোলাবর্ষণ করিয়া সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস বিধ্বস্ত করিলেন (১৯২৫ খৃঃ)। অবশেষে ফরাসী সরকার ও আরব নেতাদের মধ্যে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল (১৯৩৬ খৃঃ)। ইহার শর্তানুসারে তিন বৎসরের মধ্যে সিরিয়াকে স্বাধীনতা প্রদানে ফ্রান্স সম্মত হইল। সেই বৎসর ফ্রান্স ও লেবাননের মধ্যেও অনুরূপ একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু ফ্রান্স এই সন্ধির শর্তাদি পালন না করায় দামাস্কাসে পুনরায় বিদ্রোহ সংঘটিত হইল (১৯৩৯ খৃঃ)। ইহার ফলে সিরিয়ার পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং উহার শাসনভার পাঁচজন ডাইরেক্টরের হস্তে ন্যস্ত হইল। শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব ফ্রান্স স্বহস্তে গ্রহণ করিল।

সিরিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে সিরিয়া ফ্রান্সের সহিত সহযোগিতা করিল। কিন্তু ফ্রান্সের পতন হইলে সিরিয়া ও লেবানন জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। ইহাতে আশঙ্কিত হইয়া ব্রিটেন ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া আক্রমণ করিয়া সিরিয়া ও লেবানন দখল করিল। যুদ্ধের শেষের দিকে ফ্রান্স জার্মানীর কবল্ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সিরিয়া ও লেবাননে সাম্রাজ্যবাদী শাসন স্থাপনে উদ্যোগী হইল। ফলে পুনরায় সিরিয়ায় গোলযোগের উদ্ভব হইল। ব্রিটেন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ব্রিটেন সিরিয়া ও লেবানন হইতে উহাদের সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিল এবং সেই বৎসরের মধ্যভাগে সিরিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল।

ভারত ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এশিয়ার অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া দায়িত্বশীল সরকার গঠনের

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসার

কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড-এর ঘোষণায় যুগ্ম-সরকারের কথা ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাহা গ্রহণে অসম্মত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইন

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর ব্রিটেন ভারতে গণ-আন্দোলন ও ভারতবাসীর বিক্ষোভ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত আইন (India Act of 1919) পাশ করিল। এই নূতন শাসনতন্ত্র বলবৎ থাকাকালীন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience Movement) শুরু হইল।

আইন অমান্য আন্দোলন (১৯২০)

ব্রিটিশ সরকারের কঠোর দমন-নীতি সত্ত্বেও আন্দোলন চলিতে লাগিল। ভারতে রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানকল্পে ব্রিটেনে ভারতীয় ও ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধিগণ এক গোল-টেবিল বৈঠকে মিলিত হইলেন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড ভারতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব করিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাবে অসম্মত হইল এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন (Non-Co-operation Movement) শুরু হইল। এই

ভারত আইন (১৯৩৫)

অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত আইন (Government of India Act 1935) বিধিবদ্ধ করিলেন। এই আইন অনুসারে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা চালু করা হইল এবং প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নূতন সংবিধানের অন্তর্গত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধিটি কার্যকরী করা হইল।

ভারত ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল। ব্রিটেন যুদ্ধশেষে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন আশ্বাস না দেওয়ায় সকল প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমদিকে জার্মানীর উত্তরোত্তর সাফল্য ও ফ্রান্সের পতন ভারতে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় জনগণ স্বাধীনতার জন্য অধৈর্য হইয়া উঠিল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দেখা দিল মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান' দাবি। মুসলিম নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই জাতি (Two-nation Theory) মতবাদ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের পথে প্রবল বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিল। অবশ্য মুসলমানদের এক অংশ জিন্নার দুই-জাতি মতবাদের তীব্র নিন্দা করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি নিষ্ঠাবান রহিলেন। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কংগ্রেস 'ভারত-ছাড়' (Quit India) প্রস্তাব গ্রহণ করিল। সমগ্র ভারতে আগষ্ট আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। ভারতের অভ্যন্তরে

সুভাষচন্দ্র ও আই-এন-এ

আগষ্ট আন্দোলন যখন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল সেই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'আজাদ-হিন্দ বাহিনী' (I. N. A.) ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 'দিল্লী চলো' অভিযান' শুরু করিল। আজাদ-হিন্দ

বাহিনীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' পাশ করিল। সেই বৎসরের ১৫ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র-রূপে ঘোষিত হইল।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (১৯৪৭)

ব্রহ্মদেশ ঃ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রচিত ব্রহ্ম সরকার আইন দ্বারা ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কিছু পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই আইন অধিকাংশ বর্মীগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ফলে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জাপান ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিলে জাপানের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া স্বাধীনতালাভের আশায় বর্মীগণ জাপানকে নানাভাবে সাহায্য করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাপানের দ্বারা প্রতারিত হইয়া বর্মীগণ মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিল এবং যুদ্ধশেষে উগ্রপন্থী বর্মী জাতীয়তাবাদীগণ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করিল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ভার বর্মীগণের হস্তে অর্পণ করিবার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে সংবিধান সভার নির্বাচন সম্পন্ন হইল এবং এই সভা ব্রহ্মদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রিটেন ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিল। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল।

ইন্দোনেশিয়া ঃ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, ক্লিভেস ও নিউ-গিয়ানার অধিকাংশ লইয়া ইন্দোনেশিয়া গঠিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিস্তার লাভ করিতেছিল এবং ভারতের কংগ্রেসী আন্দোলন দ্বারা তাহা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী আদর্শ ইন্দোনেশিয় শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ওলন্দাজ সরকার ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতাগণকে কারারুদ্ধ করিয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাময়িকভাবে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জাপান ইন্দোনেশিয়া দখল করিয়া জাতীয়তাবাদী নেতাগণকে মুক্ত করে। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্মসমর্পনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় নেতা সুকর্ণ ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ওলন্দাজ সরকার এই নূতন প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে উভয় পক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। ব্রিটেনের চাপে দুইপক্ষ এক বৈঠকে মিলিত হইয়া যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিল। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে ওলন্দাজ সরকার ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের নিকট পাঁচটি দাবি উপস্থাপন করিয়া এক চরমপত্র প্রেরণ করিলে উভয় পক্ষে পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হইল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের

অনুরোধে জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি আলোচনা করিল এবং বিবাদমান দুইপক্ষকে যুদ্ধবিরতির পরামর্শ দিল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করিল, ওলন্দাজ সরকারের দমন নীতির নিন্দা করিল এবং ইন্দোনেশিয়া হইতে ওলন্দাজ বাহিনী অপসারণের দাবি করিল। আন্তর্জাতিক জনমত ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির চাপে ওলন্দাজ সরকার ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতে সম্মত হইলেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে উভয় পক্ষ এক বৈঠকে মিলিত হইল এবং সেই বৎসরের নভেম্বর মাসে উভয় পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইল।

ইন্দোচীন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে লাওস, কাম্বোডিয়া, টংকিন, আনাম ও কোচিন-চীন লইয়া ফ্রান্সের অধিকৃত ইন্দো-চীন গঠিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই ইন্দোচীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহা শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ইন্দোচীন দখল করে এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ইন্দোচীন পরিত্যাগ করার পূর্বে জাপান আনাম, টংকিন ও কোচিন-চীনকে সংযুক্ত করিয়া আনামের পূর্বতন সম্রাট বাও-ডাই-এর অধীনে ভিয়েটনাম নামে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া যায়।

ইতিমধ্যে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আনামের কমিউনিস্টগণ হো-চি-মিন-এর নেতৃত্বে ভিয়েটনামের স্বাধীনতার জন্য ভিয়েটমিন্ নামে একটি লীগ গঠন করে। জাপানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েটমিন্ লীগ বা দল ভিয়েটনামকে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করে এবং বাও-ডাইকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ইন্দোচীন ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ। সুতরাং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স নিজ পরিচালনাধীনে ইন্দোচীনকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদানের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু এই প্রস্তাব ভিয়েটমিন্দের মনঃপূত না হওয়ায় ফ্রান্সের সহিত ভিয়েটমিন্দের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। ভিয়েটমিনগণকে দমন করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স বাও-ডাই-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল। ইহার দ্বারা স্থির হইল যে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভিয়েটনাম স্বাধীনতা ভোগ করিবে কিন্তু ভিয়েটনামকে ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। কাম্বোডিয়া ও লাওস ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে স্বীকৃত হইল এবং ইহার বিনিময়ে এই দুইটি দেশকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইল (১৯৪৯ খৃঃ)। কিন্তু ইন্দোচীনের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদীগণ হো-চি-মিন্-এর নেতৃত্বে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে লাগিল।

চীন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। চীন আশা করিয়াছিল যে যুদ্ধে যোগদানের পুরস্কার স্বরূপ চীনে বিদেশীদের প্রভাব প্রতিপত্তির অবসান ঘটিবে এবং মিত্রপক্ষের নিকট হইতে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ করিবে। মিত্রপক্ষে যোগদান করার পুরস্কার স্বরূপ প্যারিসের শান্তি

সম্মেলনে চীন প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার পাইয়াছিল। এই সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধিগণ সাণ্টুং প্রদেশের প্রত্যর্পনের দাবি করেন। সাণ্টুং প্রদেশটি জার্মানীর অধিকারে ছিল। জার্মানীর পরাজয়ের পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জাপানকে সাণ্টুং দখলের অনুমতি দিয়াছিল। কিন্তু শান্তি সম্মেলনে মিত্রপক্ষ চীনের দাবি অগ্রাহ্য করেন। প্যারিসের সম্মেলনে চীনের আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থ হয় নাই বটে কিন্তু উহার আন্তর্জাতিক মর্যাদা স্বীকৃত হয়। ইহার পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আহূত ওয়াশিংটন বৈঠকে (১৯২১ খৃঃ) চীন প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার লাভ করিল। আমেরিকার চাপে ও চৈনিক প্রতিনিধিদের বারংবার অনুরোধে চীনের দাবি শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হইল এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার শর্তানুসারে প্রচুর ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে জাপান সাণ্টুং পরিত্যাগ করিল এবং চীনকে তাহা পত্যর্পণ করা হইল। এতদ্ভিন্ন চীনের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা স্বীকৃত হইল।

প্যারিস শান্তি সম্মেলন ও ওয়াশিংটন বৈঠকে চীনের যোগদান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ও ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনের ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু হইল জাতীয়তাবাদীগণ কর্তৃক চীনের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধন করা। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কুয়ো-মিং-তাং নামে চীনের জাতীয়তাবাদীগণ ডাঃ সান-ইয়াত-সেনের নেতৃত্বে চীনে মাঞ্চু রাজবংশের অবসান ঘটাইয়া সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ও চীনের রাষ্ট্রীয় সংহতির জন্য সান-ইয়াত-সেন ইউয়ান-শি-কাই নামে এক সুদক্ষ সেনাপতির অনুকূলে সাধারণতন্ত্রের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউয়ানের জাতীয়-স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ চীনের জাতীয়তা-বাদীগণের মনে এক দারুণ হতাশার সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইউয়ানের মৃত্যু হইলে চীনে ঘোরতর বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইল। চীনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা সামরিক শাসনকর্তাদের (Tuchans) হস্তগত হইল। জনসাধারণের দুর্গতি চরমে উঠিল। দেশের এই দুরবস্থার সময় কুয়ো-মিং-তাং দলের পুনরার্বিভাব হইল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কুয়ো-মিং-তাং দল ডাঃ সান-ইয়াত-সেনকে পুনরায় সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত করিল। সেই সময় চীনের রাষ্ট্রীয় সংহতির পথে প্রবল অন্তরায় ছিল সমর নেতাগণ। সুতরাং স্বদেশের ঐক্যের জন্য সান-ইয়াত-সেন সমর নেতাগণকে দমন করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যে কুয়ো-মিং-তাং দলকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে রাশিয়া চীনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করিতে থাকে। সান-ইয়াৎ-সেন ও তাঁহার কুয়ো-মিং-তাং দলের উপর পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। কিন্তু রাশিয়া যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিল যে চীনের জাতীয় আন্দোলনের চাপে চীনের সমর নায়কগণের

চীনের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস

চীনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা

চীনের ব্যাপারে রাশিয়ার আগ্রহ

ধ্বংস সুনিশ্চিত। এই কারণে রাশিয়া প্রথম হইতেই চীনে পশ্চমী ধনতন্ত্রবাদের ও সমর নায়কগণের প্রতিপত্তি অবসানকল্পে জাতীয়তাবাদীগণকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। রাশিয়ার সাহায্যে সান-ইয়াত-সেন চীনে এক নূতন সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। রাশিয়া ও চীনের মধ্যে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। তাঁহার 'তিন-দফা-কর্মসূচী' চীনের আদর্শ হইয়া উঠিল।

চিয়াং-কাই-শেক ও চীনের ঐক্যবন্ধন

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু হইলে চিয়াং-কাই-শেক কুয়ো-মিং-তাং দলের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। দেশের ঐক্যবন্ধনের জন্য চিয়াং-কাই-শেক সমর নেতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমর নেতাদের দমন করিয়া চিয়াং চীনের ঐক্যবন্ধন সম্পূর্ণ করিলেন। সমগ্র চীনে জাতীয় সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে চিয়াং-কাই-শেককে চীনাকমিউনিস্টদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইল।

চীনের অন্তর্বিপ্লব

সান-ইয়াৎ-সেনের সময় কুয়ো-মিং-তাং দলের ভিতর একটি বামপন্থী কমিউনিস্ট দলের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় দুই দলের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধের উদ্ভব হয় নাই। চীনের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের লইয়া প্রথমে কমিউনিস্ট দল গঠিত হয়। পরে কৃষক ও শ্রমিকগণ ইহাতে যোগদান করে। এই দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে চেন-তু-শিং, মাও-সে-তুং ও চু-তে-র নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

প্রথমদিকে কমিউনিস্ট দল কুয়ো-মিং-তাং সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। কিন্তু ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে চিয়াং-কাই-শেক রাশিয়ার সহিত মিত্রতা বর্জন করিলে চীনা কমিউনিস্টগণ চীন-সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। চিয়াং-কাই-শেক চীনের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উত্তর-চীন অভিযানে অগ্রসর হইয়া ইয়াং-সি উপত্যকার শহরগুলি দখল করিলে কমিউনিস্টদের সহিত চীন সরকারের প্রকাশ্য সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। চীনা কমিউনিস্টগণ রাশিয়ার সাহায্যে কুয়ো-মিং-তাং সরকারকে উৎখাত করিতেও বদ্ধপরিকর হইল। কমিউনিস্টগণ নানকিং-এ একটি পৃথক সরকার গঠন করিয়া বিদেশীদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করিল। ইহাতে ভীত হইয়া চিয়াং-কাই-শেক কুয়ো-মিং-তাং দল হইতে কমিউনিস্ট সদস্যগণকে বহিষ্কৃত করিলেন। ইহার পর শুরু হইল চিয়াং সরকার ও কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ। অনতিকালমধ্যে কমিউনিস্টগণ উত্তর-পশ্চিম চীনে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিল। এই অঞ্চলে কমিউনিস্টগণ সান-ইয়াত-সেনের 'তিনদফা কর্মসূচী' অনুসারে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে যত্নবান হইল।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জাপান চীন আক্রমণ করিলে সাময়িকভাবে কমিউনিস্ট ও কুয়ো-মিং-তাং দলের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। কিন্তু উহাদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধের অবসান তখনও হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে উভয় দলের মধ্যে পুনরায় অন্তর্যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করিল।

ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের ও আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও চিয়াং-কাই-শেক তথা কুয়ো-মিং-তাং সরকারের পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিল। প্রায় কুড়ি বৎসর একটানা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার ফলে কুয়ো-মিং-তাং সঙ্ঘের অতিরিক্ত মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত, অকর্মণ্য ও অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল।* মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিতে চীন সরকারের অক্ষমতা এবং ধনী সম্প্রদায়কে অধিকতর ধনশালী হইয়া উঠিবার সুযোগ দেওয়ায় জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা চরমে উঠিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টদের প্রভাব বিস্তারলাভ করিতে থাকে।

কমিউনিস্টদের উত্তরোত্তর সাফল্য ও কমিউনিস্ট শাসনের প্রতিষ্ঠা

১৯৪৫ হইতে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনে অন্তর্যুদ্ধ চলিল। জনগণের সমর্থন, জাতীয় সরকারের বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর কমিউনিস্ট দলে যোগদান এবং জাপানী যুদ্ধাস্ত্র কমিউনিস্টদের হস্তগত হওয়ায় উহারা উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করিয়া চলিল। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে কমিউনিস্টদের সাফল্য একরূপ সুনিশ্চিত হইল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিয়েনসিনের পতন হইলে পিকিং-এর পতন আসন্ন হইল। মে মাসে সাংহাই কমিউনিস্টদের হস্তগত হইল। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া চিয়াং-কাই-শেক কিছু সংখ্যক দলীয় সমর্থক ও অল্প সংখ্যক সৈন্যবাহিনী লইয়া ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় লইলেন। চীনের মূল ভূখণ্ড কমিউনিস্টদের দখলে আসিল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্টগণ চীনে প্রজাতন্ত্র (Peoples Republic of China) ঘোষণা করিল। এই নূতন সরকারকে ভারত, ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া স্বীকার করিয়া লইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত তাহা স্বীকার করে নাই।

সংক্ষিপ্তসার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য-প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার। সর্বপ্রথম তুরস্কেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক সাম্রাজ্য ধর্মীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আধুনিকভাবে গড়িয়া উঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচিত হইলে উহার রাষ্ট্রীয় জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। তুরস্কের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ইরাক, সাউদি-আরাবিয়া প্রভৃতি আরব দেশগুলির জনগণ ইওরোপীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করে এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উহারা স্বাধীনতা লাভ করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইওরোপীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইল ভারত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ভারতে কংগ্রেসী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয় এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতে স্বাধীনতার আন্দোলন উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে আইন-অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ-আন্দোলন, আগষ্ট আন্দোলন ও আজাদ-হিন্দ বাহিনীর 'দিল্লী-চলো' আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে খণ্ডিত ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ইন্দোনেশিয়া,

* "After nearly 20 years in powers the Kuomintan had become corrupt and arbitrary to a degree without precedent in Chinese history."—Hampden—Jackson.

ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশের জনগণ যথাক্রমে হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালাইয়া শেষ পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করে।

চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব : চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চিয়াং-কাই-শেকের শাসনকালে চীনে জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। কমিউনিস্টগণ উত্তর পশ্চিম চীনে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে। চীন-জাপান যুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে উভয় দলের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুনরায় চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কুয়ো-মিং-তাং সরকারের পতন ঘটে এবং কমিউনিস্ট শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রশ্নমালা

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Give a short-account of the nationalist movement in South-East Asia from the conclusion of the First World War to 1949]. উঃ ২৭০-২৭২ পৃঃ দেখ

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

[Write a short essay on Indonesia's freedom movement after the Second World War till 1949] উঃ ২৭২-২৭৩ পৃঃ দেখ

৩। চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

[Write a short account of Communist revolution in China.] উঃ ২৭৩-২৭৬ পৃঃ দেখ

বিষয়বস্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য